ধনধান্যে

১—১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮
পঞ্চাশ পয়সা

ধনধান্যে
বর্ষ – ৯ (১৩৮৫/১৯৭৮)
সংখ্যা – ১৫, ১৮, ২১, ২৩, ২৪
বর্ষ – ১০ (১৩৮৬/১৯৭৯)
সংখ্যা – ১, ৩, ৪, ৬, ৯, ১১, ১৭
১৩৮৪ — ১৩৮৫

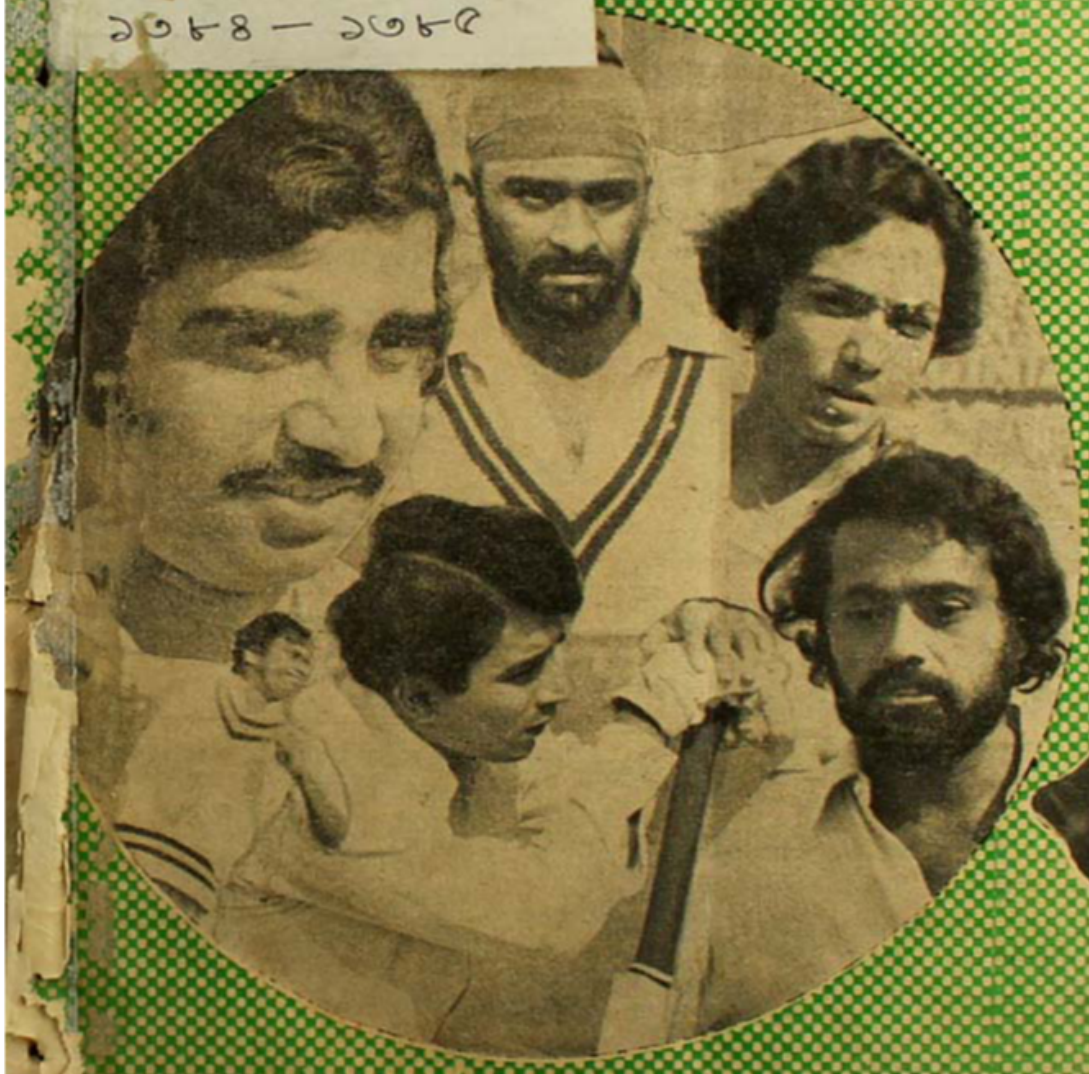

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

সম্পাদক,

আমি নিয়মিত ধনধান্যে পড়ি। পত্রিকার লেখাগুলি নিয়মিত পড়তে আমাকে আগ্রহী করে। বিশেষত প্রবন্ধগুলোতে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। গত সংখ্যায় শ্রী বীরেন সাহার "তোমার মুদ্রা", বাসব সাখার শ্রী দিলির কুমার সাহার "কালো মাণিক ঘিরে নতুন জীবন" লেখাদুটি বেশ তথ্যপূর্ণ এবং প্রাঞ্জলভাবে লিখিত। মহিলা মহলের লেখাগুলি আরও ধারালো ও নতুনত্বে ভরপুর হওয়া উচিত। মুখোমুখি বিভাগটি আবার চালু করলে ভাল হয়। মাত্র দুটি নাটক ও সিনেমার সমালোচনাগুলো যথার্থ ও নিরপেক্ষ। অন্যকোন পত্রিকায় সঠিক সমালোচনা পাইনা। পত্রিকাটি আরও স্বাস্থ্যবান হলে ভাল হয়।

বিপ্লব কুমার গুপ্ত
ডেওঘর, সংথাল, বিহার

সম্পাদক,

গত ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সংখ্যাটি পড়ে খুব ভালো লাগলো। সবচেয়ে ভালো লেগেছে শ্যামলী বসুর 'কলকাতার আকাশে বাসন্তী' শিরোনামের আকাশ দূষিতকরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি। বেরিকাকে আমার আন্তরিক প্রতিনমস্কার জানাই। এছাড়া ভালো লেগেছে মহিলা মহলে বিভাগে অঞ্জলি চৌধুরীকৃত মহিলোপযোগী রচনা গীতের খোলা, আর আলপনার (দিলির কুমার রায়) 'কালো মাণিক ঘিরে নতুন জীবন' এবং উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'একে একে নিবেছে দেউটি'।

কলিকাতার একটি বিভাগ এই পত্রিকায় সংযোজিত হলে সুখী হবো। 'মুখোমুখি' বিভাগে সাক্ষাৎকার পর্যায়ে রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না, এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। আর পাঠকদের সুচিন্তিত মতামত সম্বলিত চিঠিপত্র আরো বেশি সংখ্যায় এবং পত্রলেখার নাম পুরো ঠিকানাসহ প্রকাশিত হলে ভালো হয়।

ধনঞ্জয় পাল
৯/২ সি, রতনবাবু রোড
কলিকাতা-৭০০০৫২

বিশেষ পরিকল্পনা সংখ্যা

আগামী ১ এপ্রিল থেকে দেশে চালু হচ্ছে ভিন্ন ধাঁচের এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—লক্ষ্য ও রীতি দুদিক থেকেই যা আগের পাঁচটি পরিকল্পনা থেকে স্বতন্ত্র।

এই নতুন পরিকল্পনার রূপরেখা, অগ্রাধিকার, তাৎপর্য এবং সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের রচনা সমাবেশে প্রকাশিত হচ্ছে ধনধান্যের আগামী সংখ্যা। এই বিশেষ পরিকল্পনা সংখ্যায় লিখছেন :

বীরেশ ভট্টাচার্য
বহুতা যোজনা ও তার ফলশ্রুতি
অলক ঘোষ
বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা পদ্ধতি
সুব্রত গুপ্ত
পঞ্চম পরিকল্পনার পর
বসুলা বসু
কর্মসংস্থানভিত্তিক যোজনা
রাখাল দত্ত
প্রস্তাবিত শিল্পকাঠামো : কয়েকটি ভাবনা
কল্যাণ দত্ত
কৃষির অগ্রাধিকার : প্রকৃত তাৎপর্য
এবং আরো অনেকে

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহকমূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাবলিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
ধনধান্যে, পাবলিকেশন্স ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২০৭৬

সম্পাদক
নিশিরকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্য

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অগ্রণী পাক্ষিক

১৮ মাঘ—৩ ফাল্গুন, ১৩৮৪

১—১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

নবম বর্ষ : পঞ্চদশ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

মদ বর্জনে বাধা কোথায়
গোপালকৃষ্ণ রায় ২

কাজের বিনিময়ে খাদ্য
বিশেষ প্রতিনিধি ৪

কৃষিক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি
ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন ৫

সংবাদ ৬

পোস্ট মালের ভাই
বর্ষিয়ৎ উপাধ্যায় ৭

আলো—আরও আলো
বিশেষ প্রতিনিধি ৯

কৃষি : ডিজেল-মুখ ও বি-১ মুখ চাষ করুন
দীনবন্ধু সাহানা ১১

গ্রন্থ আলোচনা
স্নেহময় সিংহরায় ১২

শীতের অতিথি—যাযাবর পাখী
চিত্তরঞ্জন পাল ১৩

বাঁধ। ১৪

মহিলামহল : শ্রীগ্রামের মর্যাদা চাই
অরুনি চৌধুরী ১৫

সিনেমা : চার্লি চ্যাপলিন প্রসঙ্গে
অবিতাভ চক্রবর্তী ১৭

জিজ্ঞোৎসব-১৯৭৮
নির্মল বর ১৮

খেলাধূলা : ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন চেহারা
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০

সন্তোষ ট্রফি ও বাংলা
অমর বসু তৃতীয় কভার

প্রচ্ছদশিল্পী—মুকি প্রচ্ছদ চিত্র—মনোজিৎ চন্দ

সম্পাদকের কলমে

১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরান অঞ্চলে ভৌমিক ভারত একটি পারমাণবিক প্রক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সেদিন থেকে বিশ্বের কোন কোন মহলে ভারতের পারমাণবিক নীতি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাঁদের ভাবনা ভারত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

যে দেশ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে দীক্ষিত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্গাতা সে দেশ যে মারণাস্ত্র ব্যবহারের পথ বেছে নিতে পারে না সেই সহজ সত্যটি দলের অভ্যন্তর করেনি—তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে পরমাণু থেকে ভারতের যা কিছু প্রয়োজন তা শুধু উন্নয়নমূলক কাজে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার প্রয়াস মাত্র।

বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রধর রাষ্ট্রগুলি যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবনে ব্যস্ত তখন তারাই আবার অন্যান্য দেশের মধ্যে এই অস্ত্রের প্রসারের সম্ভাবনা দেখে সন্ত্রস্ত সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ কার্টার। একে ভারত দফরে, একেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মেডাম কাগাহান পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষর দিক এবং তার সর্বপ্রকার পারমাণবিক কার্যের উপর আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধি গ্রহণ করুক, এই ছিল উভয় রাষ্ট্রনেতার অভিলাষ।

আমরা যে এই অস্ত্র তৈরী করব না সেকথা আমরা একাধিক বার বলেছি। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেও কোন বিস্ফোরণ করব না, সেকথাও বলেছি। আমাদের সমস্ত পারমাণবিক কার্যের উপর পূর্ণ রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও আমরা মেনে নিতে রাজী, অবশ্য কয়েকটি শর্তে। এই শর্ত হল, দুই প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া, এবং বৃটেনকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কোন পরমাণুর পারমাণবিক বিস্ফোরণ কোনদিন ঘটাবে না, তাদের অস্ত্রাগারে নতুন কোন অস্ত্রের সংযোজন হবে না এবং সমস্ত বহুমুখ পারমাণবিক অস্ত্র নিশ্চিহ্ন করবার প্রয়াসে তারা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। তবেই মনে করব এই রক্ষা কবচের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতেও কোন প্রশ্নোজনীয়তা আর থাকবে না।

পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্যতার প্রসারের চাইতে তার উল্লম্ব প্রসার যে আরও ভয়াবহ সেই সহজ কথাটি বৃহৎ শক্তিগুলি বুঝতে বুঝতে চায় না। অন্যান্য দেশের প্রতি তাদের এই বৈষম্যমূলক আচরণেই আমাদের আপত্তি। আমরা বিশ্বে কবি বিশ্বজোড়া নিরস্ত্রীকরণের এবং এই নিরস্ত্রীকরণের প্রথম ও প্রধান ধাপ হচ্ছে বহুমুখ পারমাণবিক অস্ত্রের বিনাশ।

ভারতের বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং ভারত কারুর করে যে পূর্ণ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যদি প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কিন কংগ্রেস এমন আইন প্রণয়ন করে যার ফলে আমাদের তারাপুর পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরেনিয়াম সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তবে সেই পরিস্থিতির জন্যও আমরা প্রস্তুত। আমাদের পথ স্বনির্ভরতার পথ এবং পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আমাদের কর্মসূচী কোন প্রকারেই ব্যাহত হবে না।

মদ বর্জনে বাধা কোথায়

গোপালকৃষ্ণ রায়

কেন্দ্রীয় সরকারের 'মদ বিসর্জন' সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় সারা দেশজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও নীতিগতভাবে মদ বিসর্জন কার্যক্রমকে প্রায় সর্বস্তরের মানুষই স্বাগত জানিয়েছেন—তবুও কেউ কেউ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ক'রে অনেক যুক্তির অবতারণা ক'রেছেন। এঁদের যুক্তি যতটা অর্থনীতি সম্পর্কিত তত বেশি সমাজ সম্পর্কিত নয়। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক জোরালো এবং বাজালো যুক্তি দেখানো গেলেও—নীতির দিক থেকে 'মদ বিসর্জন' অবশ্যই সমর্থন—যোগ্য।

যাঁরা বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা ক'রেছেন তাঁরা বেশির ভাগই আর্থিক দিকটাকেই বড় ক'রে দেখেছেন। অবশ্য এঁদের যুক্তির পেছনে অনেক যুক্তি আছে। মদ বিসর্জনের ফলে সরকারকে যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে—তা পূরণের বিকল্প কোন যুক্তি মদ-বর্জন সমর্থকেরা জোরালো ভাষায় তুলে ধরতে পারেননি। অপর পক্ষে বিরোধীরা মদ-বিসর্জনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার ক'রেও সরকারী সিদ্ধান্তকে আরও সাদুবধনী ও সরকারকে আরও একটু ধীরে সুস্থে এগোতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন।

সরকার ঠিক ক'রেছেন, আগামী চার বছরের মধ্যে সারা দেশ থেকে মদকে বিসর্জন দিতে হবে। আমার মতে সময়টা বেশী দীর্ঘও নয় আবার কমও নয়। মোটকথা, একটা সীমারেখা থাকা ভাল, কিন্তু শেষ সীমারেখা টানাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না। অন্তত—বিশেষ করে মদ বর্জনের ক্ষেত্রে। কারণ মদ্যপান বহু শতাব্দী ধ'রে সামাজিক উৎসব ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ হ'য়ে গেছে। সেই আচরণ বিধি থেকে মদকে বর্জন করাতে হলে—সীমারেখা বেঁধে দিয়ে—সমর্থনের চেয়ে প্রতিবাদের ঝড়টা উঠবে বেশী। সুতরাং একটু 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করলে—সমস্যার সমাধান বেশি পাওয়া যাবে।

মানসিক প্রস্তুতি বলে একটা কথা সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে কাউকে অপ্রস্তুত করাটা শোভন নয়। একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা যে, মদ্যপান শুধু দোষাবহ-ই নয়, যিনি পান করেন, তিনিও মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবেন। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, মদ্যপান শুধু সমাজে অস্বীকৃত নয় নিজের মনের কাছেও অস্বীকৃত।

তবুও অস্বীকৃত বস্তুটি সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এবং জড়িয়ে আছে দীর্ঘদিন থেকে। আর এ-থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে—একটা আর্থিক ও কর্ম সংস্থানের দিক। এই আর্থিক দিক এখন আর সহজে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না—এবং উপেক্ষা করাও উচিত হবে না। মদ বিসর্জনের সরকারী নীতি যথেষ্ট স্পষ্ট। এবং একে আরও স্পষ্টতর ও ব্যাপকতর ক'রেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই। মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ শিষ্য শ্রীদেশাই স্বাধীনতা সংগ্রামের আমল থেকেই মাদক বর্জনের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে চিহ্নিত হ'য়ে আছেন। প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণের পর 'মদ-বিসর্জন' কর্মসূচীকে চিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অবশ্য আগেকার দিনের কথা বাদ দিলেও মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতীতের পুঁথির পাতা ওলটানোর দরকার হবে না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফিরে গেলেই দেখা যাবে মদ বিসর্জনের জন্য তৎকালীন মনীষীরা তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন।

১৯১২ সালে মহাবতি গোখেলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তদানীন্তন ভারত সচিবের কাছে 'মাদক-নীতির' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অ্যানি বেসান্ট, লোকমান্য তিলক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তখন তীব্র ভাষায় সম্পূর্ণ মদ-বিসর্জনের দাবী জানিয়েছিলেন।

এই মদ বিসর্জনের দাবী ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কর্মসূচীর অঙ্গীভূত হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজের কয়েকটি প্রধান স্তম্ভ—বেমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও সামগ্রিক মদ বিসর্জন প্রাধান্য লাভ করে।

একদা গান্ধীজী বলেছিলেন, যদি একঘন্টার জন্যেও তাঁকে ডিক্টেটার নিযুক্ত করা হয়,—তাহলে "আমি কোনরকম ক্ষতিপূরণ না দিয়েই সমস্ত মদ তৈরীর কারখানা বন্ধ করে দিতাম।" গান্ধীজীর ধ্যানধারণা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গীভূত কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডভাবে প্রচার ক'রে চলেছেন তাঁর ধারণা, উত্তেজক মদ্যপান সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ। আমাদের মত গরীব দেশের উন্নতি মদ বিসর্জন না দিয়ে করা সম্ভব নয়। মদ্যপান শুধু ব্যক্তি বিশেষকে ক্ষতি করে না—ব্যক্তির সঙ্গে পরিবার আর পরিবারের সঙ্গে সমাজেরও ক্ষতি করে চলেছে। তাঁর ধারণা সর্বাংশে সত্য। এবং এই মদ বিসর্জনের নীতি সেজন্যই সমর্থনযোগ্য।

আমাদের সংবিধানেও মদ বিসর্জনের আহ্বান রয়েছে। অবশ্য গত দু'দশকে এ নিয়ে সংসদে কিছু বাকবিতণ্ডা ছাড়া কার্যকর কিছু করা হয়নি। কেন্দ্র যখন এ-নিয়ে কিছু করতে চেয়েছেন—রাজ্যের-

ক্ষতি হবে' এই কারণে বেশিরভাগ রাজ্য সরকার মুখ ঘুরিয়ে বসে থেকেছেন। সংবিধানে মদ বিসর্জনের আইন থাকলেও বিষয়টি রাজ্যের। সুতরাং রাজ্য সরকার আগ্রহী না হলে দেশ থেকে মদ বিসর্জন সম্ভব নয়।

অবশ্য পূর্বতন সরকার মদ বিসর্জনের জন্য একটি ১২ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। নতুন জনতা সরকার তা বাস্তবায়ণের জন্য সম্প্রতি ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছেন—আর উঠেছেন বলেই জাতীয় স্তরে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ বলছেন, এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও জনতা সরকার মদ বিসর্জনের জন্য এত উদ্গ্রীব হচ্ছেন কেন? অপর দিকে কেউ কেউ বলছেন—মদ বিসর্জিত না হলে সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। দু'য়ের মাঝখান থেকে একটি উপায় অবশ্যই আমাদের বার করতে হবে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের ১২-দফা কর্মসূচী মদ বিসর্জনের একটি ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ দলিল। ১৯৭৫ সালে রচিত এই দলিলটি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ হয়নি। জরুরী অবস্থার সময় অন্যান্য কাজ যে গতিতে চলা হয়েছিল—মদ বিসর্জনের দলিলটিকে সেই অনুপাতে কার্যকর করার প্রয়াস খানেকখানি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর এই পূর্বতন সরকারও চাননি—বর্তমান সরকারও নীরব।

একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা যত সোজা তাকে বাস্তবে রূপদান করা তত্তোধিক কঠিন। শুধু মদ বিসর্জনের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি হয়নি, কম-বেশি সব কর্মসূচীর ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ সূতিকা রোগে ভোগে। আমরা দীর্ঘ রাস্তা তৈরি করছি, উঁচু-ইমারত গড়ছি, ক্ষেতে খামারে সেচের ব্যবস্থা করছি, কিন্তু এগুলিকে উপযুক্ত-ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি। তৈরী করার চেয়ে রক্ষা করা যে অধিকতর কঠিন তা আমাদের দেশের প্রকল্পবিদেরা ভুলে থাকেন।

ঠিক একই কারণে আইনই ধরুন আর কোন কর্মসূচীই ধরুন ঠিকমত ভাবে প্রয়োগ হয়না বা প্রয়োগ করার মত মানসিকতা ও শক্তির অভাব থাকে। মদ বিসর্জন নীতিকে সফল ও সার্থক করতে হলে প্রয়োগের উপর জোর বেশি দিতে হবে। ১২ দফা কর্মসূচী বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। শ্রুতি-মধুর এই কর্মসূচীটির দু'একটা দফা উল্লেখ ক'রে কিছু বলা যেতে পারে। তিন নম্বর কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, হোটেল, হোস্টেল, সেঁড়োরাঁ, ক্লাব এবং জন-সমাবেশে মদ্যপান ও পরিবেশন বন্ধ। স্বীকার করতেই হবে মদবিসর্জনের ক্ষেত্রে এই দফাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু কেউ কি দয়া করে বলতে পারেন, এই দফাটিকে কার্যক্ষম করা হয়েছে? কেন হয়নি, কোথায় গলদ—এ বিষয়ে কোন তদন্ত হয়েছে? কেউ কি চিন্তা করেছেন?

পাঁচ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, বেতনের দিন সর্বত্র সবভাবে 'শুষ্ক' দিবস থাকবে। উদ্দেশ্য মহৎ। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলে, খনি-অঞ্চল ও শহরাঞ্চলে এই ব্যবস্থা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সত্ত্বেও কেন তা সার্থক হচ্ছে না?

সাত নম্বর দফায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সর্বস্তরের সরকারী ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারীদের মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে। আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করব, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন।

আমার মনে হয়, মদ বিসর্জন কর্মসূচী রূপায়ণের আগে—"হৃদয়ের পরিবর্তন" কর্মসূচী গ্রহণ করলে ভাল হয়। অথবা উভয় কর্মসূচী একসঙ্গে রূপায়ণের ব্যবস্থা করলে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

১২ দফা কর্মসূচীর কথা থাক। মদ বিসর্জনকে নীতিগত সমর্থন জানিয়ে বেসব আধিক ও রাজস্বের ক্ষতি ও মাদক বর্জনের বাস্তব রূপায়ণের অন্তরায়গুলির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সে বিষয়েও কিছু বলা বাঞ্ছনীয়।

মদ বিসর্জন দিলে রাজস্বের ক্ষতি হবে প্রায় ৫২০ কোটি টাকা। এবং মদ বিসর্জন কর্মসূচীকে কার্যকর করতে আশু দাবীর অন্তত ৫০০ কোটি টাকা। এই এক হাজার কুড়ি কোটি টাকার সংস্থান কোথা থেকে হবে—আর এই ক্ষতিই বা কিভাবে পূরণ করা হবে সে বিষয়ে সরকারীভাবে আভাস মেলেনি।

শুধু তাই নয়, দেশে ৩০ টির অধিক বৃহৎ মদ তৈরীর কারখানায় প্রায় কয়েক লক্ষ লোক কর্মরত আছেন। এই ৩০টি কারখানায় বছরে প্রায় দশকোটি টাকার মদ তৈরী হয়ে থাকে। এছাড়া এই ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন আরও কয়েক লক্ষ লোক। তাঁদের জীবিকা ও আধিক পুনর্বাসন সম্পর্কেও সরকারী কোন স্পষ্ট আভাস নেই। জনতা সরকার দশ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করবেন বলে স্থির করেছেন, কিন্তু মদ বিসর্জনের ফলে যে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়বেন সে সম্পর্কে কোন ভাবনা চিন্তা করেছেন কি?

কোটি কোটি টাকার ব্যয়ে নির্মিত বেসব ডিষ্টিলারীজ এখন মদ তৈরী করছে—মদ বিসর্জনের পর সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হবে—তার স্পষ্ট রূপরেখা এখনো জনসাধারণের কাছে অস্পষ্ট। ডিষ্টিলারীজগুলিকে কি সুস্বাদু পানীয় ও ঔষুধ তৈরীর কারখানায় রূপান্তর করা সম্ভব?

মদ বিসর্জনের সমুখকর দিকটাও গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন। বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে মদ তৈরী বন্ধ হ'লে চোরা পথে নিম্নমানের মদ তৈরি যে বৃদ্ধি পাবে না—সে নিশ্চয়তা কোথায়? এ নিশ্চয়তা সরকার কি দিতে পারবেন? সমাজ থেকে মদের কুফল দূর করতে গিয়ে গৃহাচার যদি বেড়ে যায় তাকেই বা কি ক'রে রোখা যাবে?

বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন না করে এবং মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের স্পষ্ট

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

কাজের বিনিময়ে খাদ্য

বিশেষ প্রতিনিধি

গ্রামাঞ্চলের একজন শ্রমিক তাঁর মাসের বেশী অংশটাই খাদ্যের জন্য ব্যয় করেন। সে কারণে তাঁর আয়ের একটি অংশ খাদ্যের আকারে দেওয়াই সঙ্গত। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন তার উদ্দেশ্য তথুমাত্র এটাই নয়। বিশেষভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই কর্মসূচী মূলতঃ চালু করা হয়েছে। দেখা যে বিরাট খাদ্য-ভাণ্ডার তৈরী করা আছে তার উপযুক্ত ব্যবহারও এই কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য। কেন্দ্র ও রাজ্যের হাতে মোট এক কোটি মতন টন খাদ্য মজুত আছে। বর্তমান বছরের এক সময়ে মোট মজুতের পরিমাণ ছিল ২ কোটি টনের উপর। এতে খাদ্যশস্য গুদামজাত করারও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সরকার ঐ মজুত খাদ্য ভাণ্ডার ব্যবহার করে গ্রামীণ পূর্ত বিভাগের কাজের সম্প্রসারণের একটি কর্মসূচী তৈরীর কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁরই ফলশ্রুতি হিসেবে কাজের জন্য খাদ্য কর্মসূচীর জন্ম এ বছরের এপ্রিল মাসে। শুরুতে এই কর্মসূচী ৫ বছরের জন্য চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচী অনুসারে কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে বিনা পয়সায় গম ও বাইনো (বেসীর ভাগই গম) সরবরাহ করছেন। এই কর্মসূচী অনুসারে যাঁরা কাজ পাবেন তাদের পুরোপুরি অথবা আংশিক বেতন ঐ খাদ্য দিয়ে মিটিয়ে দেওয়া হবে। চলতি বছরে এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আলাদাভাবে কুড়ি কোটি টাকা ধরা হয়েছে। খাদ্যের পরিমাণে তার অঙ্ক ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন গম। কুড় কর্পোরেশনের গুদাম থেকে এই গম পাঠানো হচ্ছে।

প্রথম দিকে যখন গ্রামের চাষের কাজ থাকেনা, ক্ষেত মজুররা সাময়িক বেকার হয়ে পড়েন বছরের সেই চার মাসের জন্য এই কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল। সম্প্রতি সরকার এই কর্মসূচীর কোন রদবদল প্রয়োজন কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখেছেন। সেই অনুযায়ী এর কিছু রদবদল করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি কিন্তু বাধ্যতামূলক ভাবে কিছু বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে এই কর্মসূচী এখন আর চার মাস চালু থাকবেনা, সারা বছর ধরেই চলবে।

নতুন কর্মসূচী অনুসারে বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ জমি ও জল সংরক্ষণ, বনভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। জাতীয় সড়ক ও গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট তৈরীর কাজও এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হচ্ছে।

সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের বিধায়ক ও সমষ্টিউন্নয়নকেন্দ্রও এই কর্মসূচীর আওতায় আসতে পারে। রাজ্য সরকারের প্রয়োজন অনুসারে ক্ষমতা অনুযায়ী ঐ গম বরাদ্দ করা হচ্ছে। ঠিকাদারদের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদেরও বেতনের অংশ হিসাবে ঐ গম দেওয়া যাবে। তবে ঠিকাদারদের একজনা শঠিক হিসাব রাখতে হবে এবং খাদ্য-শস্যের অপব্যবহার করা চলবে না। রাজ্য সরকার ইচ্ছে করলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কাজ রূপায়ণের দায়িত্ব দিতে পারেন।

এই কর্মসূচী সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক্ষের রাজ্য মন্ত্রী শ্রী ভানু প্রতাপ সিং সোকসভায় বলেছেন, মজুত খাদ্য ভাণ্ডার কমানোর জন্য এই কর্মসূচী চালু করা হয়নি। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে ধরনের সাড়া মিলেছে তাতে মনে হয় এই কর্মসূচী বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। তেরটি রাজ্য সরকার প্রায় পাঁচ লক্ষ টন গম ও বাইশ হাজার টন বাইনোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ যাবত ৯৭ হাজার টন গম ও ১৮৫০ টন বাইনো সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারকে দিয়েছেন। এরমধ্যে গম পেয়েছে আসাম ৭৫০০ টন, বিহার দশ হাজার টন, কর্ণাটক এক হাজার টন, কেরালা তিন হাজার টন, মহারাষ্ট্র ১২০০ টন, হিমাচল প্রদেশ ৯৪০ টন, ওড়িষা দশ হাজার টন, উত্তর প্রদেশ ২২ হাজার টন এবং পশ্চিমবঙ্গ ৪১ হাজার ২০০ টন। অন্যান্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের পরিপ্রেক্ষিতে তামিলনাড় ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারকে এই কর্মসূচী অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার আরো গম দিতে রাজী হয়েছেন।

কর্মসূচী নতুন, এত তাড়াতাড়ি এর বিচার সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বিরাট গ্রামীণ উন্নয়নে এই কর্মসূচী সাহায্য করতে পারে। ফলপ্রসূ হলে আরো অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী এর আওতায় আনার কথা সরকার চিন্তা করতে পারেন। খাদ্য ছাড়া অন্যান্য জরুরী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এই কর্মসূচীর মাধ্যমে দেওয়া যায় কিনা তাও ভেবে দেখার অবকাশ আছে। তাহলে অনুন্নত এলাকায় যে সব শ্রমিক উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁরা লাভবান হবেন। বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় যেসব শ্রমিক ত্রাণ ব্যবস্থার কাজ করছেন তাঁরা এতে খুবই লাভবান হবেন।

কৃষিক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি

ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন

আমাদের প্রয়োজনের জগতে খাদ্যের স্থান নিঃসন্দেহে সবার উপরে। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা দ্বারাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। আর কৃষির উন্নতি শুধুমাত্র লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বোঝায় না। সেইসঙ্গে গ্রামে গ্রামে লাভজনক কাজের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কর্মসংস্থানের দ্বারাই গ্রামাঞ্চলে পল্লীবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে ভূমিহীন চাষীদের পক্ষে তা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধির পক্ষে তিনটি চাহিদা মেটানো চাই—অধিক খাদ্য উৎপাদন, বেশী কর্মসংস্থান এবং ক্রয়বর্ধমান আয়।

বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষবাসের জন্য যা অপরিহার্য তা হলো নির্দিষ্ট সময়, জল, মাটি এবং সার অনুপাতে পর্যাপ্ত বৃদ্ধি। জমির দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট না করে এই উৎপাদন বাড়াতে হবে। দেশের মধ্যভাগ এবং উপকূলবর্তী এলাকার কৃষির ক্ষেত্রে এই উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ হবে পরিবেশের ক্ষতি না করে জল, সময় এবং সারের একক গড় অনুপাতে আরো বেশী মাছ ও জলজ খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) জেনেটিক বা বংশগতিতত্ত্ব এবং চাষবাসভিত্তিক অগ্রগতি, (২) রসায়ন বিপ্লব, (৩) ইঞ্জিনীয়ারিং এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং (৪) ব্যবস্থাপনা এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থা।

এই শতাব্দীতে উদ্ভিদের বংশতত্ত্ব ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এমন অনেক যুগান্তকারী প্রয়োগ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যা কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল থেকে বহু মূল্যবান উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছে। আমাদের দেশেই প্রথম শংকর জাতের তুলা বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে যার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা প্রচুর। তাছাড়া এমন কিছু বিরল জাতের গম ও ধানের বীজ তৈরী করা গেছে যেগুলি প্রচলিত বীজের তুলনায় অনেক বেশী অর্থকরী এবং বিভিন্ন প্রান্তে চাষবাস যোগ্য।

গত শতাব্দীতে রাসায়নিক সারের আবিষ্কারের পর থেকে সারের গুণগত উৎকর্ষ সাধনে রসায়ন এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনে দিয়েছে। এখন বিভিন্ন ধরণের চাষবাসে সার ছাড়াও মূল্যবান কীটনাশক দ্রব্য এবং রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন প্রায়োজন শ্রেণী করে বছরে আমগাছ থেকে দুবার করে ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে।

কৃষিতে সারের একটা আলাদা প্রভাব রয়েছে। কোন্ বীজ সবল গুণগত উৎকর্ষ সাধন করে থাকে এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে সারের নিম্নমানের পরিমাণ ঠিক না হলে ফলা হানির সম্ভাবনা থাকে। এসব বিষয়ে চাষীদের যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আধিক্যের চাষবাসের বিভিন্ন স্তরে জটিলতা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে। ঘোড়াদিগও দিয়ে সনাতনী চাষবাসের পরিবর্তে এসেছে ট্রাক্টরের যুগ। তেমনি কৃষিতে সেচের জল দ্রুত পৌঁছে দিতে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুত চালিত পাম্পসেট। তাছাড়া অনাবাদী শুষ্ক কৃষি জমিও এখন উন্নত কারিগরি কৌশলের সাহায্যে পরিণত হচ্ছে সবুজ আবাদী ভূমিতে। আগে বোরো শস্য ও জল-জলাদি পরিপক্ক হবার পর অধিকৃতভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না এখন সেগুলি যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

কৃষির উপাদান ঠিকমত যোগান দিলেও ফসলের গুণগত উৎকর্ষতা ও ভাল ফলন বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা, কারিগরি জ্ঞান এবং সর্বাধুনিক প্রয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। এসব বিষয়ে চাষীরা সজাগ থাকলে পণ্যের গুণমান যেমন বজায় থাকে তেমনি ক্রেতার রুচিও বজায় থাকে। এই কাজে পরিচালন বিশেষজ্ঞরা পণ্যের গুণগত মান ও সর্বাধুনিক প্রয়োগ পদ্ধতি ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করতে পারেন।

বৈজ্ঞানিকরা যাতে চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষির আধুনিক কলাকৌশলের কাজ শেখাতে পারেন সেজন্য ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করেন। ১৯৬৫ সালে মাত্র চার হেক্টর এলাকাতে উচ্চ ফলনশীল ধান নিয়ে এই প্রশিক্ষণের কাজ চালু হয়। ১৯৭১-৭২ সালে এই ধরণের উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের এলাকা দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ হেক্টরেরও বেশী। এই কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে আমাদের চাষীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দানের ফলে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চাষীদের যদি এই ধরণের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যায় তাহলে আগামী দিনগুলিতে সুদূরপ্রসারী ফল দেখা দেবে।

চাষবাসে ঋণ ব্যবস্থাপনা অর্থকরী দিক থেকে অনেক সাহায্য এনে দিতে পারে। ছোট প্রান্তিক চাষীরা যদি নিয়মিত যৌথভাবে চাষবাস করে তাহলে উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায় এবং এরফলে চাষীরা বিনিয়োগভিত্তিক কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ পেতে পারে।

কৃষির উৎপাদন বাড়াতে মনের রয়েছে একটা প্রধান ভূমিকা। আমাদের চাষযোগ্য ভূমি ও জনবল থাকলেও মনের সুষ্ঠু ব্যবহার ঠিকমত না হওয়ায় অনেক সময় অপর্যাপ্তরূপ ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। এজন্য আমাদের চাষী ও মহিলা চাষীদের আত্মসচেতন অন্যান্য নদনদী ও খালবিলগুলির উপরই বেশী করে জোর দিতে হবে।

আমাদের দেশে কৃষিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ থেকে দশ হাজার বছর আগে চালু হয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৬ সালে অর্থাৎ গত ২৫ বছরে আমাদের কৃষি উৎপাদন আগেকার বছরগুলির তুলনায় অনেক গুণ বেড়েছে। বর্তমানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যদি বজায় থাকে তাহলে দেশের কোন মানুষই অনাহারে মারা যাবেন না। আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে খাদ্যবস্তু তুলে দেওয়া তখনই সম্ভব—যখন আমাদের ছোট চাষী, ভূমিহীন শ্রমিক এবং গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং তাঁরা কৃষির সর্বাধুনিক ব্যবহারিক জ্ঞান ও ক্রয় ক্ষমতা পুরোপুরি অধিকারে পাবেন।

সংবাদ

প্রেসিডেন্ট কাটারকে মহাত্মা গান্ধীর রচনা সংগ্রহ উপহার দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী শ্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ

উচ্চমূল্যের নোট বাতিল

গত ১২ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিনান্স জারী করে এক হাজার, পাঁচ হাজার ও দশ হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করেছেন।

এইসব নোট বাজারে চালু থাকার ফলে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বে-আইনী মালের প্রচলের সুবিধা হচ্ছিল—এবং তা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর। একথা বিশ্বাস করার যত কারণ আছে বলেই এই অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছে।

সেচ প্রকল্প

সম্প্রতি কৃষিঋণী উন্নয়ন ব্যাঙ্কের অনুমোদন ও গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অর্থ বিনিয়োগে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গুয়া-কিশোরপুর এলাকায় ম্যানুমিনিয়াম পাইপ লাইন সমৃদ্ধ সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৮৮ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে ৪৫ একর জমিতে সেচের সুবিধা হবে এবং ১৫০ জন কৃষক ও প্রান্তিক চাষী উপকৃত হবেন। তাঁরা বছরে তিনটি ফসল ফলাতে পারবেন।

রাঙ্গুয়া-গাজীপুর এলাকায় ১২টি অগভীর নলকূপযুক্ত ডীপ-সেচ প্রকল্পের কাজও শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়। ৭৫ একর জমিতে এর ফলে সেচের সুবিধা হবে এবং ১০০ জন কৃষক ও প্রান্তিক চাষী উপকৃত হবেন।

রঙ্গীন আলোকচিত্র প্রদর্শনী

গত ১৩ জানুয়ারী থেকে এক সপ্তাহ-ব্যাপী 'ভারত আলোকচিত্র প্রদর্শনী' শেষ হল কলকাতার আন্তর্জাতিক জনসংযোগবাহিকী ভবনে। ছয় দশকের মধ্যে অগ্রগতির দেশ থেকে রাশিয়া কিভাবে এক উন্নত সমাজ-তান্ত্রিক দেশে নিজেদের রূপান্তরিত করেছে তা প্রতিফলিত হয়েছে সাদাকালো ও রঙীন তিনশ আলোকচিত্রের মাধ্যমে। প্রদর্শনীর যৌথ উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় সরকারের ডি. এ. ভি. পি. ও সংস্কৃতি বিভাগ।

মিনি ইস্পাত কারখানা

সম্প্রতি সিউড়ির কাছে একটি মিনি-ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ডক্টর কানাই লাল ভট্টাচার্য। এতে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। উদ্বোধনকালে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী গ্রামে কুটিরভিত্তিক শিল্প স্থাপনের এবং শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি আরো জানান, রাজ্যে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা কুটিরশিল্প স্থাপনে উৎসাহ দান করবেন।

কার্টারকে মহাত্মা গান্ধীর রচনা উপহার

ভারতে তিন দিনের সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার গত ২ জানুয়ারী রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট কার্টারকে ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'মহাত্মা গান্ধীর রচনা-সংগ্রহ' উপহার দেওয়া হয়। উপহার প্রদান করেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও বেতার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসচিব শ্রী ভল্টন্ হিংগার আটদিনের সফরে গত ১ জানুয়ারী নয়াদিল্লি আসেন। ঐ দিনই তিনি কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী এল. কে. আদবানীর সঙ্গে শাস্ত্রীভবনে তাঁর মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করেন। শ্রী আদবানী শ্রী হিংগারকেও 'মহাত্মা গান্ধীর রচনা সংগ্রহ' উপহার দেন।

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী এল. কে. আদবানী শ্রী ভল্টন্ হিংগারকে মহাত্মা গান্ধীর রচনা সংগ্রহ উপহার দিচ্ছেন

পোনু মালের ভাই / রণজিৎ ভট্টাচার্য

মাঠ ছাড়িয়ে গ্রামে ঢোকবার মুখে যেখানে পথের বাঁক সেখানেই দেখা। রাস্তার পাশেই একটা চওড়া বড় নালা। ধারে ধারে বনতুলসীর জঙ্গল। কমল দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল ছেলেটাকে। বনতুলসীর গায়ে গায়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কাছাকাছি আসতেই জঙ্গল ঠেলে ঘুরঘুর করে একটা লোক বেরিয়ে এল। কমল চমকে উঠল, মন বড় ভয়ে বলল,—কে?

আজ্ঞে আমি। বলে সে কমলের মুখের দিকে তাকাল। হাসিমুখে বলল, আমি পোনু মালের ভাই।

বেজা। আশ্বস্ত হয়ে কমল বলল, ওখানে কি করছিলি?

কমলের কথার ফাঁকে ছিপের বঁড়শীতে গাঁথা মাছটা মাটিতে ফেলতে ফেলতে বেজা বলল,—আজ্ঞে দড়কাচ্ছিলুম বাবু। বলতে বলতে ছেলেটাকে ডাকল,—খালুইটা নে আয়। হাঁ করে দেখতিছিস কি। বাবুকে দেখিসনি কখনো? কতবার তোকে নে গেছি ওনাদের বাড়ি।

চলি বেজা। ট্রেন ধরতে হবে। কমল এগিয়ে চলল।

ছেলেটা এতক্ষণে বলল,—কোতা যাবে বাবা?

চাকরী করতে। কলকাতায়। অল্পক্ষণ থামল বেজা। তারপর তার গলাটা উত্তীপ্ত হয়ে উঠল।—বাবুরা কত লেকাপড়া শিকেচে। তবে চাকরী করতে যাচ্ছে কলকাতায়। ঐ জন্যেই তোকে বলি বাবা লেকাপড়া কর। পাড়ায় পাড়ায় এখন পাশুশাল, ভাবনা কি? লেকাপড়া শিকে নে। বড় হ। তুখন তুইও অবনি চাকরী করতে যাবি, ওইরকম পেনটুন হাঁকিয়ে চুল বাগিয়ে—

বেজা সামান্যক্ষণ চুপ করল। বঁড়শীতে নতুন টোপ লাগানো হয়েছে। ছিপটা তুলে বনতুলসীর ঝাড়ে ঢুকতে ঢুকতে অন্যমনস্কের মত বলল,—আমাদের সময়ে না হয় গেরামে ইস্কুল পাশুশালা ছেল না, লেকাপড়া লেকা হয়নি। তাই এমনি করে ফন্দীফিকিরে.....নইলে কি বাড়ির ছেলে আমি—

এ কথাটা বেজা প্রায়ই বলত। বলত, নদীরের ক্ষেত্র। নইলে কি বাড়ির ছেলে, আর কি করে কেতাছি। আমার বাপ ছেলে গুনিন, দাদাও ছেল গুনিনের গুনিন। আর আমি—

মিথ্যা বলে না বেজা: হাটতলার সবাই জানে। রোজ সন্ধেবেলায় হাটতলাতেই তার আড্ডা। পনু মাল আর তার বিখ্যাত ছেলে আনু মালের কথা কে না জানে। সাপই ছিল ওদের লক্ষ্মী। সাপধরা, সাপের খেলা দেখানো আর বিষ বিক্রি। সাপ নিয়েই কারবার। পনুমালের মন্ত্রতন্ত্রপাতও ছিল। ভূতপ্রেত ঝাড়া, বাত-বাতাসের দোষ কাটানো, ঝাড়ফুঁক। কিন্তু আনুর ও সব ছিল না। তার সাপই ছিল সব। বলত,—সাপ নে খেলা করতে জন্মেছি। মরণ এলে সাপের হাত ধরেই মরব।

কথা রেখেছিল আনু। ভয়ডর ছিল না তার। গেরস্তের বাড়িতে সাপের সন্ধান মিললে তারই ডাক পড়ত। খানিক গর্ত খুঁড়ে সে সাপের লেজ ধরে হিড়হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে আসত। কোথাও সাপে কাটার রোগী থাকলে তাকে নিতে লোক ছুটে আসত। গেলে নিশ্চিন্ত হত, জানত রোগীর পুনর্জন্ম হল। সেই আনুকেই একদিন আকস্মিক জীবনাস্ত হল। সাপের এতবড় ওস্তাদ বলব কিনা সাপেরই কামড়ে।

এই সব কথা বেজার খুব মনে পড়ে। মনে পড়লে ভয় ভয় লাগে। প্রথম প্রথম মদ খেতে গিয়ে ভয়টা ভেঙেছিল। তারপর ঝুঁকে চেপে বসেছিল। দু এক পাত্র টানার পর ভয়টা সর্ষেদানার মত ছিটকে বেরিয়ে যেত। মস্তিষ্কে সাপের মত চাপ চাপ হয়ে ঘুরে বেড়াত। আর তখনই তার মনে হত পৃথিবীর উপর থেকে সে যেন অকস্মাৎ পাতালের নাগলোকে ছিটকে পড়ে গেছে। অসংখ্য কালো কালো লিকলিকে সাপ তার চারদিকে ফণা তুলে তীব্র আক্রোশে ছোবল দিতে আসছে।

ভয়টা তার স্থায়ী হয়ে গেল। সে সাপধরা শিখতে শিখতে ছেড়ে দিয়েছিল। আনুও ছাড়লে মরতো না। কিন্তু সে কোনটাই ছাড়েনি। সাপও নয়, মদও নয়। মাতাল হয়ে সাপের সঙ্গে খেলতে গিয়েই ছোট খেল। মরবার আগে সাপের বাধাটা খেতলে দিল। আর এর অনেকদিন পরে মদ ছেড়ে দিয়েছিল বেজা।

এই সব কাহিনী অনেকেই জানত। বেজা বলত : কি বাড়ির ছেলে আমি, আর এখানি করে ফন্দীফিকিরে—

এই বেজার সঙ্গে কমলের আলাপ হয়েছিল। তখনও তার চাকরী হয়নি। পরীক্ষার পর বাইরেরী নাইট স্কুল পল্লী-উন্নয়ন ইত্যাদি এটা ওটা নিয়ে মেতেছিল। তার কাছেই বেজা দরবার চলে এসেছিল। বলল,—বাবু নাকি বাত-পাশ্‌শাল খুলেছ?

হাঁ। কে তুই?

আজ্ঞে আমি বেজা। পোনুমালের ভাই।

কমলের ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল। পোনুমালের নাম এ অঞ্চলে সকলেই জানে। গুলুমালের বেজ ছেলে। পোনু আর এক ওস্তাদ। মদ চোলাইয়ের কাজে সে খুব পাকা। এই কাজই সে করত। পেশা হয়ে গিয়েছিল তার।

আমাকে পাশ্‌শালে ভর্তি করে নেবে বাবু?

কমল সামান্য বিস্মিত। পোনুমালের ভাই লেখাপড়া শিখতে চায়?

বেজা লজ্জায় সামান্য কাতর হচ্ছিল। —আমার লেকাপড়া শেকার খুবই ইচ্ছে বাবু। হাটতলার বিধু মাজিও আমাকে এই কথা বলছেল। বলছেল, বেজা, সারাদিন যা কষিস কষিস, রেতের বেলায় পাশ্‌শালে আয় না। নিজের নামটাও তো সই করতে শিখবি। তা বলুন, যাব?

কমলের গাম্ভীর্য তরল হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা পোনুর পছন্দ হল না। তাদের বাড়ি হল গুনিনের বাড়ি। এ বাড়ীর ছেলে লেখাপড়া শিখে বাবুয়ানী করলে বাড়ির ইজ্জত নষ্ট হবে। সে নিজেও লেখাপড়া জানে না। কিন্তু তবু তার একটা আলাদা ইজ্জত আছে। পোনু তার ধরনে বলল,—কি বলব, পেশাক করেছে, নইলে হারাবজাদার পাশ্‌শালে যাওয়া তাড়াতুর।

বউ বলল,—কেন, গেলেই বা। রেতের বেলায় দু দিলে দারা করার চেয়ে তো ভাল। তোমার তো ওসব বালাই নেই, তাই রাগ।

পোনু হা হা করে হেসে উঠল। না, তার ওসব পাট নেই। লেখাপড়ার সে ধার ধারে না। লেখাপড়াটাকে জীবনে তার চওড়ার মাপকাঠি নয়। লেখাপড়া জানা অনেক লোকই তার খদ্দের। পাঁচ পাঁচ মজুর, লেখাজানুষ চাই, তাই বেজাকে রেখে না। কেউ কেউ তার যুবতী বউটার দিকেও নজর দেয়। তা দিক। সে পরোয়া করে না। বেজবউ-এর ইজ্জতজ্ঞান খুব টনটনে। সে মদ বিক্রি করে, দেহ নয়। অবশ্য তার একটু ঝোঁক আছে বেজার ওপর, পোনু বোঝে সেটা। তার সঙ্গে বেজবউয়ের বয়সের বেশ খানিকটা ফারাক। সেই ফারাকের ফাঁকে বেজা কেমন করে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হাসতে হাসতে খেমে গেল পোনু। বেজবউ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সে সামান্য ইতস্তত করল, ঐ দৃষ্টিটা অস্বস্তিকর, সে পায়ে পায়ে সরে গেল। বেজবউ-এর মুখে সূক্ষ্ম হাসি ভেসে উঠল। হাঁ, বেজাকে পছন্দ করে সে। সরল গ্রাম্য ডাকাবুকো যুবকটিকে মনে মনে কামনা করে। কিন্তু ইজ্জত হারাবে না সে। মদের মত সে অত সস্তা নয়। অন্য দিকে দুচোখ মেলে বেজা বলে, তার চোখে স্বপ্ন, বলে—জানে বেজ, কুছোবয়সেই লেকাপড়া শিকব। আর তোমার বাপের মত নেলুয়ার কারখানার কাজ করব।

এই স্বপ্নবিলাসী বেজাকে বেজবউ-এর ভাল লাগে। তাদের বাল-পরিবারের গতানুগতিক জীবনযাত্রা, ঝাঁড়ফুক সাপধরা কিংবা মদের কারবার—কোনটাই তার পছন্দ নয়। এক বস্তা পেঁয়াজ হাতে ঘরে সে সংসারযাত্রার নেবেছিল। সে নানা-রকমের বড়ি পাঁপড় আর বোমা তৈরি করত। পরবের সময় পাড়ায় পাড়ায় হাটে-বাজারে বিক্রি করত। বলত গাঁয়ে বারো মাসে তেরো পার্বণ। মাল আমার পড়ে থাকবে না।

বেজা বলত,—জানো বেজ, গুনিনের বাড়ি আমাদের। বাপ বড়ভাই নাম করে গেছে। বেজভাইও বড় হোজগারী। কিন্তুক অবদা লেকো দিকিন। ঘরশোধ যে ভাঙা সেই ভাঙা, ঘরে আগড় দুই কপাট হলনি। লাপধরা বেজেদের বাড়ি কেন।

এরকম কতদিন বলেছে বেজা। গাঁয়ের প্রান্তে তাদের বাড়ি। সর্বাঙ্গে রিক্ততা আর দীনতার ছাপ। এত রিক্ততা অন্য কোন বাড়িতে নেই। সে রায়পাড়ার কমলবাবুদের বাড়ি গেছে। মনোবিশ্ব ঘর। জালান কোঠাও নয়। তবু কত স্নিগ্ধ, কত সুন্দর। তেমনি কমলবাবুও। কে যেন বলেছিল লেখাপড়ার গুণই আলাদা। বেজাও যদি অমন হতে পারে। যদি কারখানায় চাকরী করতে পারে। নেলুয়ার কিংবা কলকাতায়।

একদিন সন্ধ্যায় বেজা এসে বলল,—হয়ে গেল বেজ। পাশ্‌শাল উটে গেল।

বেজবউ অস্ফুটে বলল,—কেন।

কমলবাবুর চাকরী হয়েছে। তোকে তো কলকাতায় চাকরী করতে যেতে হবে। পাশ্‌শাল চালাবে কে। ভাল চাকরী গো, মোটা মাইনে। আর হবে না কেন। লেকাপড়া কি কম শিকেচে। এই মোটা মোটা বই সব।

বেজবউ নিঃশব্দে চেয়ে রইল। বেজা বিড়বিড় করতে করতে বলল,—এ সব লোক কি পেরাবে পড়ে থাকবার।

গভীর মমতায় বেজবউ-এর চোখ নিবিড় হয়ে উঠল। সরলা কিসকিস করে বলল,—একটু খাবে ছোট?

বেজা হাসল। বলল, দাও। ঘরের মেজের কাঠের পিঁড়িটা সরিয়ে একটা পাঁচ বোতল বার করল বেজবউ। পুরো বোতলটাই বেজা গলায় ঢেলে দিল। ভিতরটা যেন জ্বলে যেতে লাগল। দুহাতে বুকটা চেপে ধরে অস্ফুটে বলল, এ কি খাওয়ালে বেজবউ।

কেন। কষ্ট হচ্ছে? একেবারে খাঁটি মাল কিন্তু। আচ্ছা তুমি বস খানিক, আমি তোমার বুকটা ডলে দি' একটুকুন।

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

আলো - আরও আলো

বিশেষ প্রতিনিধি

যে কোন দেশের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধির পরিকল্পনার আড়ালে থাকে বিদ্যুৎ শক্তির সম্ভার। শুধু শিল্পকলকারখানার ব্যাপক প্রসারেই নয়, সাধারণ মানুষের উন্নত মানের জীবনেও বৈদ্যুতিক সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। যে কোন শিল্পেরই দ্রুত অগ্রগতি পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

কৃষিকার্যেও আধুনিককালে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। কৃষক, উদয় অনিকে শক্তিচালিত পাম্পে জল সরবরাহ করেই ঊর্বর করে তোলা যায় বেমন, তেমনি ফসলের ক্ষেতে আবদ্ধ জলকে বের করে দিয়ে চাষের উপযোগী করতে হয়। তবেই তো দিগন্তবিস্তারী ক্ষেতে অপর্যাপ্ত ফসলের ভারে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনেও বিদ্যুৎ একটি বাস্তবতম প্রয়োজন। আলো জ্বালতে, ইলেকট্রিক পাখা চালাতে, রেফ্রিজারেটার, কুকার চালু রাখতে চাই ইলেকট্রিসিটি। আবার খাদ্যদ্রব্যকে শীতলতাপনিয়ন্ত্রিত করতেও চাই ইলেকট্রিক। অর্থাৎ বিদ্যুৎ সম্পদই আধুনিক কালের মানুষের জীবনকে সুখী, সম্পন্ন আর আরামদায়ক করে তুলেছে। এমন কি পঞ্চাশে কর্মব্যস্ত মানুষের শ্রমসেবী জীবনের একমাত্র অনাবিল আনন্দের উৎস যে সিনেমা—সেই সিনেমাও অচল হয়ে যায় বিদ্যুতের অভাবে।

ত্রিশ বছরের অগ্রগতি

স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনে আশাপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৪৭ সালে যেখানে মাত্র ১,৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো সেখানে বর্তমানে ২,১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যেখানে বাড়তি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন হবেছিল ৪,১৬০ মেগাওয়াট, সেখানে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিনবছরেই ৫,২৪১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল। নীচের পরিসংখ্যান থেকে বাড়তি বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে উঠবে—

১৯৭৪-৭৫	১,৭২৫ মেগাওয়াট
১৯৭৫-৭৬	১,৮০৪
১৯৭৬-৭৭	১,৭১২
	৫,২৪১ মেগাওয়াট।

আর চলতি বছরে (১৯৭৭-৭৮ সালে) ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে বলে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার ভেতরে ৪৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ইতিমধ্যেই উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

দেশের ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন কারখানাগুলিতে বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। তাপ এবং জলবিদ্যুতের মূল কারখানা এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনে দেশ এখন মোটামুটি-ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তাপ ও জলবিদ্যুৎ উভয়েরই বিশাল কারখানা তৈরী করা। জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে ১৬৫ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি আর তাপ-বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারে এমন সাজসরঞ্জাম দেশেই এখন তৈরী হচ্ছে।

তাছাড়া ৫০০ ভল্ট বিদ্যুতেরও কিছু বেশী পরিবহণ করতে পারে এমন ট্র্যান্সমিশান লাইন তৈরি হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ২২,৬০০ কিলোমিটার লাইন তৈরী হয়েছিল আর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এই লেভে হয়েছে ৯,২০,৫০০ কিলোমিটার। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ সালের ভেতরে ১৩,২১৯ সার্কিট কিলোমিটার ট্রান্সমিশান লাইন তৈরী পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কিন্তু একটি জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীড পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ আজও সম্ভব হয়নি। তাহোক সেই বিশাল পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য অর্থাৎ একটি বিশেষ অঞ্চল আর তারপর বিভিন্ন অঞ্চলের অন্তর্গতে জন-পদের ভিতরে বিদ্যুৎ পরিবহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অঞ্চলের ভেতরে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের সুষ্ঠুভাবে পরিবহণের জন্য প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য যেমন লোড-ডেসপাচ কেন্দ্র আছে তেমনি আমাদের দেশের উত্তর, পশ্চিম দক্ষিণ, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পর-স্পরের ভেতরে যাতে বিদ্যুৎকে পরিবাহিত করা যায় তার জন্যও অন্তবর্তী বিদ্যুৎ যোগান দেওয়ার কেন্দ্রগুলি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এইসব অঞ্চলে যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যায় তার জন্য উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত বিভিন্ন লোড ডেসপাচ স্টেশন স্থাপন করার যে ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে তা ১৯৮০-৮১ সালের ভেতর সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

জাতীয় বিদ্যুৎ উন্নয়নপরিকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে গবেষণা আর প্রশিক্ষণের কাজ। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ গবেষণা কেন্দ্রকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। আর হটলাইন ট্রেনিং, লোড-ডেসপ্যাচ ট্রেনিং এবং থার্মাল অপারেশন ট্রেনিং-এর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিরও উন্নতিবিধান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুত সংস্থা

আরও বেশী করে বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক সংস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। দেশের বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে হলে পুরো বিদ্যুত শিল্পকেই ঢেলে সাজাতে হবে। রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদগুলির কাজকর্মের আরও উন্নতি করতে হবে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে আরও ব্যাপকভাবে বিদ্যুত উৎপাদনের, পরিবহণের এবং তার কারিগরী সম্পর্কিত মূল্যায়ণের একটা বিশেষ পরিকল্পনাও থাকা দরকার।

এক্ষেত্রে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক আইনের প্রধান প্রধান কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করবার জন্যই বিদ্যুত সরবরাহ আইন সংশোধিত হয়েছে। সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী জাতীয় বিদ্যুত উৎপাদনের পরিকল্পনা রচিত হবে। তাছাড়া অর্থ বিনিয়োগ করার আগে এক কোটি টাকার অতিরিক্ত সমস্ত তাপ-বিদ্যুত উৎপাদন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কারিগরি ও আর্থিক দিক থেকে মূল্যায়ন করবে। শুধু তাই নয় বিদ্যুত উৎপাদনের সমৃদ্ধির জন্য এই আইন কারিগরী নির্দেশ এবং পরামর্শ দেবে। আবার এই আইনের ভিতরেই আছে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যুত উৎপাদনের কোম্পানী স্থাপন করে আমাদের বিভিন্ন তাপ-বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রের দক্ষতাকে এবং প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুত উৎপাদন শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলার পরিকল্পনা। আশা করা যায়, এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতা যেমন বাড়বে তেমনি এই বিষয়ে বহুমুখী বিশেষজ্ঞ কারিগরেরও সৃষ্টি হবে।

বিদ্যুত উৎপাদন, পরিবহণ এবং বন্টনের ক্ষেত্রে আছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এক্ষেত্রে গবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুত উৎপাদনের বর্তমান কেন্দ্রগুলির উৎপাদন দক্ষতাবৃদ্ধি ও সাজসরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণেও জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুত শক্তি অর্থাৎ পাওয়ার হলো এমন এক শিল্প যে শিল্পে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। তাই বিদ্যুত উৎপাদন বাড়াতে হলে প্রয়োজন নিরলস-ভাবে বিভিন্ন বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রগুলির পুনর্গঠন এবং তাদের কার্যকর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রতি পরিকল্পনারই অঙ্গ নিহিত আছে কেন্দ্রীয় বিদ্যুত আইনের ভেতরে। রাজ্য সরকারগুলি অথবা এই দুটো কাজই সুষ্ঠুভাবে করছেন।

ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা

বর্তমানে ভারত সরকার ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যুত উৎপাদনের পরিকল্পনা রচনার নিয়ত লগ্ন বার্ষিক বিদ্যুত সমীক্ষকদল সম্প্রতি ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদার ওপর একটি সমীক্ষা করেছেন। অনাগত কালের এই চাহিদার কথা মনে রেখেই ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮২-৮৩ পর্যন্ত ভবিষ্যতের চাহিদা এবং সেই চাহিদা মেটাতে হলে কি কি প্রকল্প নিতে হবে কেন্দ্রীয় বিদ্যুত কর্তৃপক্ষ তার একটা প্রাথমিক হিসাবও করেছেন। প্রাথমিক এই গবেষণার ভেতরে ভারতের প্রামে প্রামে বিভিন্ন জনপদে বিদ্যুত সরবরাহেরও কর্মসূচী রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে অর্থাৎ ভারতের মাত লক্ষ গ্রামের নিবিড় অন্ধকারকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিতে হলে ২২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুত আগামী পাঁচ বছরের ভিতরে উৎপাদন করতে হবে।

জল বিদ্যুত

আমাদের দেশে জলবিদ্যুত উৎপাদনের অপর্যাপ্ত সম্ভার ছড়িয়ে রয়েছে দিকে দিকে। দেশের আরও কোন জায়গায় অনেক খরস্রোতা নদীতে জলপ্রপাতে বিদ্যুত শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, জল-বিদ্যুত উৎপাদনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে সেই সম্ভাব্য স্থানগুলি নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে এবং দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনে দেশের জলবিদ্যুত সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। সর্বব্যাপী জাতীয় সমীক্ষার মাধ্যমে দেশের জল-বিদ্যুতের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে জন-সাধারণের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্যই কেন্দ্রীয় বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের ভেতরে আলাদা একটা বিশেষ কমিটি বা সেল গঠিত হয়েছে।

জল-বিদ্যুত শক্তি শুধু যে অফুরান তা নয়। --ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং সুলভ উপকরণও বটে। আরও সুবিধা আছে। অন্ধ ও উন্নত যেখে করে আসা সেই অফুরন্ত সলিল সম্ভারকে যখন বড় বড় জলাধারে সঞ্চিত রাখা সম্ভব হয় তখন সেই জল থেকে এই জলবিদ্যুত উৎপাদন খুব সুষ্ঠুভাবে খুলতে হয়। তাই বলাই বাহুল্য—বিদ্যুত শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন জল-বিদ্যুত উৎপাদনের ওপর।

তাপ-বিদ্যুত

একথা অনস্বীকার্য, ভারী ভারী শিল্প চালনে যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তার জোগান দেয় বিভিন্ন তাপ-বিদ্যুত কেন্দ্র। প্রত্যেক রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা এবং সেই রাজ্যের বিদ্যুত উৎপাদন শক্তির পরিবাপের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাপ-বিদ্যুত কেন্দ্রগুলো বসানো হয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটি অঞ্চলে বিদ্যুত শক্তির সরবরাহের কেন্দ্রীয় পরি-কল্পনা অনুযায়ী সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বসানোরও পরিকল্পনা আছে। যেখানে সম্ভব বর্তমানের তাপবিদ্যুত কেন্দ্রগুলোর সম্প্রসারণ করে বিদ্যুত-শক্তির উৎপাদন আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে।

অনাগত ভবিষ্যতের আশা

বিদ্যুত পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যই হলো বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলে চাহিদা অনুযায়ী জোগানকে অব্যাহত রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুত মন্ত্রক সম্প্রতি এই পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন—

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

খরা সারা পশ্চিমবঙ্গে ডালের সমস্যা। এখন চাষীরা অধিক লাভজনক আলু পাট প্রভৃতি অর্থকরী চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। বর্তমান বাজার দামের দিক থেকে ডালেরও অর্থকরী ফসলের মর্যাদায় এবে চাষীরা লাভবান হতে পারেন। ফেব্রুয়ারীর শেষে বা তার কিছু পরেও চাষ করা চলে। অবশ্যই মাটির আর্দ্রতা ও পরিবেশ অনুসারে সময়ের কিছুটা হেরফের হতে পারে। বাদি ধান, আলু, সর্ষে, এমন কি জাঠো গম তুলেও এই দুই জাতের মুগ চাষ করা চলে। তবে আবহাওয়া সামান্য উষ্ণ হলে বীজের অঙ্কুর ভাল হয়।

এই দু-জাতের মুগের নাম যথাক্রমে ভিলে-মুগ আর বি-১ মুগ। হিসেব নিলে দেখা গেছে বি-১ মুগ একটি প্রেষ্ঠ উচ্চ ফলনশীল জাত বলে গণ্য হয়েছে। এটি পূর্ববর্তী সমস্ত মুগের ফলনের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। কাজেই এ-জাতের মুগ চাষ করা যে অধিক লাভজনক হবে, সন্দেহ কি। অবশ্য ভিলেমুগও এ শ্রেণীর মুগ হিসেবে চাষীদের কাছে একটি প্রিয় নাম। কাজেই ভিলে-মুগের চাষও লাভজনক।

মুগচাষের জন্যে মাটিতে ৩।৪ টি চাষ দিলেই সাধারণত মাটি তৈরী হয়। বিশেষ ক'রে যেসব জমি উঁচু, যাতে বোরো চাষ বা অন্যান্য চাষ করা সম্ভব হয় না সেচের বা জলের অভাবে, সে-সব জমিতে সময় মত মুগ চাষ করলে ফল ভালই পাওয়া যায়।

উচ্চফলনশীল মুগ বি-১ চাষ করার জন্যে উপরের উপায়ে মাটি তৈরী ক'রে নিয়ে বীজ বুনে দিতে হয়। সাধারণত এতে সেচের দরকার হয় না। কিন্তু মাটি খুব শুকনো হয়ে গেলে বা আর্দ্রতার একান্ত অভাব ঘটলে দু-একটি হাল্কা ধরণের সেচ দিলে ভাল হয়। তাতে ফলনের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

এই চাষে জমিতে সার প্রয়োগ করার দরকার হয় না। পূর্ববর্তী চাষ আলু, ধান, গম, সর্ষে প্রভৃতি চাষের সময় যে খোল সার প্রয়োগ করা হয়েছে, তার কিছু অংশ থেকে যায় আর তাতেই মুগ গাছের পুষ্টি সাধন হয়ে যায়। তবে অনুর্বর জমিতে শেষ চাষ দেবার সময় বিঘা পিছু তিরিশ কিলোগ্রাম সুপার-ফসফেট ও দেড় কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন দিলেই চলে। এক্ষেত্রে মাটির গুণাগুণের কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে মাটি পরীক্ষা করানো দরকার।

জন্য জাতের মুগে পোকা লাগার সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য বি-১ মুগেও যে পোকা লাগে না, এমন নয়। যাই হোক, যে কোন ধরণের মুগেই পোকা লাগলে ডি-ডি-টি বা বি-এইচ-সি প্রয়োজন মত জলে গুলে ছিটিয়ে দিয়ে পোকার আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

মুগ তুলি থেকে গেলেই তা তুলে ফেলতে হবে। ফলে দু-ভাবে ভোগা যায়। গাছ উপড়ে জড়ো ক'রে শুকিয়ে বা দিয়ে শুদ্ধ পৃথক ক'রে নেওয়া। এতে গাছ পাতাগুলি আলাদি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে মেহেনত খুব কমে লাগে। তুলবার ব্যাপারে গোল অর্থাৎ গাছপাতার টুঁটো থেকে শুদ্ধকে পৃথক করতে হয়। আরেকভাবে শুদ্ধ সংগ্রহ করা যায়—কেবল মাত্র ডাঁটিগুলিকে তুলে নিয়ে জমিতে গাছ রেখে দেওয়া। ঐ গাছ জমিতে চাষ দেবার সময় মাটিতে মিশে গিয়ে সারের কাজ

তিলে-মুগ ও বি-১ মুগ চাষ করুন

দীনবন্ধু হাজরা

মুগবীজ বোনার জন্যে সক্ষ চাষী চাষের কৌশলেই ছড়িয়ে দিতে পারেন। তবে বর্তমানে সাধে ক'রে না ছড়িয়ে অনেকে সীড ড্রিল দিয়ে মুগবীজ বুনে থাকেন। সীড ড্রিলের সাহায্যে বুনলে বীজ ভাল ভাবে গজানো হয়। বীজও কম লাগে। এক বিঘে জমিতে তিন কিলোগ্রাম মুগ বীজ লাগে। ছড়িয়ে বুনলে একটা চাষ দিয়ে মই দেওয়া দরকার। বীজ বোনার পর মাটিতে রসের অভাব থাকলে হাল্কা ক'রে একবার জল ছাপ্‌টে দিতে হবে।

অনেক সময় মুগ ক্ষেতে ঘাস ও আগাছার বাড়াবাড়ি দেখা যায়। সেগুলি নিড়িয়ে দেওয়া দরকার। কেননা, আগাছারা ফসলের বাড় নষ্ট করে দেয়। আগাছা যদি বেশি হয় বা একবার নিড়িয়ে দেবার পর আবার বেশি পরিমাণে বাড়তে সুরু করে তবে এক লিটার "টোক-ই-২৫" ২৫০ লিটার জলে গুলে এক একর জমিতে ছিটিয়ে দিলে আগাছার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

বি-১ জাতীয় মুগ-গাছে বা শুঁটিতে পোকা কম লাগে। এ-দিক থেকে বি-১ মুগই চাষ করার পক্ষে নিরাপদ। কেননা, করে। অবশ্য এটি অধিক পরিশ্রম সাপেক্ষ বা ব্যয় বহুল। তবে একটি কথা এখানে ব'লে রাখা দরকার। শুঁটি জাতীয় যে কোন ফসলের চাষের ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন জমা হয়। তা আগামী ফসলের পক্ষে খুবই উপকারী হয়ে থাকে। আর ঐ গাছগুলিকে মাটিতে মিশিয়ে দিলে তো কথাই নেই।

এক বিঘা জমিতে ভালভাবে মুগ ফলাই হলে ৬-৮ মন ফলন হতে পারে। বাজার দর কম পক্ষে ৬০০—৮০০ টাকা। এতে খরচ বা দিনিবোগ কম, জলের বিশেষ প্রয়োজন নেই, অথচ লাভ মোটামুটি মাঝারি হয় না। এত কম খরচে এমন একটি অর্থকরী চাষ সত্যিই ভাল।

একটি মাঝারি কৃষক পরিবারের জন্য আট-দশ কাঠা জমিতে মুগ চাষ করলে সারা বছরের ডাল খাওয়ার আর কোনো সমস্যাই থাকে না। তাইতো আমরা আশা করবো, পশ্চিমবঙ্গের চাষীভাইরা মুগ চাষ করুন—যেকোনো একটি উচ্চ-ফলনশীল মুগের চাষ।

গ্রন্থ আলোচনা

প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। কার্মা কে. এল. এম. (প্রাঃ) লিমিটেড ২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০১২। মূল্য ১২ টাকা।

এরকম বিরল একটি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে গ্রন্থকার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটি নানা বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। স্বাধীনতা-উত্তর কালে আধুনিক ভারত গঠনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন জাতীয় ইতিহাস চেতনা, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় পরিচয় ও সভ্যতার ইতিহাসে স্বদেশের স্থান সম্পর্কে চিন্তাবদ্ধ জ্ঞান। এজন্য অনুশীলিত হওয়া প্রয়োজন জাতীয় ইতিহাস। প্রাক্ বৈদিক যুগের পথ পরিক্রমা করতে গিয়ে লেখক ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করেছেন। সেই ইতিহাস পথচারনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র ভারতের বহু বিচিত্র প্রদেশ, স্থল ও জনপদের বিচিত্র সংযোগ-সরণি কি ছিল তা অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগে পৌঁছেছেন। তিনি কেবল বিচিত্র পথরেখা ও তৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাস অনুসন্ধান করেননি, সেই সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের পরিচয়ও মূল্যবান তথ্যাবলীর সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান-পূঁজি বিপুল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা ও বাংলায় অনূদিত গ্রন্থ এবং ইংরেজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বিপুল সংখ্যক গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে, তা থেকে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে, তিনি এই আকারে বাস্তবিক কিন্তু প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ এই সুখপাঠ্য ও মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এজন্য ইতিহাসের অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্র ও পণ্ডিতবর্গ তো উপকৃত হবেনই, পরন্তু ইতিহাস-মনস্তিত্ব সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থপাঠে কৌতূহলী হলে তিনিও বহুতথ্য লাভে পরিতৃপ্ত হবেন। এজন্য পাঠক মাত্রেই তিনি প্রশংসা পাবেন।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা, সিন্ধু সভ্যতার যুগ, বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের পথ-পরিচয়, মৌর্যযুগ, গুপ্তযুগ, কনাকুষ সাম্রাজ্যের যুগ, হিন্দুরাজত্বের অবসান কাল, দক্ষিণ ভারত, বাঙ্গলা ও বাঙালি—এই এগারোটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে—(ক) মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ, (খ) প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পথ-প্রসঙ্গ। এ ছাড়া গ্রন্থপঞ্জী, ভৌগোলিক নামের নির্ঘণ্ট এবং মানচিত্রে প্রাচীন ভারতের মুখ্য পথাবলীর রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থটির জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় যে প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাটি লিখেছিলেন তা গ্রন্থের প্রথমেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রতি অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এক একটি স্বতন্ত্র মানচিত্র থাকলে আরও শোভন হত।

নিশিকান্ত মজুমদারের কয়েকটি কবিতা। অরুণা চৌধুরী সম্পাদিত। পরিবেশক—দাসগুপ্ত প্রকাশন। সি ১৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২ মূল্য—০.৫০।

কবি নিশিকান্ত মজুমদারের কবিতার প্রচলিত ঐতিহ্যেরই অনুবর্তন। জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচলিত আদর্শ সম্পর্কে সচেতনতা এবং লোভশূন্য সমাজে আস্থা—তাঁর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থে উন্মোচন। 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'গান্ধীজী' প্রমুখ কবিতায় তিনি সৌন্দর্য ও মঙ্গলবোধে উদ্দীপ্ত। আর এক ধরণের কবিতায় বিশ্বব্যাপী চিরন্তন কল্যাণ লক্ষ্মীর বন্দনা—যার প্রকাশ 'শান্তি' ও 'চিরন্তনী' প্রভৃতি কবিতায়। প্রভূত প্রভূতে গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্যপটে বিচিত্রিত বর্ণ রূপ ও প্রীতিপূর্ণ ভাবের যে খেলা চলে—কবির কবিতায় তা পড়ে তার চলচ্ছবি। কখনো বা এক অহিংস অথচ প্রতিরোধী চেতনা দিয়ে 'বড়ের পাখুলিপি' প্রভৃতি কবিতায় কবি অনুভব করেন শোষণমুক্ত জন সমাজের আসন্ন অভ্যুদয়কে। তিনি সৌন্দর্যপিপাসু শান্তিকামী মানবমুক্তি প্রয়াসী কবি।

মাসিক বাংলাদেশ। বিশেষ অনুবাদ সংখ্যা। সম্পাদক-অরুণ-কুমার রায়। মার্কেন্টাইল প্রিন্টিংস্ ৯, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ২ টাকা।

মাসিক বাংলা দেশের এই বিশেষ সংখ্যায় রয়েছে বিদেশী কবিতা ও ছোট-গল্প, প্রতিবেশী অন্যান্য সাহিত্যের কবিতা ও ছোট গল্প এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষা—সাঁওতালী, রাভা ও রাজবংশী কবিতার অনুবাদ। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ভাষার কবি, সাহিত্যিক, কবিতা ও ছোটগল্প সম্বন্ধে আলোচনা। তারাপদ ভট্টাচার্যের 'শকুন্তলা' অনুবাদ মনোজ্ঞ। হিন্দী লেখক কৃষাণ চন্দরের গল্পের অনুবাদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, লোরকা সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং কবিতার অনুবাদপ্রসঙ্গে পবিত্র সরকারের আলোচনা মনোগ্রাহী।

চারণ। গল্প-কবিতার বিশেষ অনুবাদ সংখ্যা। সম্পাদনা : তপন ঘোষ। ৪।১, জয়নারায়ণ ঘোষ লেন হাওড়া:-৭১১১০১৬। মূল্য—২.৫০।

পত্রিকার এই সংখ্যায় হিন্দী উর্দু গুজরাটি, পাঞ্জাবী ও ওড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কবিতা ও গল্প অনুবাদ করা হয়েছে। জার্মান, রুশ, ইংরেজি, ফরাসী ও চীনা প্রভৃতি দেশের কবিতা ও গল্প অনূদিত হয়েছে। প্রখ্যাত দেশী লেখকের মধ্যে আছেন সুমিত্রানন্দন পন্থ, অর্জুন ডাঙ্গেরী ও আবদুর রশীদ খান ইত্যাদি। অনুবাদকদের মধ্যে রবীন্দ্র-নাথ, যোগানন্দ বিশ্বনাথন্ ও নচিকেতা ভরদ্বাজ উল্লেখযোগ্য। 'মূল লেখক পরিচিতি' আকর্ষণীয় সংযোজন।

স্নেহময় সিংহরায়

শীতের অতিথি - যাযাবর পাখি

চিত্তরঞ্জন দাশ

শীত পড়েছে, আলিপুর চিড়িয়াখানায় নবাগতদের ভিড় জমেছে। চিড়িয়াখানা চত্বরে আলো বিথে সরোবর জুড়ে এই পাখিদের সাময়িক আস্তানা গড়ে ওঠে। ওদের আগমনের কলকাকলিতে চিড়িয়াখানা হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। প্রতি শীতে হাজার হাজার দর্শক এই সরোবর ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ উপভোগ করেন।

এই পাখিদের এখানে সাময়িক আস্তানা, তাই ওরা যাযাবর বলেও সমধিক পরিচিত। এই যাযাবর বা নবাগত পাখির আগমন ও প্রস্থান বস্তুতঃ কলকাতাতে শীতের সূচনা এবং পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। যাযাবর পাখিদের এখানে এই আগমন ও প্রস্থান চলে আসছে এই শতাব্দীর গোড়া থেকে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে এই পাখিদের যাযাবর বৃত্তির সঠিক কারণ আজও রহস্যাবৃত। উড়ুক্কু পাখিমাত্রেই কমবেশি যাযাবর প্রকৃতির। যাযাবর প্রবৃত্তি নাকি এদের স্বভাবজাত। এই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল চিড়িয়াখানার অধিকর্তা প্রাণী বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরবেন্দ্র নাথ গুহের সঙ্গে। ডাঃ গুহ কথায় কথায় বললেন, এদের যাযাবর প্রবৃত্তির কতকগুলি নয়, কারণও আছে, যেমন খাদ্যাভাব, জলাভাব। এছাড়া হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন। দিনের আলোর স্বল্পতা। অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরম বা হঠাৎ বায়োমেট্রিক প্রেসার বেড়ে যাওয়া অথবা চোরা শিকারীর উৎপাত বা প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন বড় রকমের পরিবর্তন হলে এরা নিজেদের আস্তানা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। যাযাবর অনেক সময় দেখা যায় যে কোন কোন জাতের পাখি যেমন শামুকখোল, পেলুইন, ফ্লেমিংগো প্রজননের সময় সাময়িকভাবে যাযাবর পাখি আসে। থাকে মাত্র শীতটা। নভেম্বর মাসের প্রারম্ভ থেকে শুরু হয় এদের আসা এবং থাকে মার্চ মাস পর্যন্ত। শীতও চলে যায়, ওরাও ফিরে যায় ওদের পুরোনো আস্তানায়। আসে নীল ডানায় ভর করে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে পিনটেল ডাক আসে ক্যাস্পিয়ান সাগর এবং সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে। মাঝে মাঝে আসে মাঝারী মাপের চখা-চখি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে। আর আসে উত্তর ভারতের হিমালয়ের পাদদেশ থেকে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট বিল্‌ড ডাক বা ওয়াইল্ড, বড়-সরাল বা গ্রেটার হুইসলিং টিল্‌স, ছোট সরাল বা লেসার হুইসলিং টিল্‌স, পাকুড়ে বা কোমডাক বাস্টার্ড কমন পোচার্ড বা দু একটি রেয়ার কুটকেও আসতে দেখা যায়। এদেরকে বলে স্থানীয় নবাগতা পাখি। এরা প্রতি বছরই শীতের সময়ে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের দেয় অকৃত্রিম এবং অফুরন্ত আনন্দ, আর তাছাড়া কিছু স্থানীয় পাখিও আসে যাদের দেখতে পাওয়া যায় এখানে, এদের মধ্যে আছে লাইট হেরন বা ওয়াক্‌ ওয়াক, কোরমরান্ট বা পানকৌরী, কেক-বার্ড বা গাদার ইত্যাদি। এরা দিনের বেলাটা থাকে এই আশ্রয়ে আর সন্ধ্যের মুখে চলে যায় বহুদূর পেরিয়ে ফসলের ক্ষেতে খাদ্য-অন্বেষণে তাদের পাখার ঝাপটের খোঁজে।

এক সময়ে কলকাতা পত্তনের আগে পাশের জলাভূমিতে এই ধরনের যাযাবর পাখি ভিড় করতো, তখন এই জলাভূমিগুলিতে বসতি গড়ে ওঠাতে এবং শিকারীদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে এরা সেদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছে। এখন কলকাতা শহরের বুকে আলিপুর চিড়িয়াখানার সরোবর এদের একমাত্র অভয়াশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই যাযাবর পাখিরা যে কী করে দেশ দেশান্তর পেরিয়ে চলে আসে, কী দিক দর্শন যন্ত্রে তারা নিজেদের পথ চিনে নেয়, এও এক বিস্ময়ের এবং অপরিজ্ঞাত

অধ্যায়। কেউ বলেন, আকাশের গ্রহতারা দেখে এরা দিক নির্ণয় করে। কারো মতে, পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণে তারা নিজেদের পথ চিনে নিতে পারে। আবার কারও মতে নদীর গতি পথ যাযাবর পাখিদেরকে পথের নির্দেশ দেয়; কারও কারও মতে স্থানী বন দিক চিহ্ন থেকে তারা পথের সন্ধান পায়। তবেই দেখা যায় আসবার সময় অপেক্ষাকৃত বুড়ো পাখিগুলি সামনের ঝাঁকে থাকে এবং তারাই বাচ্চাদেরকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসে, আর ফেরার সময় বাচ্চা পাখিগুলো থাকে সামনের সারিতে, বৃদ্ধগুলো পিছনে। আগামী বছর পর্যন্ত এরা যদি না বেঁচে থাকে তাই হয়তো। উত্তরাধিকারীদেরকে যাযাবর বৃত্তির বহস্য এবং সংকেত শিখিয়ে দিয়ে যায়।

কলকাতার এই অঞ্চল উত্তরোত্তর জেগে উঠছে। দিন-দিনই আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে ডিজেলের ও কলকারখানার ধোঁয়ায়। চিড়িয়াখানার আশেপাশে গগন ভেদ করে উঠেছে অজস্র ফ্ল্যাট সভ্যতার আর সন্তানী সুচতুর পাখি শিকারীরাও সজাগ। এই চিড়িয়াখানার আশেপাশে অসংখ্য ঘুড়ি উড়িয়ে তার সুতোয় মাঞ্জা দেবার বঁড়শী লাগিয়ে এই নিরীহ পাখিদের ধরবার জন্য ফাঁদ পেতে রয়েছে। ওড়ার পথে ওদের প্রতিবন্ধক এই সব ঘুড়ি। জানিনা, আর কতদিন এই সুন্দরের নীড়ের অতিথিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে এই চিড়িয়াখানার এই অভয়াশ্রমে। আমন্ত্রণ জানাবে কতদিন।

মদ বর্জনে বাধা কোথায়

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কর্মসূচী না গ্রহণ করে, মদ বিসর্জন দিলে চোলাই মদের কারবার ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে। তাতে মহাচার ছাড়াও স্বাস্থ্যের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতি হবে। এবং চোলাই মদ খেয়ে মৃত্যুর হারও বেড়ে যাবে। ভাল করার নামে যদি খারাপই বেশি হয়—তা হ'লে সেই "ভাল" করার আগে আরও কিছু ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

সরকারী বেসিনারী মদ চোলাই বন্ধ করতে কতটা সমর্থ হবে—এ বিষয়ে কোন কোন মহল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের নিঃসন্দেহ ও নিঃসন্দেহ করতে এখনো কোন কথা শোনা যায়নি। অবশ্য স্বীকার ক'রে লাভ নেই যে এই ব্যাপক বিষয়ে সাফল্য লাভ করা সরকারী যন্ত্রের একার পক্ষে সম্ভব নয়। জনসাধারণ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিরও এবিষয়ে অনেক কর্তব্য রয়েছে। কাগজে কলমে তাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিলে মদবিসর্জন সফল হবে না—প্রতিষ্ঠান-গুলিকে উপযুক্ত ক্ষমতাও দিতে হবে। সে ক্ষমতা কি ভাবে দেওয়া যাবে তা-ও ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।

কেউ কেউ মনে করেন, মদ বর্জন কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে চালু করলে উভয় দিক বজায় রাখা সম্ভব হবে। মদ ব্যবহারের ব্যাপকতা নিঃসন্দেহে গ্রামাঞ্চল থেকে শহর, শিল্প ও খনি এলাকায় বেশি। অথচ আজ পর্যন্ত দেশে সুরাপায়ীর সংখ্যা নিরূপণ করা হয়নি। হয়ত বা কেউ কোন চেষ্টাও করেননি। দেশের মানুষের কত শতাংশ মদ্যপায়ী—তার একটা হিসাব থাকলে মদ বিসর্জনের কার্যসূচীকে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি রূপায়ণ করা যেত। সরকার অথবা কোন জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান সুরাপায়ী সুমারির দায়িত্ব নিতে পারেন কি?

আমি বিশ্বাস করি, মদ বিসর্জনে নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিই শুধু হবে না—দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে যে মানুষগুলো নিঃশ্বাস নিতে পারেনা তাদেরও আর্থিক উন্নতি অবশ্যই হবে।

ধাঁধা

১। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রটি কোথায়?

২। শেক্সপিয়ারের সর্বশেষ নাটক কোনটি?

৩। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'র কত সময় লেগেছিল?

৪। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অন্য কি নামে পরিচিত?

৫। ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডনের আগে কোথায় ছিল?

৬। 'জন-গণ-মন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে কবে গ্রহণ করা হয়েছিল?

৭। ভারতের কোন্ শহরে প্রথম নিউজপ্রিন্ট মিল স্থাপিত হয়েছিল?

৮। মোহনবাগান এবার কোন কোন খেলায় জিতে ত্রিমুকুট বিজয়ী হল?

—রহস্য

১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আলো আরও আলো

—কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরে বিদ্যুত উৎপাদনের কাজে পরস্পরের ভেতরে যোগাযোগ ও সহযোগিতা রাখতে হবে।

—বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের সময় হ্রাস করবার জন্য উন্নততর নির্মাণ-পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

—শ্রম-শক্তির প্রয়োজনীয়তার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে হবে।

—উৎপাদন কারখানার প্রস্তুতি পর্ব কমাতে হবে।

—যেখানে সম্ভব সেইখানে তাপ-বিদ্যুত কারখানা তৈরির জন্য তাপ যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হবে।

—বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নকশার মান-নির্ধারণ করতে হবে।

—নির্ধারিত সময় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বন্টন করতে হবে।

—কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজ্য স্তরে তাপ-বিদ্যুত উৎপাদন ও সরবরাহ করতে হবে।

১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালের ভেতরে বিদ্যুত-উন্নয়নের পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত করতে হবে।

স্ত্রীশ্রমের মর্যাদা চাই

অঞ্জলি চৌধুরী

জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিতে হবে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকার। এই সম-অধিকারের দাবীতে মহিলা সমাজ আজ সোচ্চার। সমতা, ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৫ সালের পালিত হল বিশ্বনারীবর্ষ। সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি পথ নারীর অর্থনৈতিক উন্নতি। মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশে আজ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আলোচনা করা যাবে বিশ্বের অর্থনীতিকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

বাইবেলের সময় থেকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে পৃথিবীর উৎপন্ন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী মহিলারা উৎপাদন করেন। প্রাচীনকালে কৃষি ও কুটিরশিল্পের জন্ম ও আধিপত্য এক সময় মহিলাদের হাতেই ছিল। আজও তাঁদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এবং তাঁদের সহায়তায় পৃথিবীর কৃষিনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্বে মোট ১৬০ কোটি চাকরীজীবীর মধ্যে ৫৬.২ কোটি মহিলা। এই সংখ্যা ২০০০ সাল নাগাদ ৮৫ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।

এবার ভারতবর্ষের কথায় আসা যাক্। এখানে মহিলা কর্মীর কাজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর কাজ কৃষি সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ—কলকারখানা এবং খনি সম্বন্ধীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কাজ, অফিস আদালী, শিক্ষকতা ডাক্তারী ইত্যাদি।

প্রথম শ্রেণীর কাজ আদিমকাল থেকেই মেয়েরা করে আসছেন। এছাড়াও তাঁরা কাজ করছেন নানা চা বাগিচায়। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ আরম্ভ হয় অর্থাৎ কারখানা ও খনির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই। তৃতীয়শ্রেণীর কাজে অবশ্যই বেশীর ভাগ মহিলা ও শিক্ষিতরাই যেতে পারেন। এঁরা মোটামুটি অফিসে চাকরী, কলেজে কাজ করছেন অথবা ডাক্তার, নার্স-দাই, উকিল-ব্যারিষ্টার হিসেবে নিযুক্ত আছেন। তাঁরা একদিন অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন তাঁরাই আজ এসব কাজে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের ঘরে ও বাইরে দৈতভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। এঁদের চাকরী করার মূলে রয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমানবৃদ্ধি এবং মানুষ জীবনযাপনের বাসনা। বর্তমানে আমাদের দেশে ২৬ কোটির কিছু বেশী মহিলা মধ্যে ৩½ কোটির কিছু বেশী মহিলা কর্মরতা। পুরুষদের সংখ্যা এর চারগুণ। এদের মধ্যে আবার কর্মরতা ১ কোটি মহিলাই গ্রামে বাস করেন এবং কৃষি-কাজের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭১ সালে আদম-সুমারী অনুযায়ী, শতকরা ৮০ জন মেয়ে-কর্মী কৃষি কিংবা ক্ষেতখামারের সঙ্গে যুক্ত। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে খনির কাজে নিযুক্ত ছিলেন ৬,৩০,০০০ মহিলা। ঐ সময় কলকারখানায় মেয়ে-কর্মীর সংখ্যা ছিল ১,৯২,০০০। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, মেয়েকর্মীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১১ ভাগ। এছাড়া বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন কারখানার কথা, পাটের মিল, চা-বাগিচায়, ঔষধের কারখানায়, জুতো ও বেডিওর ফ্যাক্টরীতে অজস্র মেয়েকর্মী আছেন। তাঁদের সঠিক সংখ্যা অবশ্য আদমসুমারীতে পাওয়া যায় নি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধা রয়েছে। অধিক পরিশ্রমের তুলনায় তাঁরা পুরুষ কর্মীদের চেয়ে কম মজুরী পান। মহিলাদের ক্ষেত্রে মজুরীর তারতম্য দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে বিশ্বের মেয়েদের সমস্যা নিয়ে কয়েকটি সূত্র অনুমোদন করা হয় এবং এই সূত্রগুলি প্রয়োগের জন্য সদস্যদের চেষ্টা চলে। প্রসব হতে কোন মেয়েকর্মী সন্তান-সম্ভবা হলে তাঁর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা আছে। দ্বিতীয়তঃ, রাত্রের শিফটে মেয়েদের কাজ করায় বিধি-নিষেধ আরোপ করার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, খনির কাজে মেয়েদের কাজ করা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

চতুর্থতঃ, মালিকের খরচে মেয়ে কর্মীদের জন্য শিশুপালনাগার বা ক্রেচের ব্যবস্থা করা এবং শিশুকে স্তন্যপান করাবার জন্য কাজ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছুটি দেওয়া।

পঞ্চমতঃ, সমান কাজের জন্য সম-মজুরীর প্রবর্তন করা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের সদস্য দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ এই অনুমোদন মেনে নেয় এবং স্বাধীনতালাভের পর এর অধিকাংশই কার্যকরী করে।

এসব সত্ত্বেও মেয়েকর্মীদের সম্পর্কে অনেক কিছুই চিন্তা করার আছে। পুরুষের সঙ্গে তাঁদের পরিশ্রমের বৈষম্য এখনও কাটে নি। ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে ৯ ঘণ্টার বেশী কাজ করা

কথা নয়। এক নাগাড়ে ৪ ঘণ্টা কাজের পর তাঁদের আধঘণ্টা ছুটি দিতে হবে। চা, কফি, বরফ ইত্যাদি বাগিচায় মেয়েদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে শীতে ৬ ও উত্তর ভারতে যথাক্রমে ৬ ঘণ্টা ও ৭ ঘণ্টা। কিন্তু আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বাগিচাগুলিতে মেয়েরা সবসময় পুরুষদের চেয়ে বেশী কাজ করে। এই মেয়েদের অধিকাংশই নিরক্ষর এবং অসংগঠিত এবং তাঁদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নেই। সুতরাং তাঁদের ভয় দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ বাড়তি সময় যথেচ্ছভাবে খাটিয়ে নেয়।

মেয়েদের এই সমস্যাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৭৬ সালে সমবেতনী আইন Equal Remuneration Act, 1976 প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের বলে স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর পার্থক্য দূর করা হয়। একই কাজে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একই মজুরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোন্ কাজে শতকরা কতজন স্ত্রী ও কতজন পুরুষ নিয়োগ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার।

এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কোন্ শিল্পে পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে স্ত্রীশ্রমিককে বেশী কাজে লাগানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এইসব শিল্প সংস্থানে স্ত্রী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে মহিলাদের শ্রমিকরূপে আরো বেশী কাজে লাগাতে হবে, তাছাড়া গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। মেয়েদের চাকরীক্ষেত্রে স্বনশীলতা অনেক বেশী বাড়ানো দরকার, কারণ মহিলাদের অনেকেই বিবাহিত হবার পর প্রথম কয়েক বছর সন্তান প্রতিপালনের জন্য চাকরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে মেয়েদের চাকরীর নিরাপত্তা ও প্রমোশনের কথা চিন্তা করতে হবে। পশ্চিমী কয়েকটি দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও পারিবারিক ও সন্তান প্রতিপালনের চাপে যেসব মহিলারা চাকরীতে ঢুকে পড়েছে কিংবা যাঁরা এই একই কারণে চাকরী থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের চাকরীতে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কাজে পুরুষের সমান মর্যাদা ও শর্তাবলীর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সাংসারিক কাজে ভারাক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে পার্ট টাইম কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে ক্রেশ ও শিশু প্রতিপালন কেন্দ্র চালু করলে মহিলাদের পক্ষে চাকরী সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে। ১৯৭৭ সালের মার্চ থেকে মেয়েদের চাকরী সংক্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নানারূপ পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। ট্রেনিং-এর মাধ্যমে চাকরীক্ষেত্রে তাঁদের স্বনির্ভরশীল করে তোলা দরকার। চাকরীতে তাঁদের আত্মনির্ভরশীল করে তুললে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব অন্যদিকে বেকার সমস্যাও কিছুটা প্রতিহত করা যাবে। আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষির কাজ, ডেয়ারী এবং পোল্ট্রির মেয়েদের একচেটিয়া হয়ে দাঁড়াবে। এই ব্যাপারে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একযোগে সাহায্যের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনগুলিরও এগিয়ে আসা দরকার। অনুন্নত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়ে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

মাত্র বহু প্রচেষ্টার ফলে জাপান, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ স্ত্রীশ্রমের যথার্থ রূপায়ণ ঘটাতে পেরেছে এবং তাঁদের শ্রমের পরিণতি ঘটেছে ঐ দেশগুলির শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে। আমাদের দেশও এই সমৃদ্ধির পথে তবে এগিয়ে যেতে পারে যদি স্ত্রীশ্রমকে অবহেলা না করে তাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারা যায়।

পোনু মালের ভাই

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

নরম মাটীটা বেজর বুকের উপর একটা উল্লাসের মত আনাগোনা করছিল। আস্তে আস্তে তার মাথা কনে এল। কিন্তু শরীরের বন্ধে বন্ধে তাকে উত্তাল করে তুলল। সে দুর্বার বন্যতায় বেজ-বউ-এর চোখে চোখে তাকাল। বেজবউ মুখ টিপে হেসে এক পা সরে যেতেই সে তীরের মত উঠে দাঁড়াল। তারপর আক্রমিকভাবে নিতে যেতে যেতে সে শুধু বলতে পারল,—ওটা কি বেজ। ঝাঁপি কেন!

খিলখিল করে হেসে উঠল বেজবউ। —জান না? ভয় পেলে নাকি?

না। কিন্তু তোমার ঘরে সাপ। বেজরাই তো—

সাপের কামড়ায় সে মরে না ছোট। কিন্তু ও ছাড়া যে জোয়ালো মাল হয় না গো। আর ঐ মালেরই খদ্দের বেশী। তোমাকেও তো ঐ একই মাল—

বেজা চমকে উঠল। অবরুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলল,—সাপের বিষ দিয়েছ বেজ। তুমি এখন। তোমরা এখন। ছিঃ বেজবউ, তোমাকে ছিঃ তোমাকে ছিঃ—

বেজার সেই শেষ বল খাওয়া। বেজবউ-এর উপর পরম ঘৃণায় সে মুখ ফেরে দিল। ছাড়ল বেজ বউকেও। বেজার বউ বলল,—তোমার শনি ছাড়ল।

অদূরে স্টেশন থেকে সিটির শব্দ বাজল। ছেলেটা বলল,—বাবা গাড়ি।

বনতুলসীর ঝোপ থেকে বেজার উত্তর ভেসে এল,—যাঁ বাবা গাড়ি।

গাড়ি কোথা যাবে বাবা?

কলকেতায়।

বেজা ছিপ নাচাতে নাচাতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। ঐ গাড়িটায় করল কলকাতায় চলে গেল। গাড়ি যদি না থাকত তার যাওয়া হত না, গাড়ি যদি না থাকত তার গায়-বরের কলঙ্কটা নিশ্চিহ্নিত হত না। গাড়ি যদি না থাকত—গাড়ি যদি না থাকত—গাড়ি যদি.....

ভাবতে ভাবতে বেজার আনন্দ হচ্ছিল। উন্মাদ হচ্ছিল। বহু নিম্নস্তর অঙ্কের দিকে চেয়ে তার উল্লাস অবশেষে আক্রোশে পরিণত হল। ছেলেটা আবার কি যেন বলছিল, বেজা শুনছিল না। তার কান তখন অন্যদিকে। গাড়ির শব্দটা এখনও অস্পষ্ট, তবুও শব্দটা তার কানে আসার মত ধপধপ করছিল।

চার্লি চ্যাপলিন প্রসঙ্গে

অমিতাভ চক্রবর্তী

বোধলিন নাট্যকার বোর্ডেক-এর 'চার্লি' নাটকের নাট্যকার ছিলেন এক বন্দুকের অন্বেষায়। যে বন্দুক হাতে নিলে চার্লিকে খুঁজে বার করা যেতে পারে। চার্লিকে পৃথিবী জানে না। জানা যায় না তার অবয়ব কী কিন্তু স্রষ্টা এক স্বয়ংদৃষ্টি বৃদ্ধ বন্দুক হাতে চার্লিকে খুঁজে বেড়ায়। নাটকের অন্বিষ্টে প্রকাশ পায় অভাবের বাধ্যতা চলমান পরলোকে খুঁজে পাওয়া যায় 'চার্লি'কে—যে চলন চালিয়ে প্রাতঃ হয়েছেন ডাক্তার।

১৯৭৭-এর খ্রীষ্টাব্দে যাঁকে আমরা হারালাম তিনি কোন নাট্যকারের কল্পিত চার্লি নন। বরং তাঁরই কল্পিত ভবঘুরে চরিত্র, যে চরিত্রে ভ্রাতা, কাব্য, বিবিধি এবং চিরায়তিক মানসিকতার সমাহার—তাঁর নাম চার্লস্ স্পেন্সার চ্যাপলিন বা সংক্ষেপে "চার্লি"। ১৯৬৭ সালে আমরা পেয়েছিলাম তাঁর শেষ ছবি—A Countess from Hong Kong। তার দশ বছর আগে—The King in New York এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ছয় বছরে পেয়েছি দুটি ছবি—Limelight (১৯৫২) এবং Monsieur Verdoux (১৯৪৭)। সুতরাং অংকের হিসেবে কল্পিত না হলেও যা থেকে পৃথিবী বঞ্চিত হল তা হচ্ছে এক আজন্ম স্বাধীন অসীম প্রতিভার সান্নিধ্য থেকে। চ্যাপলিনের সমাজ চেতনা কোনও পরিশীলিত শিক্ষা পাঠ-ক্রমের ফসল নয়। তার জন্য ব্যক্তিগত জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং বাঁচার অস্তিত্বের যুপকাষ্ঠে হাজিরামানের পাথেয় থেকে সঞ্চিত। আত্মজীবনীতে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন কেমন করে এলো তাঁর স্বষ্টিশীল প্রেরণা। শৈশবে কেমিংটন রুমে থাকাকালীন একবার কসাইখানাগামী একপাল ভেড়ার দল থেকে একটি ভেড়া কেমন করে চীৎকার বেরিয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরে আনা যায় না। ব্যাপারটি দেখে চার্লি হেসে ওঠেন। কিন্তু অবশেষে ভেড়াটি ধরা পড়ে এবং আর পাঁচ জনের মত সেও একই পথে এগিয়ে যায় কসাইখানার দিকে। এই বিয়োগান্ত পরিণতি তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে। তিনি ত্রাসগ্রস্ত অবস্থায় মায়ের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন "ওরা ওকে মারতে নিয়ে যাচ্ছে"। চার্লি সারাদিন এই স্বল্প দুরত্বের ব্যাপারটি তাঁর মনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তারা সংসারে কোচিছে তাঁর বৈশব। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন ৩৭ বছর বয়সে গর্ভিত পুত্রী নিয়ে অকালে মৃত তাঁর বাবাকে। মায়ের সংগীত এবং অভিনয় প্রতিভার অপমৃত্যু এবং জোসফের সংগ্রাম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।

সবাক ও নির্বাক যুগের সেতুবন্ধন ঘটেছে এই যুগের চলচ্চিত্রকারের ছবি The Great Dictator-এ। চিটলারের প্রতাপে তাড়িত পৃথিবীর বুকে সোচ্চারে এই নির্ভীক বাণী মহাকাব্যটি প্রণত করলেন চার্লি। চিটলার কবলিত ত্রাসদ এবং ভঙ্গুর বৃটিশ সরকারের আওতার অনেক বাইরে সুদূর মার্কিন মুলুকে তাঁর এই ছবি মুক্তি পেল। সেটা ১৯৪০ সাল।

চার্লি যেন স্বভাবে পঞ্চম স্বাধীন—রাজনৈতিক নাগিনীর ফুৎকৃত নিঃশ্বাসে কলুষিত পৃথিবী সেই সহজ স্বাধীনতাকে বরদাস্ত করেনি। ফাসিবিরোধী আন্দোলনের বিশ্বরাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝে গেল হিয়াংচা-পচস্ডাম কনফারেন্সের পর। ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হল ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্বে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে। সেই ব্যাকাধিজম বরদাস্ত করল না সহজ-স্বাধীন স্বষ্টিশীল নৈতিক অধিকারকে। 'Coursieur Surveve'—সুইজারল্যাণ্ডের এক নিভৃত গ্রামে বসে জীবনের প্রতীক, একজন গান্ধীকে জেলে পুরে শেষ তিন দশক কাটালেন এই চিরদিনের চিরনামের চ্যাপলিন। এই আপোষহীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রতি এই আঁটুট আস্থা-শীল চলচ্চিত্রকার আজ সমকালীন অনেক বিপ্লবী নায়কেপনাকে ম্লান করিয়ে দেয়। যাঁদের কাছে বিপ্লবীয়ানা নায়কের নিছক সংলাপমাত্র সেই কারণের সোচ্চিত সমাজ চৈতন্যের অগ্রদূত হলেন তিনি। কারণ তাঁর নিছ জীবনমিতি সর্বত্রাস সঞ্চীবিত। মানুষের দারিদ্র্য, দুঃখ তাঁকে নিয়ত পীড়ালান করেছে। তাই পরার্থপাদ বা লোকচিত্তেষণার বদলে চলচ্চিত্রকার বন্ধুবান্ধবকে বেশী উপযোগী মনে করেছেন। কেননা, ঐতিহাসিক অভ্যাসের তাঁই মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার আত্মসম্মান। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালেও একপাট তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছেন গান্ধী-বাদের শক্তি। বলেছেন "যেহেতু মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক, এখনও গান্ধীকে জেলে পুরে বাদে সমস্যার সমাধান হবে না—বরং হাজার হাজার গান্ধী জন্ম নেবে।"

এই চিরপ্রতিবাদী কমেডিয়ানের ভেড়ার পাল প্রভৃতি অভিজ্ঞতার মতই হাসি কান্নার সীমায় প্রবেশে কেটে গেল জীবন। লণ্ডনের সস্তী এলাকায় একদা অধিবাসী ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে সম্মানিত হলেন 'নাইট' উপাধিতে। তখন তিনি আর সেই দেশের নাগরিক নন। সাধারণ মানুষের মাপকাঠিতে তিনি নন কনফর্মিষ্ট যাঁকে চিরদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এক অখণ্ড বিভিন্নি। চারবার পাণী গ্রহণ করেছেন তিনি। এই ভবঘুরে স্বপ্নদ্রষ্টার চিরায়তিক জীবননাট্যে ধিয়োগান্ত দৃশ্যে যবনিকা পড়েছে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৭। ৮৮ বৎসর বয়সে। চ্যাপলিনের এই আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের "বেজায়েকাশামে"-এ জন্যে আমরা অপেক্ষা করব।

ফিল্মোৎসব-১৯৭৮

বিমল কর

'চলচ্চিত্র উৎসব সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রকারদের পারস্পরিক চিন্তা আদান-প্রদানের সবচাইতে শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতবিনিময়ের এমন ক্ষেত্র বুঝি আর নেই।'—কথাগুলি বলেছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রী এল. কে. আদবানি। গত ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় মাদ্রাজ শহরের কলাইভানর আরঙ্গমে দক্ষিণ ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্বোধনী ভাষণে তিনি আরও বলেন 'আজকের দিনে চলচ্চিত্রের মত প্রভাবশালী জনমাধ্যম দ্বিতীয়টি নেই। সমাজের প্রতিফলন ও বিশ্লেষণ এই মাধ্যমের প্রধান কাজ। এই ফিল্মোৎসব '৭৮ দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রকারদের হাতে বিশ্বের একটি জানালা খুলে দেবে যেখান থেকে তাঁরা অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আহরণ করে নিতে পারবেন মূল্যবোধের কিছু মণিমুক্তো।'

দক্ষিণ ভারত ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রে এখনও সবার ওপরে। সুতরাং এমন ব্যাপক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দাবীদার তাঁরা বহুদিন থেকেই। কলকাতা বন্ধের পর এতদিনে তাঁদের সে দাবী পূরণ হলো। চলচ্চিত্রের কারখানায় উদ্‌যাপিত হলো ফিল্মোৎসব '৭৮। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লীর চলচ্চিত্র উৎসব অধিকারিক, ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন এবং তামিলনাড় সরকারের জনসংযোগ বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। স্বভাবতই ছবি বাছাইয়ের কাজে তাড়াহুড়োর ছাপ বেশ স্পষ্ট।

মূল উৎসবে তেইশটি দেশের বিরাশিটি ছবি দেখানো হয়। 'ফিল্ম বাজার' বিভাগে দেশী-বিদেশী প্রায় দেড়শ ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। বিদেশী অতিথি এসেছেন শতাধিক।

বিদেশী অতিথিদের ভিড়ে উৎসবের হাওয়া উত্তপ্ত হলেও ঠিক কি কারণে জানিনা, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে দূরে থাকা অনেকের কাছেই আলোচনার বিষয় হয়েছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী আদবানি বলেন 'আমিও জানতে চেষ্টা করছি কি কারণে বম্বে কলকাতা এই উৎসবে তেমন সাড়া দেয়নি।'

যদিও মাদ্রাজে এই প্রথম, কিন্তু চলচ্চিত্র উৎসব ভারতে নতুন নয়। আমাদের সংস্কৃতির ওপর এই ধরণের মেলার প্রতিক্রিয়া যথার্থই অনস্বীকার্য। একদা তরুণ অথচ প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকারদের মানসিক বিবর্তন ঘটে এই উৎসবের ছবি দেখেই। রাজ্যে রাজ্যে 'নতুন সিনেমা' আন্দোলনের জোয়ার আন্তর্জাতিক ছবির প্রদর্শনীরই ফলশ্রুতি।

ফিল্মোৎসব '৭৮ যেমন আমাদের সামনে রাজনীতি বিষয়ক ছবি করার একটি পথ খুলে দিয়েছে, তেমনি অর্থপুষ্ট প্রযোজক, পরিচালকরা একাধিক ছবি থেকে দর্শককে 'ইন্টেলেক্ট' করার খোরাকটিও আহরণ করবেন নিঃসন্দেহে।

একটা সময় ছিল, যখন ফিল্ম মাধ্যমটির প্রকরণ ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সারা দুনিয়া-জোড়া চলত পরীক্ষার হাওয়া। এখন সেই হাওয়া স্তব্ধ। প্রকরণ নিয়ে নতুনতর পরীক্ষার চেষ্টা আপাতত নীরব। সমাজব্যবস্থার ত্রুটিগুলির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশের কাজে আমাদের ছবি করিয়েরা অধিকতর আগ্রহী, যে কারণে এই উৎসবে আমরা দেখতে পেলাম রবিন স্মাই-এর 'ওয়ান ম্যান', বিশ্বের 'মোনায়া এণ্ড দি ব্যাডম্যান', পশ্চিম জার্মানীর 'ফার রেইনস্ অভার দি ল্যাণ্ড,' হাঙ্গেরীর 'ফিফথ্ সীল', ইতালীর 'দি ক্যানিবলস্', 'মাওাই কেস', 'ইলাস্ট্রিয়াস কনসেস', নরওয়ের 'ব্লাড অরেঞ্জ' সুইজারল্যাণ্ডের 'নাইট ফিকার দি রেভুলিউশন', সুইডেনের 'দি অ্যাসাইলাম-কেস', চিউনিসিয়ার 'দি অ্যাবসাসভ্', ইউ. কে'র 'অ্যাবডাকশন', ইউ. এস. এ'র 'ইন দি ইয়ার অফ্ দি পিগ', ছবিগুলি।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রীক পরিচালক মাইকেল কাকোয়ানিসের চারখানি ছবি (দি ট্রোজান উইমেন, ইফিগেনিয়া, অ্যাচিলা-৭৮, দি ডে দি ফিস্ম কেম আউট) দেখার বিরল অভিজ্ঞতাও এই উৎসবের স্মরণীয় ঘটনা।

ফিল্মোৎসবের ছবিগুলি থেকে আমাদের পরিচালকরা কি গ্রহণ করবেন, কি বর্জন করবেন জানিনা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কাছ থেকে যদি আগামী দু-এক বছরের মধ্যে বিতর্কিত কোনো ছবি পাওয়া যায়—বুঝতে হবে এই উৎসব কিঞ্চিৎ সার্থক। নইলে যদি ধ্রাজিলের 'মারা পাসাতা', 'ডোনা ফ্লোর এণ্ড হার টু হাজব্যাণ্ডস্' বা, আর্জেন্টিনার 'সিক্স দি সিলভা' কিংবা ইউ. এস. এ'র 'দি আদার সাইড অফ দি মিডনাইট' ছবির অনুকরণে উত্তেজক কিছু 'বাটিকা' পরিবেশিত হয় তাহলে চিন্তার ব্যাপার। সব উৎসবেরই ভালো ও মন্দ দুটি দিক থাকে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশী সংস্কৃতি ও শিল্প, চিন্তাধারার সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলো এটাই সবচাইতে বড় পাওয়া।

আমরা জানতে পারলাম ব্রাজিলে হালকা ধরনের ছবির বাজার ভালো, এমিল দ্য আন্তেবানিও স্বদেশে বিতর্কিত, ব্যাট হানস্ট্রা ডকুমেন্টারী ও ফিচার ফিল্মের মধ্যে তখন দোদুল্যমান, নরওয়ে লড়াই করে চলেছে সামন্তবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে, রাশিয়ার ভারতীয় ছবির ব্যবসা উৎসাহজনক কিংবা আমাদের দেশেরই একাধিক কর্ণাটক বাসী তরুণ নতুন

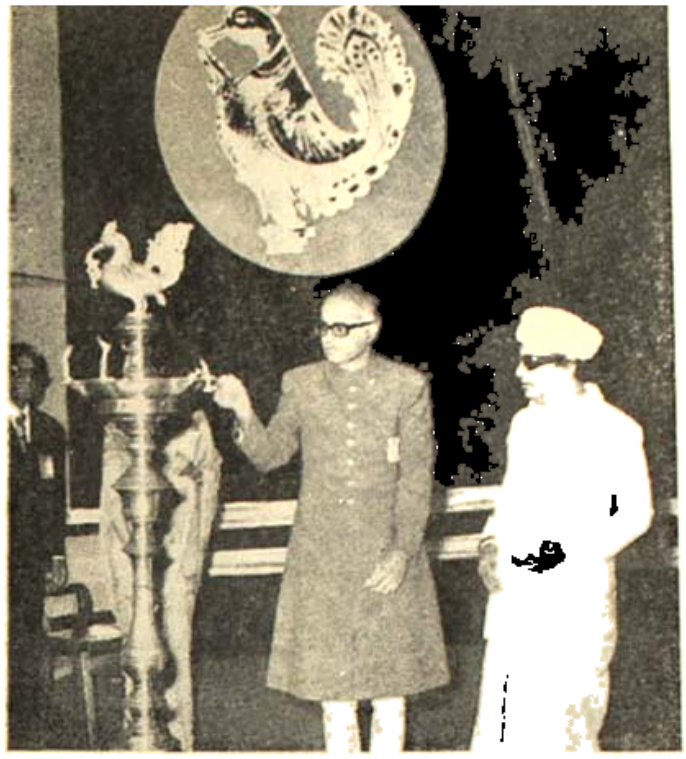

ফিল্মোৎসবের উদ্বোধন করেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী এল. কে. আদবানী। সভাপতিত্ব করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. জি. রামচন্দ্রন

উৎসাহে ক্যামেরা নিয়ে নেমে পড়েছেন পাঁলে-পাঁকে দর্শক, কেরালায় এক ফিল্ম কো-অপারেটিভ নতুন চিত্তার ছবি তৈরীতে ব্যস্ত, একদা নিষ্প্রাণের ব্যবসায়িক ছবি করিয়ে এখন 'রাগী যুবকে' পরিণত—এমনি আরও কত কি।

ফিল্মোৎসবের ব্যবসায়িক দিকটাও একেবারে অগ্রাহ্য করার নয়। পূর্বতন প্রতিটি উৎসবের মত এবারও 'ফিল্ম বাজার' বিভাগটি অবশ্যবাচ্য। এই বিভাগের উদ্যোক্তা 'ইমপেক্স' আজ-কালকের মোটেলের বলরুমে একাধিক (২০) স্টল করে বিদেশী ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। বম্বে ও কলকাতা সরকারীভাবে এই উৎসবে যোগদান করেনি, কিন্তু ছবি বেচা-কেনায় কোনো বাধা হয়নি। কলকাতা থেকে পাঁচটি ছবি ছিল এই বিভাগে—'পদাতিক', 'হারমোনিয়ম', 'সুবর্ণ হাতী', 'অজস্র ধারাপাত' ও 'সংসার সীমান্তে'। হিন্দী ছবির সংখ্যা ছিল একুশ, কানাড়ার আঠাশ, মারাঠি পাঁচ, মালয়ালম বাইশ, অসমিয়া নয়, তেলেগু ষোল ও বিদেশী ছবির সংখ্যা সাকুল্যে পঁয়ত্রিশটি।

উৎসবের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি ৬৫ দর চুক্তিপত্র সইসাবুদ। যুগোস্লাভ রেডিও এবং টি. ভি. স্বদেশে প্রদর্শনীর জন্য পনেরটি কানাড়া ছবি কেনেন (সংস্কার, চোরনা ভূতি, কথা সঙ্গম, কাড়ু, পল্লবী, গঙ্গা ভূতি, নন্দী, উদ্যোগ, কালেশ্বর রাম, অবশুদিনা পোষ্ট অফিস, ঘাটশ্রাদ্ধ, চান্দা বন্ধরা, দীপ, হালিকে ও কেকলা) তারত এই চুক্তিতে আয় করবে ১২ হাজার ডলার। একই দিনে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের সঙ্গেও যুগোস্লাভ রেডিও ৬টি ডি. চুক্তি করেন। ছটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তাঁরা প্রায় পাঁচ হাজার ডলার মূল্যে কিনবেন। এই ছবিগুলি হলো মাধবপুর্ণম, দুতিদা, এক আধুরি কাহানী, কানক, ত্যাগপত্র ও বিলেত ফেরত।

দুদিন আগে ইরাকের সরকারী ফিল্ম ব্যবসায়ী প্রতিনিধি মিঃ কাজন আল আজ্জাউই ইমপেক্সের কাছ থেকে ৮০ হাজার পাউণ্ড বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে কিনলেন ছড়িটি হিন্দী ছবি। অবশ্য সবগুলি ছবিই মূলত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরী। মোদ্দাকিক যে সাতখানি ছবি কেনার সিদ্ধান্ত নিলেন সেগুলি সবগুলিই বিতর্কিত ছবি। ফরাসিদের রাষ্ট্রিয়ক প্রতিনিধি মিঃ ফিবিক্স কোরোনেল্লা ৩টি ফরাসী ছবি নির্বাচন করেছেন। নির্বাচিত ছখানি ছবি হলো শ্রীশ্রীমুক্তা, অবোলা, চন্দ্রলেখা, দুগ্গা, সফেদ হাতী ও দীপ। এই চুক্তির বিনিময়ে ভারত অর্জন করবে লাভে তেমন চাঙ্গার মার্কিন ডলার। বিনিময় সঙ্গে সাতখানি ছবি বিক্রীর চুক্তিতে ভারতের আয় হবে ৮ হাজার মার্কিন ডলার।

অর্থ বিনিময়ের এই খাতা আপাতত বন্ধ হলো বটে, কিন্তু এই উৎসবের ফলশ্রুতিতে কত এখনও অজ্ঞাত। ভারতের ব্যবসায়িক সাফল্যের মূল কারণ ছিল 'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা' নামে একটি বিভাগে প্রায় পঞ্চাশটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও হিন্দীভাষী ছবির ব্যাপক প্রদর্শনী। আলাদা ছবির জগতে যে নতুন সাড়া পড়েছে তার প্রমাণ এই বিভাগে দর্শকদের ছবির স্থান পাওয়া। পটভিলাম বেড়াতে কয়েক বছর আগে 'সংস্কার' (রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক প্রাপ্য) ছবি নিয়ে নতুন চিত্রায় হেড তুলেছিলেন, এখন নাটক ও অভিনয়ে বি. ভি. কারান্থকে নিয়ে আরও কিছু উন্নাসী বাণী শুনব সেই হেডরে মোলাকে রূপায়িত করেছেন, মোলাকের হেড ভেঙে চড়িয়ে পড়েছে তামিল, তেলেগু ছবির মাঝেও। দুর্ভাগ্য ঋত্বিক ঘটকের পাঁচখানি ছবির প্রদর্শনী কোন অর্থকরী ফল প্রসব করল না। মৃণাল সেনের 'ওকা উরি কথা' দুটি দেশের কাছে বিক্রীত হলো। সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি 'শতরঞ্জকে খিলাড়ি' দেখালেন না। উনি উপযুক্ত সাবটাইটেল ছাড়া ছবিটি দেখাতে নারাজ।

সুতরাং ১৭ জানুয়ারী উৎসবের অন্তিম সন্ধ্যায় পঞ্চপ্রদীপটি নিভিয়ে দিতে হাজির ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি শ্রী বি. ডি. জাত্তি। উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করে শ্রী জাত্তি বলেন—'দক্ষিণ ভারতের চেষ্টাতেই এই উৎসব থেকে যা ভালো তা আত্মস্থ করে নিজের শিল্প ও সংস্কৃতি চেতনাকে আরও পরিপূর্ণ করে তুলবে এটা আমার বিশ্বাস। এবং শুধু আনন্দ দান নয় সামাজিক চেতনা সৃষ্টিতেও চলচ্চিত্র উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

প্রথম টেস্টে হারের পর আমরা লিখেছিলাম—যৌবনের পরাজয়। দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর বড় ইয়র্কের পর ভারত আবার হারলো। খেলার অন্তিম মুহূর্তে পরপর দুটি পরাজয় আমাদের প্রত্যাশার মুখে চাই দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে বিপজ্জনক অবস্থায় ঠেলে দাঁড় করিয়েছিল।

গত দু বছর ধরে আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের বড়িতে বেজায় ও পাকা আঘাত হানার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আসছি। সেই বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে ভারত পিছিয়ে পড়েও রুখে দাঁড়িয়েছিল। শেষ টেস্ট যখন শুরু হল তখন দু দলই এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা মান বড়িয়ে খেলে শেষ টেস্ট ম্যাচটিকেও প্রায় কব্জা করে ফেলেছিলেন। তখনই স্বরূপ ধরলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারেরা। পুরস্কৃত তাই বোলারদের দক্ষা হয়ে দাঁড়ালেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। উইকেট ছেড়ে তাঁরা তখন ব্যাটসম্যানদের আঘাত হানতে শুরু করলেন। ভারতীয় দলের প্রায় অর্ধেককে তাঁরা পাঠালেন হাসপাতালে। ফলে বৌদকে তার নেনে নিতে হল। ওরেস্ট ইন্ডিজের বোলারদের আচরণ সমস্ত ক্রিকেট বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল।

গত বছর চিনি মেশের ইলেও দলের সঙ্গে খেলার সময় ভারতীয় খেলোয়াড়রা আবার বড়িয়ে বেজাদের পরিচয় দিয়েছিলেন। দু দুটি টেস্টে পিছিয়ে পড়েও তাঁরা করে দাঁড়ালেন। জিতলেন পরপর দুটি টেস্টে।

এবার অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের লড়াকু মনোভাবের পরিচয় আবার দিয়েছেন। প্রথমে ও দ্বিতীয় টেস্টে পরাজয়ের পর ভারত পাল্টা আঘাত হানলো। প্রথমে জিতলো তৃতীয় টেস্টে তারপর চতুর্থটিতেও। এখন ফিরে এসেছে সমতা। ভারত এবং অষ্ট্রেলিয়া—দুজনই দাঁড়িয়ে আছে এক বিন্দুতে। ফাইনের পুরটি নির্ভর করছে পঞ্চম টেস্টের ফলাফলের ওপর। ছ'দিনের সেই খেলায় যে জিতবে তারই পলায় দুলবে বাবতের জয়মালা। সে সৌভাগ্যবান কে? ভারতীয় অধিনায়ক বেদী না অষ্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক সিম্পসন?

পাকারের দলে চুক্তিবদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ার নামী খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সরকারী টেস্টে খেলতে চেয়েছেন। খেললে প্যাকার সাহেবেরও আপত্তি নেই। তবে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তারা চট করে ব্যাপারটা মেনে নেবেন কিনা সন্দেহ। কারণ প্যাকার সাহেবের সঙ্গে আসল বিরোধ তো তাঁদেরই। তবে ভারত যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্যে অষ্ট্রেলিয়াকে দল গড়ার আগে নতুন করে যে ভাবতেই হবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই কারো মনে। তাই পঞ্চম টেস্ট দলে যদি দেখা যায় ফাইটে বোলার লিলি সহ কয়েকজন

ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন চেহারা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অজিত ওয়াডেকারের সময় ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেদী তাকে আরো পরিণত করেছেন। করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়—ভারতীয় দলের কাছে বিশ্ব ক্রিকেটও কৃতজ্ঞ। কেরি প্যাকারের নায়ক সরকারী ক্রিকেটের সাম্প্রতিক ঝড়ের চ্যালেঞ্জ ভারতীয় খেলোয়াড়রা গ্রহণ করেছিলেন। উত্তেজনা এবং আকর্ষণীয় খেলা খেলে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে বিশ্বের সামনের সারির খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রথমশ্রেণী খেলার চেয়ে সরকারী টেস্টের আকর্ষণ ও উত্তেজনা অনেক বেশী। দু দেশের টেস্টে লড়াই যে আরো প্রাণবন্ত হয় তার প্রমাণ ভারত অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী টেস্ট ম্যাচ চারটি।

তাই অষ্ট্রেলিয়ার দর্শকরা কেরি প্যাকারের সার্কাস ক্রিকেটে না গিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন ভারত অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী টেস্টের মাঠে। এখন তাই প্যাকার সাহেবকে পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হচ্ছে। যাঁরা দেশের পক্ষে খেলতে চাইছেন সেই সব খেলোয়াড়দের ছেড়েও দিতে হচ্ছে।

প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ার নামী খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সরকারী টেস্টে খেলতে চেয়েছেন। খেললে প্যাকার সাহেবেরও আপত্তি নেই। তবে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তারা চট করে ব্যাপারটা মেনে নেবেন কিনা সন্দেহ। কারণ প্যাকার সাহেবের সঙ্গে আসল বিরোধ তো তাঁদেরই। তবে ভারত যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্যে অষ্ট্রেলিয়াকে দল গড়ার আগে নতুন করে যে ভাবতেই হবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই কারো মনে। তাই পঞ্চম টেস্ট দলে যদি দেখা যায় ফাইটে বোলার লিলি সহ কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের ডাক পড়েছে তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

তবে ভারতীয় দলও আসল লড়াইয়ের মনো প্রস্তুত। ভারতীয় খেলোয়াড়রা আজ নতুন ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছেন। একজনের দুর্বলতা অন্যজন পূরণ করে দেবার জন্যে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। এমন কি নীচের সারির ব্যাটসম্যান—যাঁরা বল হাতে নিয়ে আঘাত হানেন প্রতিপক্ষকে—ব্যাটের বেলায় তাঁরাও ব্যাট বাগিয়ে রুখে দাঁড়াতে ছাড়ছেন না। আর ভারতীয় ক্রিকেটে ফাস্ট বোলিংয়ের দৈন্যদশা ঘুচিয়ে দিতে কপিলদেব ভাগবৎ চন্দ্রশেখর আবার ফিরে এসেছেন। তাঁর জোরালো বলগুলোর ছোবলে অষ্ট্রেলিয়ার শিবিরে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক উঠেছে।

তাই বলতে বাধা নেই যে ভারতীয় ক্রিকেটের আজ পরম সুদিন। লড়িয়ে মেজাজে পাল্টা আঘাত হানার চাবিকাঠি এতোদিনে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাতে পেয়েছেন। তাই পিছিয়ে পড়েও তাঁরা আর হতাশ হন না। এগিয়ে যাবার জন্যে বীর বিক্রমে লড়াই যাবার।

এর আগে বাক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ওপর ভর রেখে ভারতীয় ক্রিকেট দাঁড়িয়েছিল।

অনেক নামী খেলোয়াড়ের উজ্জ্বলতায় ম্লান হয়ে গিয়েছে আই. এফ. এ. শিল্ড। ফুটবলের মক্কা বলিকোঠায় আর রেকর্ড বইয়ের পাতায় তা ধরা আছে। কিন্তু সেই স্মরণীয় নজির কিন্তু অবের হদিশ দিতে পারতো না। দেখা গেছে ভারত যখনই জিতেছে তখনই তার পেছনে দু তিনজন খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যই ছিল প্রধান। ইমামীর স্তে ভারতীয় দলের অবের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলেন চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর বললে উঠলেই ভারত জিতেছে। ঘোষী, প্রসাদ, ভেঙটরাঘবনরা দারুণ খেলা করেন কিন্তু চেষ্টে অবের চাবিকাঠি কিন্তু ঐ একা খেলোয়াড়টির হাতেই। এতোদিন স্রষ্টা গাভাসকর-বিশ্বনাথের ব্যাটিং আর চন্দ্রশেখরের বোলিংই ছিল ভারতের চেষ্টে অবের প্রধান সম্বল।

কিন্তু এবার ভারতীয় খেলোয়াড়রা খুঁজে পেয়েছেন দায়বদ্ধ ক্রীড়াধারার আসল রূপটি। সেখানে আমরা দেখেছি ব্যাটসম্যানরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু রাণ দিয়েছেন। একের ব্যাটিং অন্যে পুরিয়ে দিয়েছেন। আর বোলাররা পরে বিলে রাপটের দলে আঘাত হানছেন। অষ্ট্রেলিয়াতেই গাভাসকার, চন্দ্রশেখর ভারতের অবের পথটি পরিষ্কার করে তুললেও সেই পিচ্ছিল ধারা কলেকুলে দাঁড়িয়ে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন অন্য খেলোয়াড়রাও। স্রষ্টা স্তে পরপর দ্বারের পর পরপর অব এতো সহজে সম্ভব হয়েছে।

আমরা আশা করবো ভারতীয় ক্রিকেটের এই ধারাটি এবার থেকে ধরে রাখার জন্যে খেলোয়াড়রা প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

ভারতীয় দলের সব অধিনায়ক পর পর চারটি চেষ্টে সেঞ্চুরি করে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন নজির গড়েছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের পঞ্চম চেষ্টে তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন। তারপর অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেষ্টেও করলেন। চতুর্থ চেষ্টে শতরান করতে পারলে তিনি একটা নয়া নজির সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া তাঁর সব আশার মুখে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

এডিলেডে হদিনের পঞ্চম ও শেষ চেষ্টে ম্যাচ শুরু হচ্ছে। এই খেলার ফলাফলের দিকে সবার দিনু উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। কে জিতবে? ভারত না অষ্ট্রেলিয়া? কে পাবে রাবার? ভারত না অষ্ট্রেলিয়া?

সন্তোষ ট্রফি ও বাংলা

অজয় বসু

সন্তোষ ট্রফির নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নাম আপনা হতেই মনে স্থান পায় সে নামটি হলো বাংলার। কারণ, সন্তোষ ট্রফির সঙ্গে বাংলার নামটিও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গেছে। সন্তোষ ট্রফির প্রস্তাবনার কাল থেকে আজ পর্যন্ত, দীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফির ইতিহাসে বাংলা অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়ে আসছে। সে ভূমিকা কখনও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, কখনও খেলার মাঠে বাস্তব প্রতিযোগিতা ভূমিতে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে বাংলার উদ্যোগেই একদা সন্তোষ ট্রফির খেলার রীতি চালু হয়েছিল এবং পথিকৃত বাংলাই এই আসরে চিরাচরিত নায়কের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে।

বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আই. এফ. এ. যখন নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের চেয়ে প্রাচীন ও প্রবীণ সংস্থা। আই. এফ. এ-র প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। আর সর্ব ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। সর্ব ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন বসে দিল্লিতে ১৯৪০ সালে। ওই সভায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আন্তঃ প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রচলনের প্রস্তাব তোলা হয় অবিভক্ত ভারত তথা অবিভক্ত বাংলার তাঁবু স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে। প্রস্তাবটি সাগ্রহে অনুমোদন করে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন তাকার পরিকল্পনা বিচার বিবেচনার দায়িত্ব এক উপসমিতির কাঁধে অর্পণ করে। পরের বছর বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে উপসমিতির সুপারিশ গৃহীত হলে ফেডারেশন নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফির খেলা চালু হয়ে যায়।

আই. এফ. এ-র প্রশাসনে তখন ইংরাজদেরই প্রাধান্য ছিল। সেই প্রাধান্যের কাটল ধরিয়ে বৃটিশদের যে কজন ভারতীয় বা বাঙালী প্রশাসনিক কর্তৃত্বের স্থান দখল করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে পরলোকগত মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ছিলেন নেতা বিশেষ। যার উদ্যোগে আমলেই তিনি ছিলেন আই. এফ. এ-র সভাপতি। অবিভক্ত বাংলার মহামনীষীদের সন্তোষের অধিবাসী স্যার মন্মথনাথের স্মৃতি ধরে রাখতেই আই. এফ. এ. সন্তোষ ট্রফি নামে যে কাপটি উপহার দেয়, সেই কাপটিই জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার হিসেবে পায়। ট্রফিটির গায়ে স্যার মন্মথনাথের প্রতিকৃতিও খোদাই করা আছে। সেকালে দেড় হাজার টাকা মূল্যে এই ট্রফিটি নির্মিত হয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উভয় পক্ষে ট্রফিটির বাজার দর অনেক চড়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, সন্তোষ ট্রফির সঙ্গে যে মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে, টাকা পয়সার বিনিময়ে কিনেও তার দাম বাচাই করা যায় না। এই ট্রফিটি যার ঘরে যায় সেই অঞ্চলটিই ফুটবলে ভারত শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি লাভ করে।

এই স্বীকৃতির স্বর্ণ তিলক কোন দলের কপালে সবচেয়ে বেশিবার আঁকা হয়েছে? আশা করি, এর উত্তর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, ফুটবল অনুরাগী মাত্রেরই সেই দলের নাম কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। হ্যাঁ, সেই দলেরই নাম বাংলা। মোট তেত্রিশবারের আয়োজনে বাংলা অন্যূন ষোলবার এই প্রতিযোগিতা জয় করেছে এবং আরও নবার ফাইনালে খেলেছে।

DHANADHANYA
Price 50 Paise

YOJANA
(Bengali)

Regn. No. WB/CC-313
February 1—15, 1978

খোয়ার পরে সন্তোষ ট্রফির আসর বসেছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। পরে সব খেলাই একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করার রীতি অনুসরণ করা হয়। আগের সন্তোষ ট্রফি অবশ্য ছিল আন্তঃ রাজ্যিক টুর্নামেন্ট। ইহার পূর্বে তা আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় টুর্নামেন্ট হিসাবে পরিচালিত হয়। তবে নীতিগত ভাবে এই প্রতিযোগিতা কোনদিনই বিভিন্ন রাজ্যের টিমের অংশ গ্রহণ বা রাজ্য দলের মধ্যে খেলোয়াড় বাছাইয়ের পূর্বে নির্দিষ্ট কোনদিন থেকেই পরিচালিত হওয়ার নিয়ম ছিল না। তবে এই প্রতিযোগিতার আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরে পরিচালিত কোনদিনও এই আসরে যোগদান করেছে। তবু দেখা যায় যে, কোনদিন বাদ দিলেও এবং কোনদিন একবার এই আসরে যোগদান করেও কোনদিন দলগুলি আসরে আর ফিরে আসেনি। বরং দিন দিন এই প্রতিযোগিতার আগ্রহ বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ভারতের প্রায় সব রাজ্যের দলগুলিই এই আসরে যোগদান করে থাকে। বাংলার দলও এই আসরে যোগদান করে থাক

১৬—৩১ মার্চ ১৯৭৮

বাজেট সংখ্যা

চিঠি

[illegible] বনবাণীর বিশেষ পরিকল্পনা [illegible] ১৩ ১৬ ফেব্রুয়ারি '৮৬) মারফতে [illegible] বিশেষ করে এই বিশেষ পরিকল্পনা সংখ্যাটি এত উচ্চমানসম্পন্ন [illegible] এর পেছনে আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, এই সংখ্যাটিতে [illegible] কিন্তু চুরান্ত বিশ্লেষণে বলতে বা [illegible] ঐকান্তিকতা এবং সততার এক বলিষ্ঠতার ছাপ রেখে বিশেষ করে আমাদের মনে [illegible] সম্পাদনা ও পরিবেশনের [illegible] একটি ছাপ পড়ে না।

বনবাণীর [illegible] প্রকাশ করতে [illegible] হয়ে সম্পাদকের মাননীয় [illegible] পরিষদ সদস্যদের সহযোগিতা [illegible] মন্ত্রী মহোদয় ও মননশীল বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাতে পত্রিকাটির মান বাড়িয়েছে। এত তাড়াতাড়ি যে [illegible] হতে পারে তা তাঁর আন্তরিকতারই [illegible] রেখে।

প্রবন্ধগুলিতে পাণ্ডিত্য ও মননের ছাপ [illegible] পরিষ্কারভাবেই পরিস্ফুট। [illegible] তথ্যের [illegible] পরিকল্পনার পর', সম্পাদক শিশির কুমার রায় মহাশয়ের 'পরিকল্পনার নব [illegible] তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। [illegible] পরিকল্পনা ও [illegible] সংযোজন। [illegible] মুখ্যমন্ত্রীর [illegible] বিশ্লেষণ। [illegible] পরিকল্পনার নতুন [illegible] মানুষের [illegible] পরিপূর্ণ করবে [illegible] অবশ্যই [illegible] করে তুলবে [illegible]।

এই আলোচনা-গুলি পড়ানুপুঙ্খরূপে হয়ে গেছে। 'সম্বাদ' বিভাগটি এবার [illegible] আকর্ষণীয় হয়েছে। অন্যান্য [illegible] ও [illegible] ট্রাডিশনের। আমরা আমাদের [illegible] ঠিক এই রকম উচ্চমানসম্পন্ন [illegible] করি। সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁর [illegible] জন্য।

সুহাস মজুমদার
সম্পাদক 'পিয়ালী' পত্রিকা
নবেন্দুপুর, আচার্যপল্লী।

মহাশয়,

নতুন বছরের 'বনবাণী' কয়েকটি সংখ্যার রচনাগুলো পড়ে খুব ভালো-লাগলো। পত্রিকাটির নতুন আঙ্গিকের জন্য অভিনন্দন জানাই। প্রতি সংখ্যার বনবাণীর সম্পাদকীয় ও [illegible] থাকে। এবার সম্পাদকীয়টি অতিরিক্ত [illegible] ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যার [illegible] বিষয়ের সম্পর্কে লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। পাখিদের নিয়ে তিনি বেভাবে Research করেছেন এজন্য লেখককে আমার আন্তরিক [illegible] জানাই।

এই পত্রিকার পরিবারজন বিভাগের যে অভিনব প্রয়াস দেখলাম তা বেশ সুন্দর হয়েছে। এই সংখ্যায় অরুণি চৌধুরীর লেখাটি বেশ উচ্চমানের স্বাক্ষর রাখে। পাঠকের প্রতি যাতে আমরা যথাযথ মর্যাদা দিতে পারি সেদিকে তাঁর কলমের স্বিধনকুশলতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে তাঁর তথ্য আহরণ করিয়েছেন।

পত্রিকাটিতে কৃষিবিষয়ক, শিল্প, অর্থনীতি, সিনেমা, খেলাধুলা, মৌলিক গল্প, প্রবন্ধাদি এবং গ্রন্থ আলোচনা সবই রয়েছে। কিন্তু কবিতা নেই কেন? বনবাণীর প্রতিসংখ্যায় দুই তিনটি কবিতা প্রকাশিত হলে সুখী হব।

আশীষকুমার কুইয়া (পত্রলেখক)
বড়িগাছা, ২৪ পরগণা

'বনবাণী' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'বনবাণী'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাবলিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ও গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা :
বনবাণী, পাবলিকেশন্স ডিভিশন,
৮ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২৩৭৬

সম্পাদক
শিশির কুমার রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
দ্রিপদ চক্রবর্তী

বিশেষ বাজেট সংখ্যা

১৬—৩১ মার্চ, ১৯৭৮ / নবম বর্ষ : অষ্টাদশ সংখ্যা

ধনধান্যে

অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট সংসদে পেশ করেছেন কোন কোন মহলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে প্রধানত দুটি কারণে। তাদের আশঙ্কা, বাজেটে যে ১০৫০ কোটি টাকার ঘাটতি রাখা হয়েছে ও ৪৯৯ কোটি টাকার পরোক্ষ করের প্রস্তাব করেছে তার ফলে পণ্যমূল্য অনেক বৃদ্ধি পাবে।

চলতি বছরে সংশোধিত বাজেট হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ১৭০ কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যাবে। অথচ আমরা দেখেছি ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচক সংখ্যা গত অক্টোবর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৩% পয়েন্টেই স্থিতিশীল রয়েছে। তাছাড়া গত বছরের মার্চ মাসের তুলনায় এ বছরের জানুয়ারী মাসে পাইকারী পণ্যমূল্য ০.৬ শতাংশের বেশী বৃদ্ধি পায়নি। তাই ঘাটতির বহর বড় থাকলেই অর্থনীতি বেলাগাম হয়ে যায় না। আসলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে হলে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। অর্থমন্ত্রীর হাতে যে দুটি হুকুমের তাস রয়েছে, ১৭০ লক্ষ টন খাদ্য শস্যের মজুত ভাণ্ডার ও ৪০০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার তহবিল, তা তিনি কাজে লাগাতে পারবেন এই ভারসাম্য বজায় রাখতে। সবল রাখা দরকার ঘাটতি ব্যয় উৎপাদনের স্বার্থেই এবং উৎপাদন যদি আমরা বাড়াতে পারি, সময় বুঝে সরকারী মজুত ভাণ্ডার থেকে খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়ি, সরকারী বণ্টননীতি আরও জোরদার করি এবং যেসব অত্যাবশ্যক পণ্যের ঘাটতি রয়েছে তা আমদানী করি ও বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত রাখি তবে বাজেটের ঘাটতি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন করতে পারেনি চলতি বছরে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য চলতি বছরের মত বাজারে অর্থ সরবরাহ ও ঋণ সম্প্রসারণ এমন ভাবে সীমিত রাখতে হবে যাতে অর্থের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন মেটে কিন্তু ফাটকাবাজীর উদ্দেশ্যে মজুতদারি প্রশ্রয় না পায়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য যে সব সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তাতে অর্থনীতির ভারসাম্য আরও বৃদ্ধি পাবে। আগামী বছরে যে অতিরিক্ত পরোক্ষ কর ধার্য করা হয়েছে তার অধিকাংশই উৎপাদন শুল্ক। উৎপাদন শুল্ক ক্রেতাদের ঘাড়ে চাপাবার কোন যুক্তি নেই, বিশেষ করে যখন বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে শিল্পোদ্যোগ আরও লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পেট্রোল, ডিজেল তেল, কেরোসিন ইত্যাদি অল্প কয়েকটি পণ্যের মূল্য বাড়তে পারে তবে সামগ্রিকভাবে মূল্যস্তরের উপর ০.৭ শতাংশের বেশী প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে যে পাইকারী মূল্যস্তর রয়েছে তা ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সর্বোচ্চ মূল্যস্তর থেকেও কম, যদিও সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত পরোক্ষকর অনেক বাড়ান হয়েছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেননি, উন্নয়নের স্বার্থে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বৈষয়িক পরিস্থিতি অনুকূল—অর্থনৈতিক সমীক্ষা / বিশেষ প্রতিনিধি / ৩

কেন্দ্রীয় বাজেট : পরিকল্পনা খাতে ১৭ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি / বিশেষ প্রতিনিধি / ৫

কেন্দ্রীয় বাজেট : নতুন কর ৪৪৯ কোটি টাকা / বিশেষ প্রতিনিধি / ৯

পল্লীউন্নয়নে এবারের বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুলা বসু/১১

ঘাটতি বাজেট, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি / তরতোষ দত্ত / ১৩

কেন্দ্রীয় বাজেটে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ / অনন্তনাথ দত্ত / ১৫

কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন করের বোঝা / বীরেন ভট্টাচার্য্য / ১৭

সোনা বিক্রীর ব্যবস্থা বাদ দিলে এবারের বাজেট গতানুগতিক / সুব্রত গুপ্ত / ১৯

আপনার আয়কর কত হবে / প্রীতংকর / ২৩

রেল বাজেট এবারও উদ্বৃত্ত / বিশেষ প্রতিনিধি/২৫

রাজ্য বাজেট : দেড় লক্ষ বেকার ভাতা পাবেন/ বিশেষ প্রতিনিধি / ২৭

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট / দেবব্রত মুখোপাধ্যায় / ২৯

গ্রামগঞ্জ : জাতীয় ভলিবলে পাঞ্জাব সাতবার বিজয়ী হ'ল / নির্মলকান্তি ঘোষ / ৩২

সংবাদ / ৩৩

প্রচ্ছদ শিল্পী—অমলেন্দু ঘোষ

হালকা ওয়েল্ডিং-এর ক্ষেত্রে সুখবর

ইণ্ডার্ক মিনিওয়েল্ডার ২৩০ভোল্ট (৩০এম্পিয়ার)-এই চলে...

এই ওয়েল্ডিং ট্র্যান্‌স্‌ফর্মার ছোট ছোট কারখানা, মোটর গ্যারেজ এবং খামারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী— অথচ বড় কারখানার জন্যও লাভজনক।

মিনি ওয়েল্ডার--IOL-এর এই নতুন ট্র্যান্‌স্‌ফর্মারটি ওজনে হালকা, আকারে ছোটখাটো, বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ—অথচ গঠনে কিন্তু খুবই মজবুত। যেকোন অবস্থার মধ্যে এ একটানা কাজ করে যায় নির্ঝঞ্ঝাটে।

বিদ্যুৎ শক্তি ? যেখানে ২৩০ ভোল্টের প্লাগ পয়েন্ট আছে সেখানেই এটি চালানো যাবে। এটি ছোট কারখানার, মোটর গ্যারেজের বা খামারের হালকা ধরনের কন্‌স্ট্রাকসন এবং মাঝারী মেরামতী কাজ করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বড় কারখানাতেও এটি লাভজনক ভাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ, এর চালনার খরচ অনেক কম।

সহজ কণ্ট্রোল সমেত মিনিওয়েল্ডার-এ ২.০, ২.৫ এবং ৩.১৫ মিলি মিটার মাপের ইলেকট্রোডে কাজ অনায়াসে করা যায়।

ইণ্ডার্ক মিনিওয়েল্ডার : হালকা কাজে বাহাদুর ট্র্যান্‌স্‌ফর্মার

IOL

আরও বিশদ বিবরণের জন্য কাছাকাছি IOL অফিসে খোঁজ নিন।

ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড

বৈষয়িক পরিস্থিতি অনুকূল - অর্থনৈতিক সমীক্ষা

বিশেষ প্রতিনিধি

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল যে প্রাক-বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংসদে পেশ করেন তাতে ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, চলতি আর্থিক বছরে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার হবে আনুমানিক ৫ শতাংশ। গত আর্থিক বছরে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১.১ শতাংশ।

চলতি বছরে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান কারণ হ'ল কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য। খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে যেখানে খরিফ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টন সেখানে চলতি বছরে ঐ উৎপাদন ৭ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন হওয়ার সম্ভাবনা। রবি মরসুমে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ফলে ভাল রবি শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে। মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন এই বছর ১২ কোটি ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে। এই উৎপাদন গত বছরের উৎপাদনের চাইতে ১ কোটি টন বেশী।

অর্থকরী শস্যের ক্ষেত্রেও গত বছরের তুলনায় এই বছর ফলন অনেক বেশী হয়েছে। তুলা এবং তৈলবীজের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। আখের উৎপাদন এবং আখ থেকে তৈরী গুড়ের উৎপাদনও গত বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। একমাত্র পাট এবং বেতার ফলনই এবছর গত বছরের তুলনায় কিছুটা কম হবে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডাল এবং তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এইসব অত্যাবশ্যক পণ্যের অধিকতর উৎপাদনের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আঁচা তুলার উৎপাদনও বৃদ্ধি করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে একবছর কৃষিজ ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ঔষধ, সার, সেচের জল ইত্যাদি চাষবাসের প্রয়োজনীয় উপকরণের বর্ধিত হারে ব্যবহারের জন্য। বড়, মাঝারি এবং ছোট সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে একবছর ২২ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর অতিরিক্ত জমির জন্য সেচের ব্যবস্থা করা হবে। একবছরে এত বেশী পরিমাণ জমির জন্য সেচের ব্যবস্থা আগে কখনও সম্ভব হয়নি। সারের ব্যবহার দাঁড়াবে ৪২ লক্ষ টনে। গত বছরের তুলনায় সারের ব্যবহার ২৬ শতাংশ বাড়বে। অতিরিক্ত ২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ভাল ফলনের আরেকটি কারণ হ'ল এবছর আগে বেশী দামকরা পণ্যের জন্য পরিপোষক মূল্য ও সংগ্রহ নীতি অনুসরণ। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের অনিশ্চয়তা দূর করে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধির উচ্চহার অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন, সমীক্ষায় এই সুপারিশ করা হয়েছে।

চলতি বছরে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাওয়ায় সমীক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান লক্ষণ অনুযায়ী একবছর শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার হবে পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ। গত বছর এই বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৪ শতাংশ। বিদ্যুৎ, পরিবহণ সরঞ্জাম, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট এবং সুতী-বস্ত্র শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিল্পের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার গতির জন্যই মোট শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার একছর হ্রাস পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার মূলে রয়েছে বিদ্যুৎ ঘাটতি, শিল্প সম্প্রসারণের অভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পে অশান্তি এবং কোন কোন পণ্যের জন্য চাহিদার মন্দা।

শিল্পে লগ্নীর মনোভাব ধাতস্থ করে উল্লেখ করে সমীক্ষায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে শিল্প উৎপাদনে গতিসঞ্চার করতে হলে সরকারী লগ্নীর পরিমাণ বাড়াতে হবে যাতে বিশেষ করে মূলধনী পণ্যের জন্য চাহিদা বাড়ে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি এবং শিল্প ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপরও সমীক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য রপ্তানীর ভূমিকার কথাও সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

কুটির শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন কুটির শিল্পকে যেসব গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানাদি অধিকতর হারে অর্থসাহায্য করেছে। ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে একবছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১৩২ কোটি টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান জুড়ে দিয়ে কারিগর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য নির্দেশক নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পণ্যমূল্য পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এই বছর পণ্যমূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে। এই বছরের সূচনায় পণ্যের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা ছিল। সরকার যোগান ও চাহিদার মধ্যে অধিকতর ভারসাম্য আনতে সক্ষম হয়েছেন বিশেষ

কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। ভোজ্য তৈল, কাঁচা তুলা এবং কৃত্রিম তন্তুর মত কয়েকটি পণ্য সম্পর্কে উদার আমদানী নীতি গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং কয়েকটি পণ্যের রপ্তানী সীমিত করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থাও উন্নততর করা হয়েছে। বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি সীমিত রাখার জন্য অর্থ সরবরাহ ও ঋণদান নিয়ন্ত্রিত রাখার নীতিও গ্রহণ করা হয়েছিল। সমীক্ষায় অবশ্য বলা হয়েছে যে মূল্যবৃদ্ধি সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান করতে হ'লে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, বিশেষত ডাল, ভোজ্য তৈলবীজ ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পণ্যের ফলন বাড়াতে হবে। উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি কার্যকর মূল্য পরিপোষক নীতি গ্রহণের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। পণ্যমূল্য মাঝে স্থিতিশীল রাখার জন্য একটি সুসংবদ্ধ সরকারী বণ্টন ব্যবস্থারও প্রয়োজন রয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এ পর্যন্ত অর্থ সরবরাহ বেড়েছে মাত্র ৮.৭ শতাংশ। গত বছর অনুরূপ সময়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১২.৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ক জমা বৃদ্ধির হার গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে কম ছিল। গত বছর যেখানে জমা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২১.২ শতাংশ এবছর তা দাঁড়িয়েছে ১৯.৪শতাংশে। লক্ষণীয় বিষয় হল বেসরকারী জমা চলতি বছরের প্রথম দশ মাসে বেড়েছে মাত্র ১৮.৫ শতাংশ, যদিও গত বছর ঐ সময়ে বেড়েছিল ২৫.৯ শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বেসরকারী জমা বাজারে অর্থ সরবরাহের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এই প্রবণতা একটু উদ্বেগজনক এইজন্য যে বেসরকারী আমানত সঞ্চয়ের একটি মূল সূত্র।

চলতি বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সীমিত অর্থ সরবরাহ নীতি অনুসরণ করেছে তার অধিকতর সাফল্যের কথা সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। একথা অবশ্য বলা হয়েছে যে অর্থ বাজারে অতিরিক্ত নমনীয়তা আছে বলে অর্থ সরবরাহ এবং ঋণ সম্প্রসারণ সম্পর্কে সজাগ থাকা উচিত।

বৈদেশিক আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এই লেনদেন পরিস্থিতি চলতি বছরেও অনুকূল ছিল। চলতি বছরের প্রথম আটমাসে বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ছিল ৭২ কোটি টাকা। এই সময়ে রপ্তানি বেড়েছে ১ শতাংশ মাত্র, গত বছরের অনুরূপ সময়ে রপ্তানী বেড়েছিল ৩১ শতাংশ। বর্তমানে আমাদের বিদেশী মুদ্রা তহবিলে জমা আছে চার হাজার কোটি টাকার কিছু কম।

গত বছর রপ্তানী বৃদ্ধির হার ছিল ২৭ শতাংশ, এরমধ্যে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির হার ১৮ শতাংশ। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, পোষাকসহ বস্ত্রশিল্প, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, রত্নশিল্পজাত দ্রব্য, কফি ও চা-এর রপ্তানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। চলতি বছরে অবশ্য এর অধিকাংশে দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। এর কারণ হিসেবে সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিশ্বের অর্থনীতিতে অগ্রগতির হার নুথ হয়েছে, উন্নত দেশগুলি আমাদের কিছু কিছু রপ্তানি পণ্যের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এবং বন্যাপ্রাচ্যসহ কয়েকটি অঞ্চলে আমাদের পণ্যের চাহিদা কমেছে। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে আমাদের রপ্তানী উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

বৈদেশিক আর্থিক লেনদেন পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকার ফলে ব্যাপকভাবে আমদানী উদার করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম তন্তু, কাঁচা তুলা, ভোজ্য তেল, প্রভৃতি পণ্যের প্রভূত আমদানী ছাড়াও কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশের মত শিল্পের নানাবিধ প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য আমদানী নীতি উদার করা হয়েছে।

বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার বেড়েই যাচ্ছে বলে সমীক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং বৈষয়িক উন্নয়নের প্রয়োজনে এই সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। অবশ্য এই সঞ্চিত ভাণ্ডার যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিভিন্ন বছরে কৃষির উৎপাদনে তারতম্য ঘটে এবং আবশ্যকীয় কাঁচামালের মূল্যও উঠানামা করে। এইসব ভেবে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত রাখা উচিত।

পরিশেষে সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে রয়েছে যেখানে অধিকতর অগ্রগতি সম্ভব। সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াবার প্রয়োজন রয়েছে যাতে অগ্রগতির প্রতিবন্ধকগুলি অপসারিত হয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে তৎপরতা বাড়ে এবং সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার অধিকতর ব্যবহার সম্ভব হয়। আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারে জমা আছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্য। এই পর্যাপ্ত খাদ্য ভাণ্ডার ও বিদেশী মুদ্রার তহবিল থাকার ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে একটি সুচিন্তিত কর্মসূচী প্রণয়ন করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে ও তার রূপায়ণে জনগণকে অংশীদার করতে হবে যাতে এই কর্মসূচী রূপায়ণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা যায় এবং সকলেই এই কর্মসূচী থেকে উপকৃত হয়।

আগামী সংখ্যা থেকে
নতুন ফিচার
গ্রাম বাংলার কড়চা

কেন্দ্রীয় বাজেট:

• পরিকল্পনা খাতে ১৭ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি
• কৃষি ও পল্লীউন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৭৮-৭৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে। জনতা সরকারের দ্বিতীয় বাজেটে একটি নতুন কৃষি-ভিত্তিক এবং কর্মসংস্থানমুখী উন্নয়ন নীতির রূপায়ণের জন্য কৃষি, সেচ, খোয়াই উন্নয়ন, সড়ক, পল্লী জল সরবরাহ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ, তেল, ইস্পাত, যান্ত্রা ও পরিবার কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং তপশীলি জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নে এবারের বাজেটে বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাজেটের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের জন্য টাকা থেকে এমন একটি নতুন সংস্থান গড়ে তোলা হবে যার মাধ্যমে অর্থ লগ্নী সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি অনুমোদিত প্রকল্পের আমদানীর ব্যয় মেটাবার জন্য টাকার ঋণ যোগাবে। এজন্য একটি ব্যাঙ্কের কনসরটিয়াম গঠিত হবে।

অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সংসদে তাঁর পেশ করা বাজেটে মোট আয় ধরেছেন ১৭০২১ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ধরেছেন ১৮৪১৭ কোটি টাকা। বর্তমান করের হারের ভিত্তিতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৩৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাব থেকে প্রকৃত আয় হবে ৩৮৬ কোটি টাকা। ফলে সামগ্রিক নীট ঘাটতি দাঁড়াবে ১০১০ কোটি টাকা। এছাড়া কেন্দ্রীয় কর্মীদের জন্য আর এক কিস্তি মহার্ঘ ভাতা ও চিনি সংক্রান্ত নতুন নীতির ফলে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। অর্থকৃচ্ছ্রতার দ্বারা এই অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা লাঘব হবে বলে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়

প্রতিরক্ষা ছাড়া পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ভার চলতি বছরে সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৩৫৪ কোটি টাকা বেড়ে ৫৯০৬ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ঋণ পরিশোধ ও রাজ্যগুলিকে অনুদান দেবার জন্য ৩৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ঐ দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্ব খাতে ব্যয় চলতি বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় কম হবে। কয়েক অর্থ কৃচ্ছ্রতার ফলে এটা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভরতুকি প্রথা বন্ধ করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগগুলিকে পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় বরাদ্দও চলতি বছরের তুলনায় ১২৭ কোটি টাকা কম হবে।

চলতি বছরের ২৭৫২ কোটি টাকার ভারসাম্য আগামী বছর প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ হবে ২৯৮৫ কোটি টাকা।

১৯৭৮-৭৯ সালে বর্তমান হারে কর আদায় করলে পাওয়া যাবে মোট ১৬৩৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৭৩০ কোটি টাকা বেশী। আবগারি খাতে ১১৫ কোটি টাকা এবং মোট কর বাবদ ১৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ পাওয়া যাবে অতিরিক্ত ৩৭৪ কোটি টাকা। বাণিজ্য শুল্ক বাবদ অতিরিক্ত পাওয়া যাবে ৭০ কোটি টাকা। রাজ্যগুলি কর ও শুল্ক বাবদ পাবে ১৯২৯ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় ১৩০ কোটি টাকা বেশী।

চলতি বছরের ১১৮৩ কোটি টাকার ভারসাম্য ১৬৫০ কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করা হবে। ঋণ ও সুদ শোধ করার পর নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ১১৩৬ কোটি টাকা।

বার্ষিক যোজনা বরাদ্দ

১৯৭৮-৭৯ সালের বার্ষিক যোজনার জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ১১৬৪৯ কোটি টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে বরাদ্দ হয়েছিল ৯৯৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৭ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরমধ্যে চলতি প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ ১০৯৩৫ কোটি টাকা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প বাবদ ১৩১৪ কোটি টাকা। এর ছাড়া নতুন বিদ্যুৎপ্রকল্পে সূচনার জন্যের জন্য ১০০ কোটি টাকা। এই ১৩১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ৮২৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লীউন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

কেন্দ্রীয় যোজনা এবং রাজ্যগুলি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পরিকল্পনা খাতে সাহায্য বাবদ ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে ৭২৮১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৫৭২০ কোটি টাকা।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যোজনার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ ২৭৬১ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। এই হিসেবের মধ্যে পার্বত্য ও আদিবাসী এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদ ও পল্লী বৈদ্যুতিকরণ সংস্থার জন্য বরাদ্দও ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৪৫২০ কোটি টাকা। এই সঙ্গে সরকারী উদ্যোগগুলির নিজস্ব সম্পদ মিলিয়ে ১৯৭৮-৭৯ সালে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়াবে ৫৬৬৪ কোটি টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪৯৩৯ কোটি

টাকা। পক্ষান্তরে বিভিন্নের সম্পদ বিনিয়োগ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মোট ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়াবে ৫,২৮৫ কোটি টাকা। গত বছর ছিল ৫,০২১ কোটি টাকা।]

রাজ্য পরিকল্পনার আয়তন বড়

বহুবছরের পর এই প্রথম রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পরিকল্পনার বিনিয়োগ পরিমাণ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আয়তনের থেকে বড় হবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পরিকল্পনার আয়তন বাড়ছে ২৭ শতাংশ। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় যোজনার আয়তন বাড়ছে মাত্র ১৫ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল বলেছেন, কৃষি, সেচ বিদ্যুৎ, ও গ্রামোন্নয়নের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যই যোজনার ব্যয়বরাদ্দের এই পরিবর্তন হয়েছে। এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই রাজ্য এক্তিয়ারভুক্ত। ফলে যোজনাকে বিকেন্দ্রীভূত করার চেষ্টাই এই বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বদানের ব্যাপারে প্রকাশ পাচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে বাড়তি ৪৯০ কোটি টাকা

গত বছরের তুলনায় কৃষির জন্য যোজনার খাতের পরিমাণ ৪৯০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ১৯৭৮-৭৯ সালে করা হয়েছে ১৭৫৪ কোটি টাকা। কনাও ধরিয়া ডেভেলাপমেন্ট প্রকল্পে বছরের ৪৯ কোটির জায়গায় ১৯৭৮-৭৯ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮২ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় যোজনায় বরাদ্দ ৪৫ কে.টি টাকার জায়গায় ১১৫ কে.টি টাকা করা হয়েছে। খরাপ্রবণ এলাকার জন্য ৫১ কে.টির জায়গায় বরাদ্দ হয়েছে ৭৬ কে.টি টাকা। আর নতুন উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ চলতি বছরের ৬ কোটি টাকার জায়গায় বরাদ্দ করা হয়েছে ২০ কে.টি টাকা।

পল্লীউন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, গ্রামাঞ্চল উন্নয়নের নতুন কর্মসূচী অনুযায়ী ৩০০ কোটি টাকায় একটি বিরাট বৃহদাকার উন্নয়ন কর্মসূচী। এরফলে পুষ্টির মান উন্নত হবে এবং প্রথম পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে ৪০ লক্ষ লোক কাজ পাবেন।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় মাছ চাষের জন্য বরাদ্দ ১৯৭৭-৭৮ সালের ৩১ কোটি টাকার জায়গায়, ১৯৭৮-৭৯ সালে ৬১ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এরফলে মাছ চাষীদের আয় ও সুযোগসুবিধা বাড়বে।

গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের জন্য রাজ্যগুলির পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দের হিসেব ৮৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫ কে.টি টাকায় দাঁড়াবে। ১৯৭৮-৭৯ সালে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে গ্রামীণ জল সরবরাহের জন্য ১০৫ কে.টি টাকা ব্যয় হবে। গ্রামীণ জল সরবরাহ বাবদ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাতেও ৬০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ ও রাস্তাঘাট সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দের হিসেব বৃদ্ধি পাবে ফলে গত বছর যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে বলে শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে বরাদ্দও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালের ১৪৫ কোটি টাকার জায়গায় ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে এবাবদ বরাদ্দ ২১২ কোটি টাকা দাঁড়াবে।

তপশীলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে বরাদ্দ গতবছরের ৮৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এবারের বাজেটে ১২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। রাজ্য যোজনায়ও এক্ষেত্রে বরাদ্দ ২৫৮ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯৭৮-৭৯ সালে ৩৪৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। এছাড়া আদিবাসী উপ-পরিকল্পনায় বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য ৫৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

সেচ

বৃহৎ ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনায় বরাদ্দ গত বাজেটের ১০৩২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এবার ১১৬৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় এ বছর খরচ করা হবে ২৩০ কোটি টাকা। গত বছরে বরাদ্দ ছিল ২০৬ কে.টি টাকা। এছাড়া কৃষি অর্থ পুনর্বন্টী এবং উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে ঋণ নিয়ে এই খাতের পরিমাণ আরো বাড়ানো হবে। আশা করা যাচ্ছে, এ বছর অতিরিক্ত ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট কর্মসূচী;

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, বিদ্যুৎ বাটতির জন্য উন্নয়নের গতি বন্ধ করে রাখা যায় না। তাই এ বছরের যোজনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক বিরাট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর মোট ৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে থাকবে এবং এর মধ্যে ১৯৭৮-৭৯ সালে ৩৫০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চালু করা হবে। বর্তমান বছরে ২০০০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ২৯০০০ মেগাওয়াট।

কেন্দ্রীয় স্তরে অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ নতুন করে শুরু হচ্ছে। এরমধ্যে আছে কোরবা বৃহদায়তন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামগুন্ডম অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, নাভেলির বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দ্বিতীয় ধাপের কাজ, বদরপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় দফার কাজ এবং ডি,ভি,সির বোকারো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পাকের পাদাড়ের পাম্পস্টোরেজ প্ল্যান্ট। এছাড়া ব্যবস্থা করা হচ্ছে বৃহদায়তন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৪০০ কিলোভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বসানোর। বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রগুলির কাজও করা হবে ত্বরান্বিত।

শক্তি উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় যোজনায় বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪৪ কোটি টাকা।

এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকার অংকে)

	১৯৭৭-৭৮ বাজেট	১৯৭৭-৭৮ সংশোধিত	১৯৭৮-৭৯ বাজেট
রাজস্ব খাতে			
আয়	৯,৩৪২	৯,৭৭৮	১০,৪৬১ + ৩২১ *
ব্যয়	৯,৪৮৭	৯,৭৪৩	১০,৮৯৯
	+ ৫৫	+৩৫	(--) ৪৩৮ + ৩২১
মূলধনী খাতে			
আয়	৫,৯৪২	৫,৫৯১	৬,৫৬০ + ২৫ *
ব্যয়	৬,০৮১	৬,৬০১	৭,৫১৮
	(—) ১৩৯	(—) ১০১০	(--) ৯৫৮ + ২৫ *
মোট			
আয়	১৫,৪৮৪	১৫,৩৬৯	১৭,০২১ + ৩৪৬ *
ব্যয়	১৫,৫৬৮	১৬,৩৪৪	১৮,৪১৭
মোট ঘাটতি	৮৪	৯৭৫	১,৩৯৬ (—) ৩৪৬ *

নীট ঘাটতি ১,০৫০

* বাজেট প্রস্তাবের ফলশ্রুতি

একেত্রে স্বাস্থ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৫৩ কোটি টাকা। ফলে বিদ্যুৎ খাতে মোট নিবিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৭৮-৭৯ সালে দাঁড়াবে ২২১৭ কো.টি টাকা। চলতি বছরে এ খাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯২৫ কোটি টাকা। পল্লী বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ ১৯০ কো.টি টাকা থেকে বাড়িয়ে এই বাজেটে ২৯৭ কোটি টাকা করা হয়েছে।

অপরিশোধিত তেলের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবারে এখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৩৫ কো.টি টাকা।

ইস্পাত ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৬৩ কো.টি টাকা। চলতি বছরে ছিল ৫১১ কো.টি টাকা। ভিলাই ও রৌরকেলার সম্প্রসারণ, রাউরকেলার কো.ল্ড রোল্ড প্লেন ওরিয়েন্টেড প্ল্যান্ট এবং সালেমের ইস্পাত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কুদ্রেমুখ প্রকল্পের জন্য এবারে বরাদ্দ করা হয়েছে ২১৩ কোটি টাকা। আগের বছরে ছিল ১৪২ কোটি টাকা।

পরিবার কল্যাণ

দেশ জুড়ে সরকার পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা আরো জোরদার করে তুলতে চান। তাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে গতবারের ২৮৪ কোটি টাকার জায়গায় এবার বরাদ্দ হয়েছে ৩৯৩ কোটি টাকা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা খাতে এবারে বরাদ্দ বাড়ছে ২৩ শতাংশ। ১৯৭৮-৭৯ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধার্য হয়েছে ২২০ কোটি টাকা। ১৯৭৭-৭৮-এ ছিল ১৭৯ কো.টি টাকা। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ পাবে ৫১ কো.টি টাকা। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকল্পের জন্য ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সংশোধিত হিসাব

১৯৭৭-৭৮ সালের সংশোধিত হিসেবে আবকর এবং যৌথ কর থেকে রাজস্ব আদায়ে ৩৬ কোটি টাকার ঘাটতি থাকছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক খাতে আদায়ও সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ১৪০ কো.টি টাকা কম হবে। এসব ঘাটতির কারণ হলো শিল্প উৎপাদনে মন্থরগতি।

কর ও শুল্ক খাবদ রাজ্যগুলোর অংশ হবে ১৭৯৯ কোটি টাকা। মোট বাদ দিয়ে আদায়ীকৃত কর থেকে কেন্দ্রের অংশ বাজেট হিসেবের তুলনায় ১০০ কোটি টাকা কম হবে।

বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণের পরিমাণ ১৯৭৭-৭৮-এর বাজেট হিসেবের তুলনায় ১৮৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। এর কারণ হল ব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি। বৈদেশিক সাহায্যবাবদ নীট আয় বাজেটের হিসাব ১০৫২ কোটি টাকা থেকে ২৭৫ কোটি টাকা কম হবে।

প্রতিরক্ষা ছাড়া যোজনা বহির্ভূত রাজস্ব খাতে ব্যয় বাজেট বরাদ্দের ৫৪৩৬ কোটি টাকার থেকে আরো ১১৮ কোটি বেশী হবে। এরমধ্যে ৮৪ কো.টি টাকা বাড়বে রপ্তানী উন্নয়নের জন্য। এছাড়া যোজনাবহির্ভূত রাজস্ব খাতে অন্য সব খরচই প্রায় বাজেট সীমার মধ্যেই রাখা

হয়েছে। বন্ধিত অতিরিক্ত পরিচয় নিতে হয়েছে বাস ও লেবর সাথে মূল্য বাড়িয়ে ও স্টেডিয়াম লাভ করিয়ে। ডেভেলপ অতিরিক্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব নিতে হয়েছে মাসের লাভ বিনিয়োগ বাবদে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা দিতে অতিরিক্তই তাও মাসে অতিরিক্ত দুধ এবং অবসরপ্রাপ্তদের অতিরিক্ত ভর্তুকি দিতে।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য গত কয়েক বছর অতিরিক্ত বৃদ্ধির চাপ এবং বর্তমান আমদানি পরিস্থিতি যাতে অব্যাহত করানো গিয়েছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে নতুন করের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে এবং ব্যয় সংকোচ করে বলে তিনি জানান।

সংশোধিত বাজেটে কর বাবদে, আয়ের দিক থেকে, কর, উৎপাদ এবং ভূমি রাজস্বের বাবদ আদায়কে যে বরাদ্দ করা হয়েছিল তার থেকে অনেক কম ধরা হয়েছে। এর মূল কারণ হল, সমস্তরের মন্দাবস্থার প্রভাব এবং অনেকগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সূত্র থেকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করায় বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি।

সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৭-৭৮ সালে মূলধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎসে ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়বে এবং আশা পরিকল্পনায় খরচ বেশী হবে ১৩ কোটি টাকা।

মোট ৩৯৭৮ কোটি টাকার মূল বাজেট থেকে কেন্দ্রীয় যোজনা কর্মসূচীতে ২৩৫ কোটি টাকা খরচ করা হবে একথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পক্ষপাতের খরচের পরিমাণে তিনি মোটেই খুশী নন। এজন্য আইন সাংবিধানিক পরিবর্তন প্রয়োজন এবং আগামী বাজেটগুলিতে এ বিষয়ে আরো বেশী চাপ দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৭৭-৭৮ সালে ৯৭৫ কোটি ঘাটতি

১৯৭৭-৭৮ সালের সংশোধিত হিসেবে বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াবে ৯৭৫ কোটি টাকা। মূল বাজেটে ধরা হয়েছিল ৮৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারগুলির গ্রাম অর্থনৈতিক নীতির জন্য বিভিন্ন খাতকে অতিরিক্ত ৪১৪ কোটি টাকা সাহায্য দিতে হয়েছে। বন্যা ও খরার কারণে অতিরিক্ত ৫৩৯ কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলে করেন, বন্ধিত নতুন রাজ্য সরকারগুলিকে দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করার জন্য সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য কিন্তু বর্তমানে তিনি আশা করেন যে, তাঁরা এখন থেকে এমনভাবে রাজ্য পরিচালনা করবেন যাতে অনুমোদিত ওভারড্রাফট আর নিতে না হয়। ঘাটতি আমদানীর জন্য ১৯০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে টাকার যোগান না বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রাকে মূল্যবান সাবের মধ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সবশেষে, শ্রী পাঁচাটিন বলেন, বন্ধিত দেখে মনে হয় ১৯৭৭-৭৮ এর বাজেট বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বাস্তব, পরিচালন ও সংকোচন নীতির জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ করেছে এবং মুদ্রাস্ফীতি ছাড়াই এ বছর শেষ হয়েছে।

Is WBIDC on your itinerary ?

Total sanctions exceed Rs. 44 crores
Last year's disbursements Rs. 7 crores
(compared to Rs. 2.90 crores in the year previous)
Assisted projects 139
45 already in production

Assisting whom ? Private sector industries in the medium & large scale (over Rs. 10 lakhs plant & machinery)

For what ? Substantial expansion (25% increase in fixed assets), diversification or new units in West Bengal

How ? Project formulation and feasibility studies, underwriting equity & preference or debentures, sales tax pay backs, power subsidies, relief against octoi, special subsidies for backward areas.

How well equipped is WBIDC ? It has a share capital of Rs. 3.43 crores, and has so far raised Rs.13 20 crores through bonds issues The requirements for the incentives scheme are met by the State Govt. WBIDC has a core of well-qualified staff to help entrepreneurs in project formulation and appraisal.

Any more questions ? Ask the Public Relations Officer.

wbidc West Bengal Industrial Development Corporation Ltd.,
23A, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001, Telephone : 22-8365 (5 Lines)

WBIDC AS-1/77A1

কেন্দ্রীয় বাজেট:
• নতুন কর ৫৪৯ কোটি টাকা
• ঘাটতি ১০৫০ কোটি টাকা
• কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে বিশেষ ছাড়

বিশেষ প্রতিনিধি

বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অগ্রগতির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবার উপযোগী এবং ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট হল সে ধরণেরই একটি পদক্ষেপ।

এই উদ্দেশ্যে বাজেটে নতুন কর বাবদে তিনি অতিরিক্ত ৫৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করেছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও বাণিজ্য শুল্ক বাবদ ৪৯৯ কোটি টাকা আদায় হবে, ২৫.৫ কোটি টাকা আসবে প্রত্যক্ষ কর থেকে এবং ২৫ কোটি টাকা বর্ধিত হারে আবশ্যিক জমা প্রকল্প থেকে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পাবেন ৪৫৪ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির ভাগে পড়বে ১৫.৫ কোটি টাকা, কিন্তু ব্যাঙ্কের সুদের ওপর কর রেহাইয়ের ফলে এবাবদ কেন্দ্রের প্রকৃত পাওনা দাঁড়াবে ৩৪৬ কোটি টাকা। আয়কর, সম্পদ কর ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ করের হারের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী কোন রদবদল করেননি।

প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আরও সক্ষম বৃদ্ধি এবং ব্যবসায় ও পুঁজির ক্ষেত্রে অপচয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি নতুন করের প্রস্তাব করেছেন।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে তিনি কুটির শিল্পকে রক্ষা করা এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের কষ্ট লাঘব করার কথা মনে রেখেছেন।

আবশ্যিক জমার হার বৃদ্ধি

অর্থমন্ত্রী আমদানি ব্যাপারে আবশ্যিক জমার হার বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন। ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আমদানির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হবে না। কিন্তু ১৫ হাজারের অধিক থেকে ২৫ হাজার টাকা আমদানির ব্যক্তিদের বর্তমানের ৪ শতাংশের জায়গায় ৪.৫ শতাংশ, ২৫০০১ টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আমদানির ব্যক্তিদের বর্তমানের ১০ শতাংশের জায়গায় ১১ শতাংশ, ৩৫০০১ টাকা থেকে ৭৫ হাজার টাকা আমদানি পর্যন্ত বর্তমানের ১৫ শতাংশের জায়গায় ১২.৫ শতাংশ এবং ৭৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে আমদানির ব্যক্তিদের বর্তমান ১২ শতাংশের বদলে ১৫ শতাংশ টাকা জমা দিতে হবে। এর ফলে সরকারের ঘাটতি আর হবে ২৫ কোটি টাকা।

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা

জীবন বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য অনুমোদিত দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের মাত্রা এবাজেটে বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে এসব সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ৪ হাজার টাকার ১০০ শতাংশ, পরবর্তী ৬ হাজার টাকার ৫০ শতাংশ, ও অবশিষ্ট পরিমাণের উপর ৪০ শতাংশ আয় করের ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। এবার থেকে প্রথম ৫ হাজার টাকার ১০০ শতাংশ ছাড় পরবর্তী ৫ হাজার টাকার ৫০ শতাংশ ছাড়, এবং অবশিষ্টের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এই ছাড়ের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের অঙ্ক বর্তমানের ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা হয়েছে। এতে পুরো এক বছরে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হবে ১০ কোটি টাকা। এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে সাড়ে সাত কোটি টাকা।

নতুন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শ্রীপ্রণবেশ ট্রেসব কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের মূল্য কম টাকা ৫০ শতাংশ ছাড় দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্যের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা ধার্য করা হবে। এবছরে একটি গোটা বছরে ৫ কোটি টাকার এবং ১৯৭৮-৭৯-তে ৩.৫ কোটি টাকার ক্ষতি হবে। বিনিয়োগকে আকর্ষণীয় করার জন্যই ঐ ক্ষতি স্বীকার করা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলিতে ডিমান্ড ডিপোজিট রাখলে এই মূলধনী আবশ্যক করের ক্ষেত্রে রেহাইএর ব্যাপারে বৈধ বিনিয়োগ বলে গণ্য করা হবে না।

স্বল্প ও মাঝারি আয়ের লোকেদের গৃহনির্মাণের ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার আয়ের ছাড়ের পরিমাণ বর্তমানের ১২০০ টাকা থেকে ২৪০০ টাকা করা হয়েছে। নিম্ন আয়ের শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য নিয়োগকারীদের গৃহ-নির্মাণে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে বাড়ীর মূল্য হ্রাস বাবদ ছাড়ের হার বর্তমানের ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকরা এখন থেকে এদেশে ৮৯ দিন অবস্থান কাটাতে পারবেন কোনরকম করের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে।

বিজ্ঞাপন খাতে বিভিন্ন কোম্পানির অতিরিক্ত খরচ প্রায়শই অপব্যয়ের পর্যায়ে পড়ে বলে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল বিজ্ঞাপন ও প্রচার খাতে ব্যয়ের উপর কর ব্যবস্থা নতুন করে ফেলে সাজাবার প্রস্তাব করেছেন। মোট বাণিজ্য যা আসবে এক চতুর্থাংশ বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং বিক্রয় প্রসারে খরচ না হলে এই বাজে খাতের এক দশমাংশের উপর কোন কর ছাড় পাওয়া যাবে না। মোট ব্যয় অর্ধ শতাংশ না হলে ১২.৫ শতাংশ এবং অর্ধ-শতাংশ বেশী হলে ১৫ শতাংশের বেশী ছাড় দেয়া হবেনা। তবে এক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট ব্যয় এর আওতায় আসবে না। এরফলে পুরো বছরে অতিরিক্ত আয় হবে ৩১ কোটি টাকা এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে পাওয়া যাবে ২৫ কোটি টাকা।

ঘোড়দৌড়ে অর্জিত আয় এবারের বাজেটে আয়করের আওতায় আনা হয়েছে। ঘোড়দৌড়ে ২৫০০ টাকার বেশী আয় হলে ৩৪.৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। এই কর থেকে পুরো এক বছরে ৪ কোটি টাকা এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে ৩.৫ কোটি টাকা আয় হবে।

অর্থমন্ত্রী ভারতীয় কোম্পানী এবং আয়কর দাতাদের ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা বাজার থেকে তুলবার জন্য করযোগ্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে ছাড় পান তা তুলে দেবার প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেছেন, এখন থেকে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত আহরণী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বেচ্ছাবলম্বকভাবে অগ্রিম আয়কর দিতে হবে। ডাকবাসনের ক্ষেত্রে কিছু বৃদ্ধির কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন।

সম্পত্তি করে রেহাই বৃদ্ধি

শ্রী প্যাটেল আয়কর দাতাদের আর একটি সুবিধা দিয়েছেন। তিনি সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে রেয়াইয়ের সীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করার প্রস্তাব করেছেন। এ ব্যাপারে রাজ্য বিধান সভার সম্মতি দরকার বলে এ প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য একটি বিল এবছরের শেষে আনা হবে বলে তিনি জানান।

ব্যাঙ্কের সুদের উপর কর ছাড়

গ্রাম বা আধা গ্রামাঞ্চল তুলনীভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি যে সুদ পায় তার উপর ১৯৭৯ সালে ধার্য কর তুলে নেয়া হবেছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ থেকে তাদের আয় দাত শতাংশে লেভি দিতে হবে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে পুরো এক বছরে সরকারের ক্ষতি হবে ১৩০ কোটি টাকা।

পরোক্ষ কর

অর্থমন্ত্রী পরোক্ষ কর সংগ্রহের যেসব প্রস্তাব ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে করেছেন তাথেকে ৪৯৯ কোটি টাকা আদায় হবে। এর মধ্যে আমিক্ষ শুল্ক বাবদ আয় হবে ১৩ কোটি টাকা।

বিদ্যুতের উপর কিলোওয়াট-ঘণ্টা পিছু লেভি ধার্য হয়েছে ২ পয়সা হারে। এর ফলে ১৪৩ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় বলে আশা করা যায়। স্থাপিত প্ল্যান্ট এবং সংরক্ষক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তা এই লেভির আওতায় আসবে না।

কৃষিক্ষেত্রে রেহাই

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক পাম্পের ক্ষেত্রেও এই লেভি থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী কয়লার উপর টনপ্রতি পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা হারে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের প্রস্তাব করেছেন। এ থেকে আয় হবে ৫৮ কোটি টাকা।

শ্রী প্যাটেল, অনির্দিষ্ট সময় পণ্য সামগ্রীর উপর উৎপাদন শুল্ক মূল্যানুপাতে বর্তমানের ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন তবে কীটনাশক, আগাছা নাশক, জীবাণু নাশক, তেজস্ক্রিয় দ্রব্য এবং মালিকানা সমযুক্ত ও প্যাটেন্ট ছাড়া অন্যান্য ওষুধপত্রের উপর উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেয়া হয়েছে।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন শুল্ক মুক্ত হবে।

এইসব প্রস্তাবের ফলে রাজস্ব আদায়ে ১০০ কোটি টাকা।

কয়লা, বিদ্যুৎ এবং ৬৮ নম্বর তালিকাভুক্ত সামগ্রী ছাড়া অন্যান্য সব পণ্যের মৌল কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের উপর পাঁচ শতাংশ হারে বিশেষ শুল্ক ধার্য হয়েছে। এর ফলে মোট আয় হবে ২২৯ কোটি টাকা।

ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা

সাবান, গুঁড়া সাবান, ওষুধ, বই, ষ্টীলের বাসনপত্র সহ ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত ৬৯ টি পণ্য কর ছাড় পাচ্ছে। এর ফলে প্রায় ২৮ হাজার ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থা উপকৃত হবে। যেসব ক্ষুদ্রশিল্প বর্তমানে ১৫ লক্ষ টাকার এসব পণ্য উৎপাদন করছে তাদের ৫ লক্ষ টাকার ডিসিলের উপর উৎপাদন শুল্কের ছাড় দেওয়া হবে, ১ এপ্রিলে ১৯৭৮ থেকে এই পরিবর্তনগুলি কার্যকর হবে। এর ফলে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হবে ২৮ কোটি টাকা।

চালানি চিসেবে ব্যবহৃত মোটরযান এখন যে ছাড় পেয়ে থাকে তিন চাকার অটোরিক্সার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। ফলে মূল্যানুপাতের অটো রিক্সার উপর ২½ শতাংশ শুল্ক হ্রাস পাবে। অর্থমন্ত্রী ১০০ সিসির বা তার কম ছোট মোটর সাইকেল-স্কুটারের উপর শুল্ক মূল্যানুপাতে বর্তমানের ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন। সিমেন্টের উপর উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে। লুব্রিকেটিং তেলের উপর করের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কনডেন্সার টিস্যু পেপার, বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন পেপারে পলিপ্রপিলিন ফিল্মের বাণিজ্য শুল্ক কমানো হয়েছে। এর ফলে রাজস্বের ক্ষতি হবে ৪ কোটি টাকা।

বিশেষ ধরণের কাপড়, সিমার, চুরুট, সিগ্রে ব্যবহার্য উপাদান দ্রব্য ইত্যাদির শুল্কের হার পুনর্বিন্যাসের ফলে সরকারের আয় হবে ৬ কোটি টাকা।

বেশব মূলধনী সরঞ্জাম দেশে তৈরী হয়না তার উপর বাণিজ্য শুল্ক ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পল্লীউন্নয়নে এবারের বাজেট বরাদ্দ

মঞ্জুলা বসু

জনতা সরকারের ঘোষিত অর্থনৈতিক নীতি ও যোজনার কাঠামো সম্পর্কিত আলোচনা থেকে এই ধারণাই স্বাভাবিক-ভাবে লোকের হয়েছে যে পল্লী-উন্নয়নের ব্যবস্থা বাজেটেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে। গত জুন মাসে যখন জনতা সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করা হয় তখন মৌলিক ধরণের কোনও পরিবর্তন বাজেটে আনা সম্ভব ছিল না কারণ বাজেট তৈরী করার জন্য হাতে সময় ছিল অল্প এবং পূর্বতন সরকারের প্রতিশ্রুত কতকগুলি ব্যয়বরাদ্দকে মঞ্জুরীকার করার উপায় ছিল না। তা সত্ত্বেও পল্লী উন্নয়নের উপর লক্ষ্যণীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কৃষিখাতে মোট ব্যয়ের ১০% ধার্য করা হয়েছিল। কৃষি, সেচ প্রকল্প, সমবায় ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট ৩০২৪ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। এছাড়া ছিল রাস্তাঘাট তৈরী, পানীয় জল সরবরাহ, বাজার, পশুপ্রজনন, হাঁস মুরগী প্রতিপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির উপর অগ্রাধিকার।

বর্তমান বাজেটেও একই ধারা অনুসরণ করে কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাজেটের দুটি দিক, একটি রাজস্ব সংগ্রহ ও অপরটি ব্যয়বরাদ্দের দিক। রাজস্ব সংগ্রহের দিক থেকে আলোচনা করলে কৃষির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূমিকা সাধারণভাবেই গৌণ কারণ কৃষির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রত্যক্ষ করগুলি প্রধানত রাজ্যসরকারের আওতায় পড়ে। কৃষির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাজস্বব্যবস্থার ভূমিকা তাই পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান বাজেটে কিন্তু নতুন প্রত্যক্ষ কর প্রায় নেই। যে ৫৫০ কোটি টাকা নতুন কর বসানো হয়েছে তার সবটাই প্রায় পরোক্ষ কর এবং সেগুলি শহর ও গ্রামাঞ্চলের লোককে সমান ভাবেই স্পর্শ করে। নতুন কর প্রস্তাবের মধ্যে আবগারী শুল্কের ভূমিকাই সর্বপ্রধান। যে সব জিনিসের উপর কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক বহাল আছে তাদের হার বাড়িয়ে ২% থেকে ৫% করা হয়েছে। এখানে কৃষির স্বার্থে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে, যেমন কৃষিতে ব্যবহৃত শক্তি চালিত পাম্পকে আবগারী কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। আবার কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রেও আবগারী শুল্ক না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাতে কৃষির সুবিধাই হবে। কিন্তু সাধারণভাবে অন্যান্য সব জিনিসের ক্ষেত্রেও আবগারী শুল্ক বেড়ে যাওয়াতে তা শহর ও গ্রামাঞ্চলের লোকেদের সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আবার কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যুতের উপর রাজস্বের হার দুপয়সা করে বাড়ানো হয়েছে, এখানেও এই বর্ধিত রাজস্ব কৃষির উপর ধার্য হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই কর ধার্য করার জন্য যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে তাতেও অবশ্য যথেষ্ট গলদ আছে। বলা হয়েছে যে যেহেতু সরকার বিদ্যুৎ-সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করছেন সেহেতু এই কর ধার্য করা হল। কোনও উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্য বিনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি করভার বৃদ্ধি পায় তবে তার সুফল অনেকটাই কমে যায়। আর কৃষি ক্ষেত্রে সাহায্য করার অর্থ নিশ্চয়ই শিল্পের সঙ্গে অসহযোগিতা নয়, বিশেষ করে যখন বিদ্যুতের চাহিদা এমনিতেই উৎপাদন কালে অনেক বেড়ে গেছে। কয়লার উপর যে আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়েছে তা কিন্তু সব স্তরের লোকের উপরই পড়বে এবং সেখানে কাউকেই ছাড় দেওয়া হয়নি।

পল্লী উন্নয়নের জন্য বাজেটে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানতে গেলে আয়ের চেয়েও বেশী ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। অর্থমন্ত্রীও বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াবার জন্য—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে—তিনি ব্যয়বরাদ্দকেই প্রধান হাতিয়ার করেছেন। সেইজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথমত, পরিমাণগতভাবে কৃষি ও জলসেচের জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রামীণ উপজীবিকা যথা, হাঁসমুরগী প্রতিপালন, গবাদি পশু প্রজনন, মৎস্য প্রকল্প ইত্যাদিতেও অনুরূপ ব্যয় বরাদ্দের বৃদ্ধি হয়েছে। নীচের তালিকায় প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দের হিসাবটি দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

কৃষি ও আনুষঙ্গিক সেবাপ্রকল্প (রাজস্ব খাতে)
(লক্ষ টাকার হিসেবে)

	১৯৭৭-৭৮ সংশোধিত হিসাব	১৯৭৮-৭৯ বাজেট
কৃষি	১১৬.১৬	২৭৪.২৭
ক্ষুদ্র সেচ	৮.৩২	৯.২৯
আঞ্চলিক উন্নয়ন	৩.১৮	২৫.১১
পশু প্রজনন	১৩.৪৬	১৪.৮১
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন	১২.৩০	১৩.০৫
মৎস্য চাষ	৯.৭৮	১৬.০৯
বন	৮.৩৯	১৩.৪৭

বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গত বছরে ১০৩২ কোটি টাকার থেকে এই বছরের বাজেটে এই টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ১১৬৬ কোটি টাকা করা হয়েছে।

রাজস্ব খাতে নির্ধারিত ব্যয় ছাড়াও যোজনা খাতে কুড়ি সেচ প্রকল্পের জন্য ২৩৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই বরাদ্দের উপরেও কৃষির বিভিন্নমুখী ও উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাছে ঋণ পাওয়া যাবে। এই সব প্রচেষ্টার ফলে নতুন আরও ত্রিশ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের সুবিধা দেওয়া যাবে, যেখানে গত বছর নতুন ২২.৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ এর ফলে খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর দ্রব্যের সংযোজন শুধু বাড়বে না, আশা করা হচ্ছে ৪০ লক্ষ নতুন লোকের জীবিকার সংস্থান হবে এবং এর ফলেও গ্রামাঞ্চলের লোকেরা উপকৃত হবে। এইজন্য কেন্দ্রীয় যোজনায় ৫০০ কোটি টাকার একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব আছে। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ ঘটলে গ্রামাঞ্চলের লোকদের সার্থক জীবিকার সংস্থান হয়, তাই এই খাতে যোজনার ব্যয় ১৪৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এবছর কেন্দ্রীয় খাতে ২১১ কোটি টাকা করার প্রস্তাব আছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ উপজীবিকার জন্য সরবরাহ বাড়ানো ছাড়াও বর্তমান বাজেটে এমন কতকগুলি ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে যেগুলিকে বলা যেতে পারে কৃষির আনুষঙ্গিক কাঠামো বা infrastructural facilityর জন্য। এইগুলি না হলে কৃষি বা পল্লী অঞ্চলের উন্নতি ব্যাহত হয়। এর মধ্যে আছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয়জলের ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রিত বাজার ইত্যাদি। রাস্তাঘাট নির্মাণ রাজ্য যোজনার একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। এই বাবদ রাজ্য যোজনার ব্যয় বর্তমান বছরে ৮৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে আগামী বছরে ১১৩ কোটি টাকা হবে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য রাজ্য যোজনা খাতে বর্তমান বছরে ৭০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে আগামী বছরে ১০৫ কোটি টাকা হবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে কেন্দ্রীয় যোজনা খাতে ধার্য ৬৫ কোটি টাকা। উপরন্তু অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যেসব প্রকল্প খাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত করতে পারলে এইসব খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েও দেওয়া হতে পারে।

তৃতীয়ত, বর্তমান বছরের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে এই প্রথম রাজ্যগুলির যোজনা খাতে বার্ষিক ব্যয় কেন্দ্রীয় যোজনা খাতে ব্যয়ের চেয়ে বেশী ধরা হয়েছে। রাজ্যগুলির যোজনা বাবদ ব্যয় সামগ্রিক ভাবে ১৯ শতাংশ বাড়ছে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ব্যয় বাড়ছে ২৭ শতাংশ। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় যোজনার ব্যয় বাড়ছে ১৫ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের যোজনায় যে কৃষি, জলসেচ, শক্তি উৎপাদন ও গ্রামীণ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তারই প্রমাণ আমরা পাচ্ছি রাজ্যের যোজনা ব্যয় বেশী বাড়ানোর মধ্যে। কেননা ঐ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়গুলি রাজ্য যোজনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি মিলিয়ে যোজনা বাবদ ব্যয় ১৭ শতাংশ বাড়ানো হচ্ছে। এর মধ্যে অধিকাংশই পুরানো খরচের জের। নতুন যে সব খাতের পরিকল্পনা হচ্ছে তার মধ্যে কিছু বেশীটাই ধার্য হয়েছে কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ। রাজ্যগুলির যোজনার ব্যয় বহনের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে সাহায্য ও ঋণদানের প্রস্তাব আছে। এই সাহায্য ও ঋণের পরিমাণও এই বছরের বাজেটে বাড়ানোর প্রস্তাব আছে। ১৯৭৭-৭৮ সালের সংশোধিত হিসাবে এর পরিমাণ ছিল ২০৫০.৮৬ কোটি টাকা। বর্তমান বাজেটে এর পরিমাণ ২৪১০ কোটি টাকা। কৃষির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা খাতে ব্যয় ৪৯০ কোটি টাকা থেকে ১৭৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় যোজনায় বৃহৎ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে যে সাহায্য মঞ্জুরীর প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে আছে কয়াড অঞ্চল উন্নয়ন, খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য প্রকল্প, নিয়ন্ত্রিত বাজার, গ্রামীণ জল সরবরাহ, স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন সম্প্রসারণ, জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে জমির নতুন যে সব মালিক সৃষ্টি হয়েছে তাদের সাহায্য ইত্যাদি বাবদ প্রকল্প।

চতুর্থত, বর্তমান বছরের বাজেটে তপশীলি জাতি ও সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যও ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গত বছর এই বরাদ্দ ছিল ৮৬ কোটি টাকা এবং বর্তমান বছরে হচ্ছে ১২৫ কোটি টাকা। রাজ্যগুলিতেও উপজাতির লোকেদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থার সুফলও অনেকটাই গ্রামাঞ্চলের লোকেরা ভোগ করবে সন্দেহ নেই।

কৃষি বা গ্রামাঞ্চলের উন্নতির সঙ্গে শিল্পের উন্নতির কোনও বিরোধ নেই। কৃষি ও শিল্প পারস্পরিক এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার উন্নতির কথা ভাবা যায় না। এই বছরের বাজেটে কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রচেষ্টা কিছু দেখা যাচ্ছে না। গত বছরের বাজেটের চেয়ে এবার শিল্প ও খনিজ ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ বলা হচ্ছে বাজেটে বিরাট ঘাটতির অন্যতম কারণ হল শিল্প উৎপাদনের শ্লথ গতি এবং তার জন্য রাজস্ব কমে যাওয়া। সেক্ষেত্রে শিল্পের উৎপাদন আরও ত্বরান্বিত করার চেষ্টাই স্বাভাবিক ছিল। শিল্পের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার বিশেষ কোনও চেষ্টা নেই, কৃষিক্ষেত্রেও গত বছরের বরাদ্দ আর খানিকটা বাড়ানো হচ্ছে এই মাত্র। সব মিলিয়ে যোজনা ব্যয় মাত্র ১৭% বাড়ছে, কোনও চমকপ্রদ নতুন বিকাশের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, তবুও কেন রেকর্ড পরিমাণ ঘাটতি হল এটা সকলের কাছেই একটা বিস্ময় হয়ে থাকছে। এই ঘাটতির দরুণ মুদ্রাস্ফীতির উপর কি পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং তার ফলে গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের লোকেরাই বা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত নই, অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে যাই আশ্বাস দিন না কেন।

ঘাটতি বাজেট, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি

ভবতোষ দত্ত

এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটে ১০৫০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখে অনেকে বলছেন গত বছর তুন মাসে যখন ১৯৭৭-৭৮-এর বাজেট পেশ করা হয়েছিল তখন নীট ঘাটতি দেখানো হয়েছিল মাত্র ৭২ কোটি টাকার এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে ঘাটতি বাজেটের পথে সরকার আর যাবেন না। এবারের বাজেটে কি তা হলে আগের চেয়ে বেশি ব্যয় করার পুরানো নীতি সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোল? এর উত্তরে প্রথমেই বলা চলে যে গতবারের বাজেটে সরকারি হিসাব অনুসারেই ঘাটতি ছিল আসলে ৮৭২ কোটি টাকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ৮০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার 'বিশেষ ঋণ' নেওয়া হবে দেখিয়ে ঘাটতির অঙ্কটা ৭২ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল। তখন এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে আমাদের বর্তমানে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার এবং প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের ব্যবস্থা থাকাতে এর অতিরিক্ত কোনো বিদেশী মুদ্রার 'বিশেষ ঋণ' প্রয়োজন হবে না। এখন দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৭-৭৮-এ সরকারি হিসাবের নীট ঘাটতি হবে ৯৭৫ কোটি টাকা অর্থাৎ আগেকার হিসাবের ৮৭২ কোটি টাকা থেকে মাত্র ১২ শতাংশ বেশি। এবং এই ৯৭৫ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৮-৭৯-এর বাজেটে দেখানো ১০৫০ কোটি টাকার ঘাটতি খুব বেশি বলে মনে হবে না।

বাজেটের প্রাথমিক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ অবশ্য আরো কিছু বেশী। ১৯৭৮-৭৯ সালে সাধারণ রাজস্ব খাতে আয় দেখানো হয়েছে ১০,৪৬১ কোটি টাকা, সব রকম করের হার অপরিবর্তিত আছে ধরে নিয়ে। এই খাতে মোট ব্যয় হবে ১০,৮৯৯ কোটি টাকা এবং তার ফলে ঘাটতি হবে ৪৩৮ কোটি টাকা। মূলধনী খাতে মোট ব্যয় হবে ৭৫১৮ কোটি টাকা এবং আয় হবে ৬৫৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতি হবে ৯৫৮ কোটি টাকা। এই দুই খাতের ঘাটতি যোগ দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে ১৩৯৬ কোটি টাকা। নূতন কর বসিয়ে যে ৫৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে তার মধ্যে রাজ্য সরকারগুলির অংশ ও অন্যান্য কিছু দেয় টাকা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসবে ৩৪৬ কোটি টাকা। ফলে, ১৩৯৬ কোটি টাকার ঘাটতি কমে গিয়ে ১০৫০ কোটিতে দাঁড়াবে। এবারে এই ঘাটতি খোলাখুলি ভাবেই দেখানো হয়েছে—'বিশেষ ঋণ' বা ঐ জাতীয় কোনো ছদ্ম আবরণ দিয়ে ঘাটতি কমিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হয় নি।

কিন্তু এই বাজেট ঘাটতির অন্য একটা দিক আছে যেটা সরকারি হিসাবে পরিষ্কার করে দেখানো হয় না। শেষ পর্যন্ত যে নীট্ ঘাটতি দেখানো হয় সেটা পূরণ করা হয় প্রধানত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে স্বল্প-মেয়াদী ট্রেজারি বিলের বদলে অর্থ-সংগ্রহ করে—অর্থাৎ নোটা ভাষায় নোট ছাপিয়ে। এদিক থেকেই বলা হয় যে সরকারি ঘাটতির ফলে মুদ্রা-সম্প্রসারণ হয় এবং ভিনিময়পত্রের দাম বাড়ে। কিন্তু সরকার যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পত্র বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহলে তাতেও মুদ্রাস্ফীতি হয়। সরকারি বাজেটের ঘাটতি ঠিক কত সেটা হিসাবে করতে হলে প্রথমেই দেখা উচিত সরকার ঋণ করে কত টাকা সংগ্রহ করবেন—সেটা স্বল্পমেয়াদী ট্রেজারি বিল বিক্রি করেই হোক, আর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণপত্র বিক্রি করেই হোক। তার পরে যদি প্রশ্ন ওঠে যে সরকারি মোট ঋণের ফলে মুদ্রাস্ফীতি কতটা হবে তাহলে দেখা দরকার এই ঋণের কতটা আসছে দেশের সকল থেকে আর কতটা আসছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে। সাধারণ লোক আজকাল আর সরকারি ঋণপত্র কেনে না। কিন্তু জীবন বীমা কর্পোরেশন বা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কর্তৃপক্ষ যখন সরকারি ঋণপত্র কেনে তখন তারা জনসাধারণের সঞ্চয় এই ভাবে বিনিয়োগ করছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ব্যাঙ্ক যখন সরকারকে টাকা ধার দেয় তখন তাদের ব্যবসায়ীকে দেওয়া ধারের সঙ্গে তার কোনো মূল পার্থক্য নেই।

সুতরাং, ঘাটতি বাজেট থেকে কতটা মুদ্রাসম্প্রসারণ হবে সেটা শুধু সরকারি হিসাবের নীট ঘাটতি থেকে পাওয়া যাবে না। বৎসরান্তে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিগত বছরের মুদ্রা-প্রচলনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে হিসাব দেয় তখন ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থেকে সরকার কতটা ঋণ পান তার একটা সমগ্র চিত্র দেওয়া হয়—সেখানে স্বল্প মেয়াদী ট্রেজারি বিল ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। প্রায় প্রত্যেক বছরেই দেখা যায় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিতে সরকারি দায়িত্ব, বাজেটে দেখানো নীট ঘাটতির চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি। সরকারি হিসাবে অনেক সময় নীট ঘাটতি কম দেখানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ট্রেজারি বিল আছে তার কিছুটা অংশ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণপত্রে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। ১৯৭৭-৭৮-এ ১০০ কোটি টাকার ট্রেজারি বিলকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণপত্রে পরিণত করা হয়েছে। আসলে কোনো কিছুই বদলায় নি—শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে একরকমের কাগজের বদলে অন্য এক রকমের কাগজ রাখা হয়েছে। এটা না করলে ১৯৭৭-

১৯৭৮-এর নীট ঘাটতি ২৭৫ কোটির জায়গায় ১০৭৫ কোটি বলে দেখাতে হোত।

ঘাটতি বাজেটের ফলে কতটা মুদ্রা সম্প্রসারণ হবে এবং কতটা মূল্য বৃদ্ধি হবে সেটা এখন কারো পক্ষে বলা অসম্ভব। জিনিসপত্রের উপরে কর বসিয়ে যে অতিরিক্ত ৪১১ কোটি টাকা তোলা হবে তার ফলেই কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি হবে। সরকারি মুখপাত্ররা বলেছেন, নূতন কর বসানোর ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে সেটা হবে অতি সামান্য—তাঁদের হিসাবে, প্রতি ১০০ টাকাতে ৭০ পয়সা মাত্র। এই ধরণের হিসাবের কোনো অর্থ নেই। তারতবাসীর মোট ব্যয়ের সঙ্গে ৪১১ কোটি

নূতন সরকারি পরিকল্পনা-ব্যয় এবারে বেশির ভাগ যাবে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নতিতে। যদি এই ব্যয় এমন ভাবে করা হয় যে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়ে এবং সর্বস্তরে বণ্টনব্যবস্থা সুষ্ঠু করা যায় তাহলে বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ দেখে শঙ্কিত হবার কারণ নেই।

টাকা তুলনা করলে এই রকমই একটা হিসাব পাওয়া যায় কিন্তু আসল কথা হোল কোন্ কোন্ অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কতটা বাড়বে। পেট্রোলের দাম তো প্রথম দিন থেকেই শতকরা প্রায় দাড়ে তিন টাকা বেড়ে গিয়েছে। যে সব আবশ্যকীয় জিনিস দুই শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশতে তোলা হল তাদের দামও অন্তত তিন শতাংশ বাড়বে। তার চেয়ে বেশিও বাড়তে পারে, কারণ অনেক জিনিসের বেলাতে উৎপাদনের প্রত্যেক ধাপে অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরে যে নূতন শুল্ক বসানো হোল তার জন্য তো দাম বাড়বেই, কয়লার দাম বাড়াতে বিদ্যুতের দাম আরো বাড়বে। নূতন করের বোঝা উৎপাদকেরাই কিছুটা বহন করবে এরকম আশা প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন প্রথম দিন থেকেই বেড়াবে দাম বাড়িয়েছে, তাতে বেসরকারি উৎপাদকেরা দাম বাড়ানোতে উৎসাহিত হবে।

অবশ্য শুল্ক-বৃদ্ধি থেকে যে মূল্যবৃদ্ধি হয় আর মোট চাহিদা ও জোগানের তারতম্যে যে মূল্যবৃদ্ধি হয় তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। শুল্ক-বৃদ্ধি থেকে দাম বাড়লে সেটা অল্প দিনের মধ্যেই যেটুকু বাড়বার বেড়ে যায়—কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা ঐ জাতীয় কারণে মূল্যবৃদ্ধি হলে সেটা একটা নিজস্ব গতিবেগ সংগ্রহ করে এবং একবার দাম বাড়তে আরম্ভ করলে সেটা আরো জোরের আকার নিতে পারে। সেজন্য ঘাটতি বাজেট থেকে যদি মুদ্রাস্ফীতি হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটাকে যতদূর সম্ভব অবদমিত করা প্রয়োজন। এবছর সরকার একটা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বাজেট পেশ করেছেন। গত পাঁচ মাস ধরে আমাদের পাইকারি মূল্যসূচী নিম্নমুখী। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ যে সপ্তাহ শেষ হয়েছিল সে সপ্তাহে মূল্যসূচী ছিল ১৮৮.৮ (১৯৭০-৭১-১০০)। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ এই সূচী এসে দাঁড়িয়েছিল ১৮০.০-তে, অর্থাৎ পাঁচ মাসে প্রায় ৪.৭ শতাংশ কম। ক্রমবর্ধমান মূল্যসূচীর পরিস্থিতিতে সরকারি ঘাটতি বেশি হলে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়বার সম্ভাবনা, বর্তমানে সম্ভাবনা ততটা নেই।

মূল কথা হোল যে, সামগ্রিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি হয় যদি দেশের মোট চাহিদা মোট উৎপাদন ও সরবরাহের চেয়ে বেশি হয় এবং দ্রুততর হারে বাড়তে থাকে। এবারকার সরকারি পরিকল্পনা খাতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১১,৬৪০ কোটি টাকা। (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিনিয়োগ একত্রিত করে)। এটা গতবারের চেয়ে প্রায় ১৭ শতাংশ বেশি। নূতন বিনিয়োগের ফলে সরাসরি নূতন আয় সৃষ্টি হয় এবং চাহিদা বাড়ে। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বার দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। অন্যদিকে নূতন বিনিয়োগের ফলে যদি প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন ও সরবরাহ দ্রুত হারে এবং অনেক পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হয় তাহলে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা প্রতিহত হবে এবং দাম কমতেও পারে। নূতন সরকারি পরিকল্পনা-ব্যয় এখানে বেশির ভাগ যাবে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নতিতে। যদি এই ব্যয় এমন ভাবে করা হয় যে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়ে এবং সর্বস্তরে বণ্টন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু করা যায় তাহলে বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ দেখে শঙ্কিত হবার কারণ নেই। এটাও আশা করা সঙ্গত যে ক্ষুদ্রশিল্পকে নানা রকমের কর ছাড় দেওয়াতে সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়বে।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁর হিসাবে দেখানো ১০৫০ কোটি টাকার নীট ঘাটতি কিছুটা কমানো যাবে সোনা বিক্রী করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে সোনা আছে তার দাম সরকারি হিসাবে ১৯৩ কোটি টাকা এবং বাজার দর অনুসারে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা। এই সোনাতে অবশ্য হাত দেওয়া হবে না। এছাড়া ভারত সরকারের হাতে বাজার দরের হিসাবে আরো প্রায় ৬০০ কোটি টাকার সোনা আছে। বহু বছর ধরে শুল্ক বিভাগ যে সব চোরা-চালানী সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে সেটা সরকারের হাতে জমা আছে। এবং তার উপরে আছে কোলার স্বর্ণখনি থেকে তোলা সোনা। সোনা দিয়ে কেনা ঋণপত্র বিক্রী করেও কয়েক বছর আগে কিছু সোনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই সোনা বিক্রী করে ঘাটতি কমানো যায়, মুদ্রাস্ফীতিও কিছুটা সঙ্কোচন করা যায়। কিন্তু এর মধ্যে দু'টো প্রশ্ন আছে। প্রথমত, আমাদের দেশে

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেটে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

অমুরনাথ দত্ত

এবারের ১০৫০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেটে নতুন কর ধার্য করা হয়েছে ৩৪৯.৫ কোটি টাকার মত, আর সেই সঙ্গে নেওয়া হয়েছে সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে স্বর্ণবিক্রয়ের সিদ্ধান্ত। উদ্দেশ্য হ'ল যথাসম্ভব ঘাটতি পূরণ করা। এছাড়া ১৯৭৮-৭৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে আপাতভাবে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, আয় কর, সম্পদ কর বা অন্যকোন প্রত্যক্ষ করের উপরে কোন হস্তক্ষেপ ঘটেনি। দ্বিতীয়ত কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য বিশেষ ছাড়, কর রেয়াৎ ও নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত বাড়তি আমদানীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টাকার সংস্থান বাড়ানো হয়েছে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে মুদ্রা-সরবরাহের পরিমাণ বাড়িয়ে (Reflation) শিল্প বিনিয়োগ পুষ্ট করে তোলাই সম্ভবত এবারের বাজেটের সবচাইতে অভিনব সিদ্ধান্ত।

জাতীয় অর্থনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাজেটের প্রস্তাবগুলি যে রচনা করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাত্র কিছুদিন আগেই জনতা সরকার অর্থনৈতিক নীতি ও শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন। তাতে নয়া অর্থনীতির উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সেইসঙ্গে বাজেটের প্রাক্কালে প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জাতীয় অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজন সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

অর্থব্যবস্থার প্রাধান্য এই বিবরণীতে বলা হয়েছে, কৃষি উৎপাদন ও বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক হলেও শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। গত এক বছরে তা মাত্র ৫.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে তার আগের বছরে (১৯৭৬-৭৭) তা ১০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদ্যুৎ, কয়লা ও সূতীবস্ত্র উৎপাদনে গুরুগতি হওয়ায় যে এটা ঘটেছে তাই নয়। শিল্পে সঞ্চিত শক্তির ক্রমানুযায়ী হ্রাসের ফলে এরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ব্যাঙ্ক ও বেসরকারী অর্থসংস্থার হাতে টাকা থাকলেও প্রয়োজনীয় অর্থ মেলেনি। আমদানীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টাকার যোগান বাড়েনি, আর সেইসঙ্গে নতুন শিল্পোদ্যোগগুলির পেয়ার বাজারে বন্যা—এই সব কারণে উৎপাদন ব্যহত হয়ে এসেছে। ফলে নতুন বিনিয়োগ ঘটানোর পথে বিস্তর বাধা বিপত্তি ঘটেছে।

এবারের বাজেটে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নতি ঘটাবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। জনতা সরকারের যে নীতি ইতিপূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে সুসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে বাইরের থেকে আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টি করে তাকে কাজে লাগানোই বাঞ্ছনীয়। সম্ভবত তারই সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে আয়কর, সম্পদ কর বা অন্য কোন প্রত্যক্ষ করের ওপরে হস্তক্ষেপ ঘটেনি। ফলে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণও খুব বেশি বাড়েনি। মোট আদায়ের পরিমাণ ২৫.৫ কোটি টাকা হবে বিশেষজ্ঞদের মত। সেইসঙ্গে সম্প্রতি করের ছাড়ের সীমা বৃদ্ধি করে ও নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ টাকায় ক্রেডিট দিয়ে নতুন বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সরকারের মতামতে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের জন্য ধার্যকৃত-মূলক আমানতের উপরে করের হার ওপরের দিকে ১২.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে বাড়ানো হয়েছে। আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, জীবনবীমা ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রকল্পে উৎসাহ দেবার জন্য ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকায় বাড়ানো হয়েছে।

বিনিয়োগ ব্যবস্থার উন্নতি না ঘটলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রমশই ব্যাহত হতে থাকবে এরকম একটা আভাস প্রাক্ বাজেট সমীক্ষাতে দিয়েছিল। অবশ্য বেশ কিছুকাল ধরেই শেয়ার ও মূলধনী বাজারে এরকম একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে বিদেশী কোম্পানির ভারতীয়করণের ক্ষেত্রে ছাড়া নতুন শিল্প ইউনিটের শেয়ার বাজারে প্রায় একেবারেই বন্ধ যাচ্ছিল। এজন্য এবারের বাজেটে চিরাচরিত প্রথায় ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী বৈদেশিক উদ্যমের তাগিদে নতুন করে মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোর (Reflation) একটা প্রয়াস পেয়েছেন। তাই উন্নয়নের ব্যয়বরাদ্দ বর্তমান বছরের ৩,৭১০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭,২৮৩ কোটি টাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। আর মোট ব্যয়বরাদ্দ আগামী বছরে ৯১৬০ কোটি টাকা (বর্তমান বছরের) থেকে বাড়িয়ে ১১,৬৫০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার নতুন তহবিল খুব সন্তোষজনক হলেও আভ্যন্তরীণ অর্থ সংস্থান বা Rupee Resources-এর অভাব ঘটছিল। বর্তমান বাজেটে সেই অভাব অনেকটা মেটানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কতকগুলি অনুমোদিত প্রকল্পে আমদানীর ব্যবস্থা ঘটিয়ে ব্যাঙ্ক ও বেসরকারী অর্থসংস্থা-গুলিকে আভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি ব্যাহত না হয়। সেইসঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারী আমানতের

উপরে সুদের হার ১ শতাংশ হ্রাস করে ব্যাঙ্ক ঋণের খরচ কমানো হয়েছে। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল পাশাপাশি আর্থিক নীতির সংযোজন যার মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সুদের হারে পারস্পরিক ঘটিয়েছেন। গতবারের সঙ্গে এবারের বাজেটে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা এই যে, পূর্বে বড়াসে ঘাটতির উপরে কতকগুলি ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শিথিল করে সকল বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল। উন্নয়নী খাতে ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও মূল্যস্ফীতির দরুণ প্রকৃত প্রস্তাবে তা ১৫ শতাংশের বেশি হয়নি। এবারে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল মূল্যস্তরের জন্য উন্নয়নব্যয়ের কার্যকারিতা বাড়বে আশা করা যায়। তবে চলতি বিনিয়োগের উপরে করের চাপ দেওয়ার আশা করা হয়েছিল তা ঘটেনি।

এবারের বাজেটে পূর্বঘোষিত শিল্পনীতির মতই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পকে। সেইজন্যই বোধকরি এই খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ও অনেকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাসুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আজ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে, ওয়াঙ্ চমিটির রিপোর্ট থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অবধি—সরকারী ও বেসরকারী মহলে গড়পড়তা কৃষকদের উপরে কর ধার্য করে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের প্রয়োজনীয়তার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি পর পর দুই বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষাতেও এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোন নতুন করের প্রস্তাব না আনায় তা সকলকেই বিস্মিত করেছে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে অর্থনীতিতে যারাই সুযোগ বাড় করবে তারাই এর বদলে কিছু না কিছু প্রতিদান দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কতকগুলি ভরতুকির হেরফের ঘটানো ছাড়া কৃষি খাতে সম্পদ আহরণের জন্য কোন চেষ্টাই করা হয়নি।

আধিক সমীক্ষায় বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কৃষি, সার ও খাদ্যভর্তুকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় প্রদত্ত ভরতুকি স্থগিত করলে এবং সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলি থেকে উদ্বৃত্ত আহরণ করতে পারলে সমস্যার তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কিন্তু এবারের বাজেটে সে বিষয়ের সামান্যই প্রতিফলন ঘটেছে। কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকি হ্রাসের ঘোষণা প্রাথমিক মাত্রায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। আর সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলিতে কীভাবে উদ্বৃত্ত আহরণ করা হবে বা রুগ্ন শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন কীভাবে হবে তারও কোন আভাস মেলেনি। মনে হয় এখানে কোথাও একটা গলদ রয়ে যাচ্ছে। কারণ অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশগুলিকে সবল করে তোলবার জন্য অনাবশ্যক ব্যয়ভার হ্রাসিত বহুলাংশে বাজেটেই থাকা দরকার। কিন্তু যেখানে অর্থমন্ত্রী নানা দিক থেকে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দিগন্তের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে শিল্পের উন্নতির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো হবে এই আশা বোধহয় সকলেই করেছিলেন। এবারের বাজেটপ্রস্তাবগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ-কারণ পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অর্থমন্ত্রী সমগ্র বৈষয়িক কর্মকাণ্ডকে উন্নয়নের সু-উচ্চ পরিধির পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছেন। সেজন্যই বাজেটে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পে, উন্নয়নী ব্যয়বরাদ্দে, এবং শিল্পে বাড়তি অর্থ যোগানের (আমদানির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে) ক্ষেত্রে তিনি এক ঝুঁকি নিয়েছেন। কিন্তু এই ঝুঁকি অনেক অনিশ্চয়তার পথে অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে প্রবাহিত করবে। কারণ মূল্য সম্প্রসারণের পরিমাণ ১৯৭৬-৭৭-এর ২০ শতাংশ থেকে কমে শিল্পে বর্তমান বছরে ৮.৪ শতাংশে এসেছে। কিন্তু মূল্যস্তর আপাতভাবে স্থির থাকলেও বিভিন্নশিল্পে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা নিঃসন্দেহে বর্তমান। এমতাবস্থায় ব্যাপকহারে উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব যে মূল্য স্তরের ঊর্ধ্বগতি ত্বরান্বিত করবেনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া খুবই কঠিন। তবে কোনক্রমেই তা সরকার ঘোষিত ১ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকবে না। সুতরাং এই সমস্যার জন্য চাই আরও উৎপাদন ও আরও বেশি বিনিয়োগ। উৎপাদন উন্নত গ্রামে ও শহরে বাড়ানো দরকার এর এজন্যই প্রয়োজন চলতি স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পগুলি আগে হাতে নেওয়া। তবে মনে রাখা দরকার যে গ্রামীণ বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কোনটিই নিরবচ্ছিন্ন নয় বা একক নয়। একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে প্রত্যক্ষ করের চাপ থেকে যে রেহাই দিয়েছে তা যদি পরোক্ষ করজনিত মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা ব্যাহত না হয় তাহলে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, অর্থমন্ত্রীর চিন্তাধারা অবশ্যই একক, অনন্য ও প্রশংসার যোগ্য।

আগামী সংখ্যায়

পল্লী উন্নয়নে পঞ্চায়েত
অসিত কুমার বসু

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির দুইদিক
শিশিরকুমার রায়

ছাপ
অনিল কুমার গঙ্গুই

কলকাতা বইমেলা
সুলোচনা দত্ত

সূর্য থেকে শক্তি
অলোক সেন

কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন করের বোঝা

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আগামী বিত্তবর্ষের (১৯৭৮-৭৯) যাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। সরকারী ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে দেশের কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন করে প্রাণসঞ্চার করাই এই নূতন বাজেট প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের সব রকম খাতের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১৮,৮১৭ কোটি টাকা করা হবে, যেখানে তার পূর্ব্ববর্তী বৎসরে খাত হয়েছে আনুমানিক ১৬,৩৪৪ কোটি টাকা। বাড়তি এই ২,৩৭৩ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আশা করেন যে প্রচলিত কর-ব্যবস্থা থেকে ৬৮৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগৃহীত হবে এবং সরকারী ঋণ হিসাবেও অতিরিক্ত ১৬৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। তাহলেও নির্দ্ধারিত ব্যয় মেটানো সম্ভব হচ্ছে না বলে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন নূতন কর প্রবর্ত্তন করে কেন্দ্রীয় কোষাগারে ৩২১ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হোক। এই সব নূতন কর নিয়ে লোকসভায় আরও আলাপ-আলোচনা নিশ্চয়ই হবে এবং তার ফলে কর-প্রস্তাবের অল্প-স্বল্প বদল-বদল হতেও পারে। কিন্তু সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ বাড়াতে হবে এই যদি সর্ব্বজনগ্রাহ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে রাজস্বের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়াতে হবে—এ সম্বন্ধে দ্বিধা থাকলে চলবে না। বস্তুত নূতন নূতন করের মাধ্যমে ৩২১ কোটি টাকা সংগ্রহ করার পরও কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি পূর্ব্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৭৫ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। এ ছাড়া 'বাধ্যতামূলক জমা' প্রকল্পে জমার হার বাড়িয়ে দিয়ে অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

নূতন কর চাপাবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ করবেন ৩২১ কোটি টাকারও বেশী, কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে কিছু কিছু কর কমিয়ে দেওয়াতে এবং রাজস্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ রাজ্য-সরকারগুলির প্রাপ্য হওয়ায় শুধু কেন্দ্রীয় কোষাগারের নীট বাড়তি রাজস্ব দাঁড়াবে ৩২১ কোটি টাকা। প্রধানতঃ যে করটিকে তুলে দেওয়াতে নীট রাজস্ব বোঝা আমাদের তুলনায় কম হচ্ছে তা হল ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত সুদের উপর কর। এই কর তুলে নেবার ফলে সরকারী রাজস্বের ক্ষতি হবে প্রায় ১০৮ কোটি টাকা, তবে রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করেও সরকার এই কর উঠিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্ক যাতে আরও কমসুদে ঋণ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ক্ষতি পূরণ করার জন্য নূতন করের চাপ অবশ্য অপেক্ষাকৃত পরিমাণে বাড়ল।

নূতন কর থেকে প্রত্যাশিত রাজস্বের পরিমাণ ৫২৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪৯৯ কোটি টাকাই আসবে অপ্রত্যক্ষ কর থেকে, যার ফলে বহু বিভিন্ন ধরণের জিনিস-পত্রের দাম বাড়বে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। দেশের শিল্পে ও পরিবহন-ব্যবস্থায় কয়লা এবং বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। এখান এই উভয় দিক থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদনের খরচার বাড়িয়ে দিয়ে ক্রেতাসাধারণের কষের বোঝা বাড়াতে যাচ্ছেন। তবে আমদানী করা যন্ত্রপাতির উপর কম হারের কর ধার্য্য করায় কোনো কোনো শিল্পে উৎপাদনের খরচ যে কমবে না তা নয়। এ ছাড়া সাধারণভাবে কুটীরশিল্পে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোদ্যোগকে কর সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়াতে এই ধরণের ক্ষুদ্রশিল্পে প্রস্তুত জিনিসগুলির পক্ষে ক্রেতার সমর্থন লাভ সহজতর হবে বলে মনে হয়। কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত বিদ্যুতের খেলাপ করের চাপ থাকছে না এবং প্রধানতঃ ছোট ছোট কাজে ব্যবহার্য্য শক্তি-চালিত পাম্পের খেলাতেও শুল্ক প্রত্যাহার করে দেওয়া হচ্ছে। বাজেটে একদিকে কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে জমির মালিক যাতে নিজের উদ্যোগে সেচের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে পারেন তারও পথ খুলে দেওয়া হয়েছে।

কয়লা এবং বিদ্যুৎ ছাড়া অন্যান্য জিনিসের উপরও অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এই কারণেও সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়বার আশঙ্কা রয়েছে। তবে এই সব জিনিসপত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় উষধ, কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য, কৃষিকার্য্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উষধ ইত্যাদিকে করের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনের জিনিসের দামের উপর এই নূতন কর ধার্য্যের অবাঞ্ছনীয় প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না। প্রধানতঃ বৃহদাকার শিল্পে উৎপন্ন জিনিসপত্রের দামই-এর ফলে ঊর্দ্ধমুখী হবে।

প্রত্যক্ষ করের ব্যাপারে খুব বড় রকমের পরিবর্তন কিছু করা হয় নি। আয়করের নিয়ম-কানুন প্রায় আগের মতই থাকবে, কেবল কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় দেবার নিয়ম-কানুন কিছুটা বদলে যাবে। এই ধরণের অদল-বদলের মধ্যে দুটি প্রস্তাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। প্রথমত, সঞ্চয় এবং শিল্পক্ষেত্রে লগ্নী বাড়াবার জন্য বিশেষ ছাড় দেবার ব্যবস্থা, এবং দ্বিতীয়ত, অযথা প্রচার ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর কমাবার প্রচেষ্টায় এই ধরণের খরচের উপর ছাড় দেবার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া। কোনো আয়কর-দাতা যদি নূতন শিল্পস্থাপন প্রভৃতিকারক কোম্পানীর শেয়ারে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত লগ্নী করেন, তবে এই লগ্নীকৃত অর্থের ৫০ শতাংশকে তার করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। এই প্রস্তাবে নূতন শিল্প-সংগঠনকে

উৎসাহ দেবার সাধু সংকল্প সূচিত হচ্ছে। তবে এর ফলাফল নির্ভর করবে নূতন শিল্পোদ্যোগের আকর্ষণে পেবার যাঁরা কিনবেন তাঁরা কতটা আকৃষ্ট হবেন তার উপর। শিল্পে মন্দার অবস্থা চলতে থাকলে শুধু আয়করের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে কেউ আনকোরা নূতন কোম্পানীর শেয়ার কিনতে আগ্রহী হবে বলে মনে হয় না।

বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের উপর ব্যয়ের পরিমাণ কম রাখার উদ্দেশ্যে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব করেছেন যে লাভের অঙ্ক ঘরবার বেলায় এই ধরণের ব্যয় পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হবে না। প্রচারের প্রকৃত ব্যয়ের মাত্রা যদি প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ½ ভাগের বেশী হয়, তবে ছাড় থেকে ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ বাদ পড়বে। যদি ঐ ব্যয়ের মাত্রা শতকরা ½ থেকে 1 ভাগের মধ্যে থাকে তবে শতকরা ১২½ ভাগ এবং শতকরা ½ এর চেয়েও কম হলে মোট ব্যয়ের শতকরা ১০ ভাগ ছাড় পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অবশ্য এই ধরণের ব্যয়ের পরিমাণ যদি বৎসরে কিন হাজার টাকার বেশী না হয়, তবে ব্যয়ের সবটাকেই ছাড় দেওয়া হবে। এ ছাড়া নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রথম তিন বৎসরের জন্য এই ধরণের ব্যয়ের উপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপিত হবে না। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচার-ব্যয়ের আড়ম্বর যে কতটা বেড়ে গেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এই ধরণের কর ব্যবস্থা থেকে প্রত্যাশিত রাজস্বের অঙ্ক থেকে। সরকারী হিসাবে বলা হয়েছে, এই বিধি-নিষেধ আরোপ করার ফলে সরকার বাড়তি রাজস্ব পাবেন প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

এই সব পরিবর্তনের ফলে যে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগৃহীত হবে তা থেকে রাজ্য সরকারসমূহ পাবেন ১৫.৫ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় কোষে থাকবে ৪২৯ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যয়ের আদায়ের উপর কর প্রত্যাহার করে নেওয়াতে কেন্দ্রীয় রাজস্বের ১০৮ কোটি টাকা ক্ষতি হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করবার জন্য হাতে পাবেন ৩২১ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার আরও ২৫ কোটি টাকা পাবার আশা করছেন বাধ্যতামূলক জমার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে। যাদের করযোগ্য আয় বার্ষিক ১৫০০০ টাকার উপরে তাদের বাধ্যতামূলক জমা রাখার ব্যবস্থা তিন বৎসর আগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। এবার জমা রাখার হার অর্থের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ফলে একদিকে এই শ্রেণীর লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমবে এবং এদের হাত থেকে ২৫ কোটি টাকা নিয়ে সরকার ব্যয়-বরাদ্দ বাড়াবেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই ধরণের বাধ্যতামূলক জমা সঞ্চয়কে বাড়িয়ে তোলে, কার্যতঃ এর বিপরীত হবার আশঙ্কাটাই কিন্তু বেশী। এই সামান্য পরিমাণ টাকার জন্য বাধ্যবাধকতার পথ অনুসরণ না করে সরকার যদি সরাসরি ঋণপত্র বিক্রয় করে টাকা তুলতেন, কিংবা প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার হেরফের করেও এই টাকা ওঠাতেন, তবে কোনো ক্ষতি হ'ত বলে মনে হয় না। এই বাধ্যতামূলক জমার ধারণা উদ্ভিয়ে দেবার সংকল্প নূতন কেন্দ্রীয় সরকার একবার প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংকল্প পরিবর্তিত হ'ল কেন, তার কোনো কারণ বাজেটে তুলে ধরা হয় নি।

ঘাটতি বাজেট, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

স্বর্ণ-সঞ্চয়ের যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে কিনা, বিশেষত যখন কালো বাজারের দামের অনেকটাই সোনাতে ধরে রাখা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সোনা বিক্রী করে ঘাটতি পূরণ বা মুদ্রা-সঙ্কোচন করা কতদূর পর্যন্ত সম্ভব হবে? যদি এবছরে সরকারি ভাণ্ডারের সোনা অনেকটাই বিক্রী করে ফেলা হয়, তাহলে আর কখনো এই ধরণের উপায় অবলম্বন করা যাবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি প্রশমনের জন্য সরকার সোনা বিক্রী করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হয়। মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণগুলি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সোনা বিক্রী করে সমস্যার সমাধান হবে না। আর যদি মূল কারণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহলে বাজেটে কিছুটা ঘাটতি থাকলেও ক্ষতি হবে না।

ঘাটতি বাজেট, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে গিয়ে যদি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কমাতে হয় তাহলে তার চেয়ে আশঙ্কাজনক আর কিছু হতে পারে না। অতি-উন্নত কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে আজকাল মুদ্রাস্ফীতি কমাতে গিয়ে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের বেকার-সমস্যা ইত্যাদির স্বরূপ অন্য ধরণের। কিন্তু এটা জেনে নেওয়া ভাল যে যদি সত্যিকারের উন্নয়ন আনবার মত বিনিয়োগের ব্যবস্থা আমাদের পরিকল্পনাতে থাকে এবং যদি সেই উন্নয়নের সুফল দরিদ্রতম স্তরে বিস্তৃত করে দেবার ব্যবস্থাও থাকে, তাহলে কিছুটা মুদ্রা-সম্প্রসারণ ও মূল্যবৃদ্ধিতে আমাদের উপকারই হবে। সব দিকেই 'অত্যন্ত'-ই গর্হিত। মূল্যবৃদ্ধির চাপ যাতে এই 'অত্যন্ত' স্তরে গিয়ে না পৌঁছয়, তিন চার বছর আগে যে অবস্থা ছিল তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে সম্বন্ধে সজাগ থাকাই সরকারি পরিকল্পনা, আয়-ব্যয় নীতি ও অন্য সব ধরণের কর্মনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়ে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কমিয়ে দিয়ে বাজেটে ভারসাম্য আনা যায় এবং জিনিস-পত্রের দামও কমানো যায়। কিন্তু সেটা হবে রোগীকে মৃতকল্প করে তার রোগ নিরাময় করার মত।

১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে এমন কিছু নেই যা নিয়ে আমরা হৈচৈ করতে পারি; সরকারের সোনা বিক্রীর প্রস্তাব বাদ দিলে এই বাজেটটিকে আমরা গতানুগতিক বাজেট বলতে পারি। তবে এই বাজেটে ডাল-ভাত দুটিই তিনিসই আছে। প্রত্যক্ষ করের কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রচুর পরিমাণে পরোক্ষ কর বাড়িয়ে ৫৪১.৫ কোটি টাকার রাজস্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেটে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার বিপক্ষে অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৮৯ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার বিপক্ষে অতিরিক্ত অর্থসংস্থান করেননি, এবং রাজ্য সরকারগুলিকেও অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন; তার ফলে ১৯৭৭-৭৮ সালের প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৭৫ কোটি টাকা। ১৯৭৮-৭৯

সোনা বিক্রীর ব্যবস্থা বাদ দিলে এবারের বাজেট গতানুগতিক

সুব্রত গুপ্ত

সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে কেন্দ্রের মোট আয় হবে ১৭,৫২১ কোটি টাকা; খাতের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৮,৪১৭ কোটি টাকা। বাজেটে নতুন করের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃত পাওনা দাঁড়াবে মোট ৩৪৬ কোটি টাকা। বাজেটে মোট ১৩৯৬ কোটি টাকার যে ঘাটতি থাকবে তা থেকে ৩৪৬ কোটি টাকা বাদ দিলে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ হবে ১০৫০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, নতুন কর থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হবে ৫৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; এই অর্থের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য দাঁড়াবে ৪৯৯ কোটি টাকা। এই ৪৯৯ কোটি টাকা থেকে ১৫৩ কোটি টাকা বাদ দিতে হবে যাদ্য ভুর্তুকি সম্পর্কে কর রেয়াই খাতে। এভাবে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃত পাওনা দাঁড়াবে ৩৪৬ কোটি টাকা।

যেভাবে আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন বহুপূর্বে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন থেকেই আমরা জানি যে তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় ঘাটতি বাজেটের বিরোধী। অথচ এই বছর বাজেট প্রস্তাবে যে ঘাটতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের মনে মুদ্রাস্ফীতির আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। চাল-ডাল-তেল-নুন-কাপড়-কয়লা-লোহা-সিমেন্ট-ওষুধ-পত্র-বিদ্যুৎ-পরিবহণ-ডাক-তার-টেলিফোন-রেল-বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি-বিমান-জাহাজ-সিনেমা-থিয়েটার-খেলাধুলো-বিনোদন-শিক্ষা-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-সেচ-শিল্প-খনিজ-পরিবেশ-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র-বেতার-টেলিভিশন-চলচ্চিত্র-নাটক-নৃত্য-গীত-বাদ্য-চারুকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্য-ভাষা-ব্যাকরণ-অভিধান-ইতিহাস-ভূগোল-জ্যোতিষ-পদার্থবিদ্যা-রসায়ন-প্রাণিবিদ্যা-উদ্ভিদবিদ্যা-ভূতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-দর্শন-ধর্ম-ধর্মতত্ত্ব-ধর্মীয় অনুষ্ঠান-ধর্মীয় উৎসব-ধর্মীয় সংগঠন-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-ধর্মীয় নেতা-ধর্মীয় গুরু-ধর্মীয় সাধু-ধর্মীয় সন্ন্যাসী-ধর্মীয় ভিক্ষু-ধর্মীয় ভিক্ষুণী-ধর্মীয় শ্রমণ-ধর্মীয় শ্রমণা-ধর্মীয় উপাসক-ধর্মীয় উপাসিকা-ধর্মীয় পুরোহিত-ধর্মীয় পুরোহিতা-ধর্মীয় যাজক-ধর্মীয় যাজিকা-ধর্মীয় ঋত্বিক-ধর্মীয় ঋত্বিকা-ধর্মীয় ঋষি-ধর্মীয় ঋষিকা-ধর্মীয় মুনি-ধর্মীয় মুনিকা-ধর্মীয় তপস্বী-ধর্মীয় তপস্বিনী-ধর্মীয় যোগী-ধর্মীয় যোগিনী-ধর্মীয় সাধক-ধর্মীয় সাধিকা-ধর্মীয় সিদ্ধ-ধর্মীয় সিদ্ধা-ধর্মীয় মহাপুরুষ-ধর্মীয় মহাপুরুষা-ধর্মীয় অবতার-ধর্মীয় অবতারিণী-ধর্মীয় দেবতা-ধর্মীয় দেবী-ধর্মীয় ঈশ্বর-ধর্মীয় ঈশ্বরী-ধর্মীয় ব্রহ্ম-ধর্মীয় ব্রহ্মা-ধর্মীয় বিষ্ণু-ধর্মীয় শিব-ধর্মীয় দুর্গা-ধর্মীয় কালী-ধর্মীয় সরস্বতী-ধর্মীয় লক্ষ্মী-ধর্মীয় গণেশ-ধর্মীয় কার্তিক-ধর্মীয় হনুমান-ধর্মীয় নারদ

নতুন বাজেট

লগ্নীকারদের প্রতি একটি পরামর্শ

আজ ইউনিট আপনাকে সর্বোত্তম লগ্নীর সুযোগ দিচ্ছে

এমন কি ১২ মাসের লগ্নীর জন্য গত বছর আমরা ৯% আকর্ষণীয় লভ্যাংশ দিয়েছিলাম। আর প্রতি বছর লভ্যাংশ বেড়ে চলেছে: ৭৪-৭৫-এ ৮.৬%, ৭৫-৭৬-এ ৮.৭৫%। ইউনিট থেকে যে অপূর্ব সুবিধা পাচ্ছেন, অন্য কোন লগ্নী আজ আর তার সমকক্ষ হ'তে পারে না।

★ সহজে ভাঙ্গানো যায়

যে কোন সময় আপনি ইউনিট ভাঙ্গাতে পারেন। হস্তান্তরও করা যায়।

★ করের উদার সুবিধা

সাধারণ সীমার ওপরে আপনি আয় ও সম্পদ করে বিশেষ রেহাই পাবেন। যদি ৬ মাস আগে ইউনিটে আপনার বিক্রয়মূল্য ঠিক করা থাকে, তবে আপনি মূলধনী আয়করও এড়াতে পারেন। আবাসিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উৎসস্থলে কোন কর কাটা হয় না।

★ মূলধনের নিরাপত্তা

আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, আপনার লগ্নী সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের নিকটতম অফিসে শীঘ্র যোগাযোগ করুন:

UNIT TRUST OF INDIA

8, কেরানি প্লেস
কলকাতা-৭০০০০১. ফোন: ২৩-৯৩৯১. ২৩-১১৩৮. ২৩-৮৮১৮

বর্ধমান, জামসেদপুর এবং রাঁচীতে মূল্য প্রতিনিধিরা আছেন।

Advt. S-C/UTI 3/78 Ben

পরিকল্পনাখাতে মোট খাতের পরিমাণ প্রায় ১৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এই বর্ধিত বিনিয়োগের একটি বৃহৎ অংশ যাচ্ছে কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে। পরিকল্পনাখাতে ঋণ-বরাদ্দ ১৭ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া যে বাজেট ঘাটতির অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে, ১০৫০ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি সাধারণ মানুষের মনে মুদ্রাস্ফীতির আতঙ্ক বাড়িয়ে দেবে। তা ছাড়া বাজার থেকে ১৫০ কোটি টাকার ঋণ তোলা হবে বলেও কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন। বাজার থেকে ঋণ তোলার অর্থ হল ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সরকারকে আরও ঋণ দেওয়া। তার ফলেও মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। পরিকল্পনাখাতে কৃষি, সেচ ও বিদ্যুতের জন্য বরাদ্দ যেমন বাড়ানো হয়েছে, তেমনি কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য পরোক্ষ করের বোঝা কমানোর ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়েছে। কৃষির জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পের উপর কোন কর থাকবে না। ১৫ লক্ষ টাকার কম বিনিয়োগকারী ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনের প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকা দামের জিনিসপত্রের উপর কোন উৎপাদন শুল্ক থাকবে না। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাতে এই দুটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া উচিত। পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতের মধ্যে প্রধান হল প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়। প্রতিরক্ষা খাতে মোট খাতের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে ২৭৫২ কোটি টাকা থেকে ২৯৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত।

১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে সামগ্রিকভাবে রাজস্বের পরিমাণ ও খাতের পরিমাণ বাড়লেও কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজস্বের ক্ষতি হবে। যেমন, বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ব্যয় বাবদ কড়াকড়ির ফলে কোম্পানি কর থেকে বর্ধিত ৩১ কোটি টাকার আয় বাড়বে, তেমনি নতুন কোম্পানির উৎপাদন শেয়ারের নতুন ব্যাপারে কিছু ছাড় দেওয়ায় ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব কমবে। কেন্দ্রীয় সরকার চান যে রাজ্য সরকারগুলি চুঙ্গিকর তুলে দিন; চুঙ্গিকর বাবদ রাজস্ব আদায় হয় ২৫০ কোটি টাকা। এ ব্যাপারে যদি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। স্বল্প আয় ও মাঝারি আয়ের লোকেদের গৃহনির্মাণে উৎসাহ দেওয়ার জন্যও কর ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ব্যক্তিগত আয় কর, সম্পদ কর, দান কর, মূলধন মুনাফা কর, প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনের কথা বলেননি। কালো টাকার প্রচলন বন্ধ করার জন্য সরকার কিছুদিন আগে বেশী টাকার নোট বাতিল করেছেন; কিন্তু প্রত্যক্ষ করের কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে কি কালো টাকার চাপ কিছু প্রশমিত করা যেত না? পরোক্ষ করের বোঝা বাড়িয়ে দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ; ধনী ও গরীব উভয়কেই এক্ষেত্রে বাড়তি করের বোঝা বহন করতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনলে তা আমাদের গরীব শ্রেণীকে প্রভাবিত করে না। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও সরকার বা কমিটির (Jha Committee) সুপারিশগুলি বিবেচনা করেন নি। আগার ঘাটতির হিসাবে বর্ধিত ১০৫০ কোটি টাকা যোগ হয়েছে, তার সঙ্গে আরও ৮০ কোটি টাকার বর্ধিত ব্যয় যোগ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা এবং চিনি শিল্পকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটকোষ থেকে আরও ৮০ কোটি টাকা বেশী খরচ হবে।

সোনা বিক্রীর ব্যবস্থা

১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল সরকারের আন্তর্জাতিক দরে সোনা বিক্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সোনার অলঙ্কার বিদেশে যাতে রপ্তানি করা যায় তার ব্যবস্থা করা। ভারত সরকার তাঁর নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে সোনা বিক্রী করবেন এবং সোনার অলঙ্কার রপ্তানির ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা চালু হবে। সোনার অলঙ্কার রপ্তানি সুবিধাজনক করে তোলার জন্য প্রয়োজন হলে সোনা আমদানি করা হবে, অথবা আন্তর্জাতিক দরে সরকারের ভাণ্ডার থেকে সোনা বিক্রী করা হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের সোনা বিক্রীর ফলে বাজেটের

> সোনা বিক্রী করে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ কমানোর পথে বেশী দূর যাওয়া সম্ভব হবে না। বাজেটে ঘাটতির চাপ কমাবার জন্য যে পরিমাণ সোনা বিক্রী করা দরকার তা করা হলে অন্য কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

১০৫০ কোটি টাকার ঘাটতি কিছু কমবে। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে ২ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রাম সোনা ছিল এবং তার সরকারী মূল্য ছিল প্রায় ১২৩ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক মূল্য ভাণ্ডারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি দশগ্রাম সোনার দাম মাত্র ৮৪ টাকা ৩১ পয়সা। অথচ ভারতে বাজার দর অনুযায়ী প্রতি দশ গ্রাম সোনার দাম ৬৫০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা। লন্ডনের সোনার বাজারে দশ গ্রাম সোনার আন্তর্জাতিক দাম প্রায় ৫২০ টাকা। ভারত সরকার কী দরে সোনা বিক্রী করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যে সোনা মজুত আছে তা বিক্রী করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের হাতে ৫০০ কোটি টাকা দামের সোনা আছে, এবং এই সোনার উৎস হল শুল্ক বিভাগ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত চোরা চালান এবং কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদন। সরকার যদি সোনা বিক্রী করেন তবে

এই বস্তুত ভাণ্ডার থেকেই তা করা হবে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ৬ক বিভাগের ছুতায় চোরা এবং চোরাই সোনা বাজেয়াপ্ত করা সত্ত্বেও সোনা চোরাইচালান এখনও চলছে। এই চোরা চালানের কারণ হল, আন্তর্জাতিক দরের সঙ্গে ভারতীয় বাজার দরের তারতম্য। সরকার যদি সোনা বিক্রীর জন্য নতুন দাম নির্ধারণ করেন তবে এই চোরাচালান বন্ধ হতে পারে। সোনা বিক্রী করে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ কমানোর পথে বেশীদূর যাওয়া সম্ভব হবে না। বাজেটে ঘাটতির চাপ কমাবার জন্য যে পরিমাণ সোনা বিক্রী করা সরকার স্থির করে তা করা হলে অন্য কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। একসঙ্গে যদি খুব বেশী পরিমাণ সোনা সরকার বিক্রী করে ফেলেন, তবে ভবিষ্যতে এই পথ আবার অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। যাঁরা কালোবাজারে অধিক লাভ করে রাখতে চান তাঁদের অন্যতম অবলম্বন হল সোনা কিনে রাখা। আবার যারা কালো বাজারে লাভ করেন তাঁরাও অনেকেই উপার্জিত অর্থ সোনার মতো করে রাখতে চান। এই প্রবণতাকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হবে না। সোনার অলঙ্কার বিদেশে রপ্তানি করার পরিকল্পনাও যথেষ্ট অভিনব। ভারতের স্বর্ণশিল্পীরা দুক্ষ কারিগরের সাহায্যে সোনার অলঙ্কার আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।—বিদেশেও সেগুলির জন্য যথেষ্ট চাহিদা থাকতে পারে। কিন্তু বিদেশের এই চাহিদা যে অনেকদিন ধরে টিকে থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফ্যাশনের যেমন পরিবর্তন হয়, রুচিরও তেমনি পরিবর্তন হয়। সোনার অলঙ্কার রপ্তানি করার জন্য সরকার হলে বিদেশ থেকে সোনা আমদানি করারও ব্যবস্থা থাকবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। স্বর্ণশিল্পীদের কাছে এটা খুবই শুভ সংবাদ। কিন্তু এবিষয়ে খুব সাবধানে নীতি নির্ধারণ করা উচিত। ঘাটতি বাজেটের সৃষ্ট সমস্যা দূর করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল উৎপাদন বৃদ্ধি। সোনা বিক্রী করে বাজেটের ঘাটতি দূর করার নীতি সরকারকে বেশীদূর নিয়ে যেতে পারে না; এ ব্যবস্থার ফলও খুব সাময়িক। মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণগুলি খুঁজে বের করে সেগুলির প্রতিবিধান করা বর্তমানে বেশী জরুরী। আজ সোনার অলঙ্কার রপ্তানি করে যদি ভবিষ্যতে তা বন্ধ করে দিতে হয় তবে স্বর্ণশিল্পীদের দুর্দশা আরও বাড়বে; সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সরকারের এবিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় বাজেট : ঘাটতি কম ৫৪৬ কোটি টাকা

১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

হয়েছে। ফলে রাজস্বের ঘাটতি হবে ১ কোটি টাকা।

দেশীয় শিল্প রক্ষা করবার জন্য পলিয়েস্টার সুতার ওপর আমদানী শুল্ক মূল্যানুপাতে ১২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এতে সরকারের আয় বাড়বে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল বলেন চুনিকর তুলে দেবার জন্য কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলিকে উপযুক্ত আইন প্রণয়নে অনুরোধ করবে।

এইসব কর প্রস্তাবের থেকে, কেন্দ্রীয় খাতে প্রকৃত নীট পাওনা ৩৪৬ কোটি টাকা হবে। কিন্তু অন্যদিকে ঘাটতি থাকবে ১৫০০ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী জানান, সরকারি ভাণ্ডার থেকে আন্তর্জাতিক দরে সোনা বিক্রয় করে এই ঘাটতি কমিয়ে আনা যাবে। সেইসঙ্গে বিদেশে সোনার গহনা রপ্তানীর ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাজেটের ঘাটতি হিসেবে টাকার যোগান করাবার জন্য আমাদের সঞ্চিত সোনার একাংশ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত হবে। একই যুক্তিতে সরকার পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বরাদ্দের দরুণ মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতারোধে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ব্যবহার করার ব্যাপারে সরকার আগ্রহী। শ্রী প্যাটেল এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন, প্রচুর খাদ্য শস্য ও আমাদের অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানীর ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় টাকার যোগান বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়বে না।

টাকা কিভাবে আসে যায়

আগামী আর্থিক বছরে প্রতি এক টাকার মধ্যে সরকার উৎপাদন শুল্ক বাবদ আদায় করবেন ২২ পয়সা, শুল্ক বহির্ভূত রাজস্ব খাতে ১৪ পয়সা, ঋণ আদায় বাবদ ১৩ পয়সা, বাণিজ্য শুল্ক ১০ পয়সা, বাজার ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ১৩ পয়সা এবং অন্যান্য সূত্রে ৫ পয়সা। যৌথকর আদায় হবে ৮ পয়সা, বৈদেশিক ঋণ ৪ পয়সা, আয়কর ২ পয়সা ও অন্যান্য কর থেকে আদায় হবে ২ পয়সা। ৬ পয়সা ঘাটতি থাকবে।

এইভাবে আদায় করা এক টাকার মধ্যে পরিকল্পনা খাতে খরচ হবে ৪০ পয়সা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক খাতে খরচ ২০ পয়সা। প্রতিরক্ষা বাবদ ১৬ পয়সা, সুদ পরিশোধ ১১ পয়সা, অন্যান্য খরচ ৭ পয়সা। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারগুলিকে দেওয়া হবে ৬ পয়সা।

আপনার আয়কর কত হবে

শ্রীসংকর

জনতা সরকারের প্রথম বাজেটে আয়কর রেয়াতের সীমা ধরেছিল দশ হাজার টাকা। এবারের অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটেও তাই রয়েছে। বার্ষিক দশহাজার টাকার বেশী আয় না হলে আয়কর দিতে হচ্ছে না। দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলেও নানা রকম ছাড় আছে। যেমন বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের বেতনভুক কর্মচারীরা যাতায়াত, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ কুড়ি শতাংশ হারে ছাড় পাবেন (Standard Deduction)। আর বার্ষিক দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলে পরবর্তী বাপের আয়ের জন্য এটা হবে শতকরা দশভাগ। এই বাবদ যে রেয়াত পাওয়া যাবে তার সর্বোচ্চ পরিমাণ অবশ্য ৩৫০০ টাকা। এই ছাড় দেবার জন্য বাড়ী ভাড়া ভাতাকে বেতনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে না। মালিকপক্ষ যদি কোম্পানীর ভাড়া কর্মচারী বা অফিসারকে মোটরগাড়ী বা ড্রাইভার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেয় তাহলে সেই কর্মচারী বা অফিসার এই বাবদ এক হাজার টাকার বেশি রেয়াত পাবেন না।

বীমা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, জীবন-বীমা, ডাকঘরের দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা বা ইউনিট ট্রাস্টের জীবন-বীমার টাকা জমান তাদের জন্যও প্রথম পাঁচ হাজার টাকার ওপর কোন আয় কর দিতে হবে না। পূর্ববর্তী বাজেটে এর পরিমাণ ছিল চার হাজার টাকা। এক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত আয় থেকে এই টাকাটা বাদ দিয়ে বাকী টাকার উপর আয়কর ধার্য্য করা হবে। উল্লিখিত সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী পাঁচ হাজার টাকা থেকে ৫০ শতাংশ এবং তদতিরিক্ত টাকা থেকে ৪০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। এই বাবদ ছাড়যোগ্য সঞ্চয়ের সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়ে এবারের বাজেটে করা হয়েছে ত্রিশ হাজার টাকা। করদানে সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৬৯ শতাংশে। আয়করের হার এখনও ছয় শতরের রয়েছে :

১। আয়ের প্রথম আট হাজার টাকা পর্যন্ত

—কোন আয়কর দিতে হবেনা।

২। আয় যেখানে আট হাজার টাকার বেশি অথচ ১০,০০০ টাকার কম

—আট হাজার টাকার বেশি আয়ের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ।

৩। আয় যেখানে ১০,০০০ টাকার বেশি কিন্তু ২০,০০০ টাকার কম

—১০ হাজার পর্যন্ত ১০৫০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার জন্য শতকরা ২৮ ভাগ।

৪। আয় যেখানে ২০,০০০ টাকার বেশি কিন্তু ২৫,০০০ টাকার কম

—২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৩৯৫০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার উপরে শতকরা ২৫ ভাগ।

৫। আয় যেখানে ২৫,০০০ টাকার বেশি কিন্তু ৩০,০০০ টাকার কম

—২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ৫২০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার শতকরা ৩০ ভাগ।

৬। আয় যেখানে ৩০,০০০ টাকার বেশি কিন্তু ৫০,০০০ টাকার কম

—৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৬৭০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার শতকরা ৪০ ভাগ।

৭। আয় যেখানে ৫০,০০০ টাকার বেশি কিন্তু ৭০,০০০ টাকার কম

—৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১২,৭০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার শতকরা ৫০ ভাগ।

৮। আয় যেখানে ৭০,০০০ টাকার বেশি কিন্তু ১,০০,০০০ টাকার কম

—৭০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২২,৭০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার শতকরা ৫৫ ভাগ।

৯। আয় যেখানে একলক্ষ টাকার বেশি

—এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩৯,২০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার শতকরা ৬০ ভাগ।

তবে ১০,০০০ টাকা আয় পর্যন্ত কোন আয়কর দিতে হবে না। আয় যেখানে দশ হাজার টাকার বেশি কিন্তু ১০,৫৪০ টাকার কম সেখানে দশ হাজার টাকার পরবর্তী আয়ের জন্য করের হার শতকরা ১৭ ভাগের বেশী হবেনা।

করদাতা মনুষ্যেতর সত্তা আয়কর মাথা হবে তার উপরে শতকরা ১৫ ভাগ সারচার্জ দিতে হবে।

আয়করের হার তো ওপরে দেওয়া হল। এখন ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্যক্তি কতটা আয় করলে আয়করের আওতায় আসবেন এবারে একটি উদাহরণ দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করুন, মাসিক ১৫০ টাকার মূল বেতনের একজন কর্মচারীর বার্ষিক আয় নিম্নরূপ :—

বেতন	১৩,৮০০ টাকা
বাড়ীভাড়া ভাতা	১,৬২০ টাকা
শহর ক্ষতিপূরণ ভাতা	৬৪৮ টাকা
মাগ্গী ভাতা	৪,৩৩৬ টাকা
	১৭,৬০৪ টাকা

আয় দশ হাজারের বেশী হলেই আয়কর দিতে হবে কিন্তু এই উদাহরণের আয় ১৭,৬০৪ টাকা হলেও তিনি এক পয়সাও আয়কর না দিয়ে পারেন। তাকে অবশ্য সক্ষম করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক :—

মোট আয় ১৭,৬০৪ টাকা

৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

গার্ডেনরীচের প্রতিটি যন্ত্রপাতি আজ জাতীয় অগ্রগতি ও স্বয়ম্ভরতায় অবদান যোগাচ্ছে।

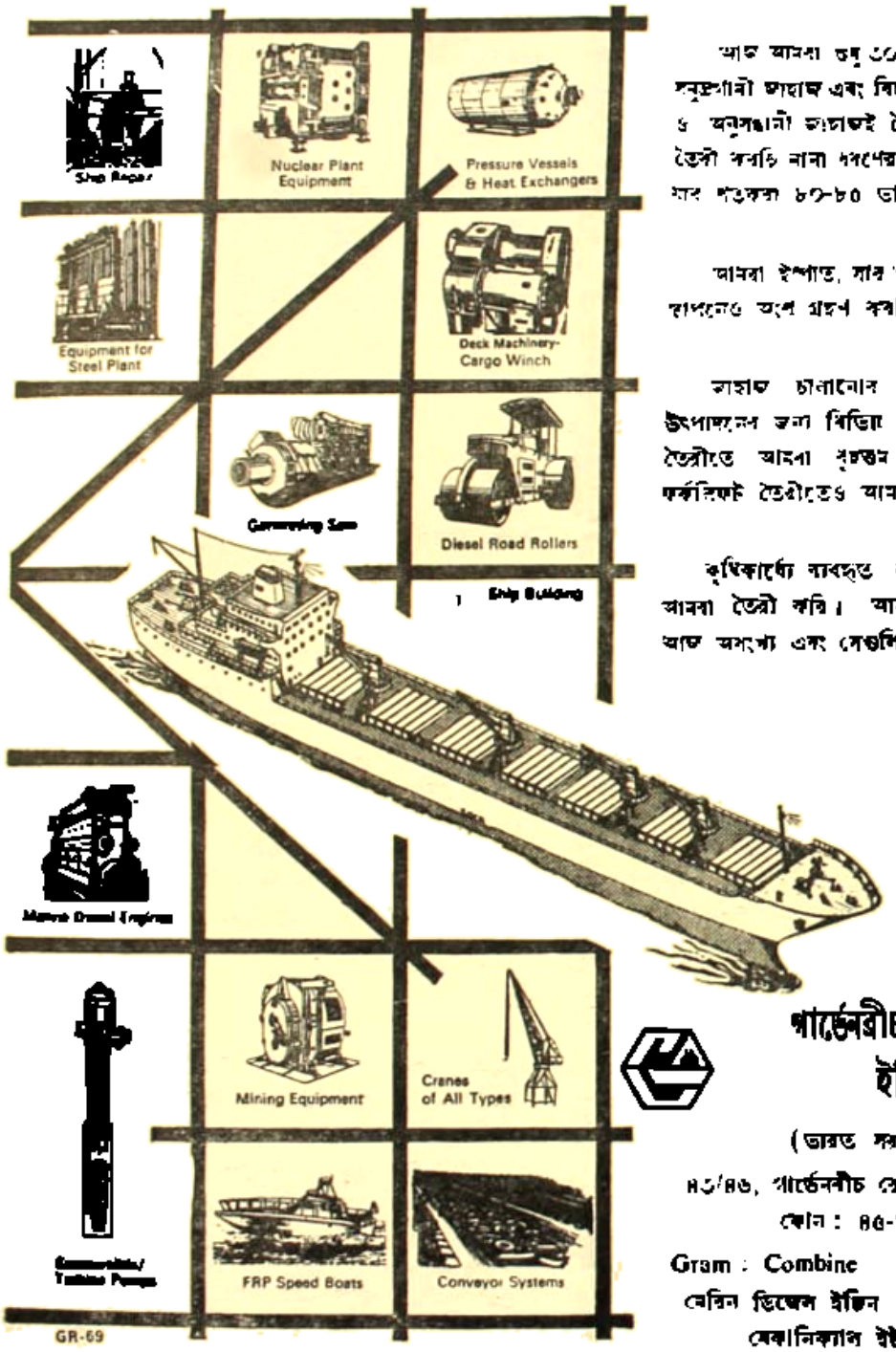

আজ আমরা শুধু ৩০,০০০ ডেড ওয়েট টনের সমুদ্রগামী জাহাজ এবং বিশেষ ধরণের ট্রলার, টাগ ও অনুসন্ধানী জাহাজই তৈরী করছি না আমরা তৈরী করছি নানা ধরণের জাহাজী সাজসরঞ্জাম— যার শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ দেশজ।

আমরা ইস্পাত, সার ও রাসায়নিক কারখানা বানানোতে অংশ গ্রহণ করছি।

জাহাজ চালানোর ইঞ্জিন ছাড়াও বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের ডিজেল ইঞ্জিন তৈরীতে আমরা সুদক্ষ। ক্রনডেরব, ক্রেন, ফর্কলিফট তৈরীতেও আমরা বিশেষ পারদর্শী।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নানা ধরণের পাম্পও আমরা তৈরী করি। আমাদের তৈরী যন্ত্রপাতি আজ অসংখ্য এবং সেগুলি গুণেও অতুলনীয়।

গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

৪৩/৪৬, গার্ডেনরীচ রোড, :: কলকাতা-৭০০০২৪

ফোন : ৪৫-১৭২১ (৭ লাইন)

Gram : Combine Telex : 021-7839 & 2283

মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন প্ল্যাণ্ট, খারোরা—রাঁচি (বিহার)

মেকানিক্যাল ইউনিট, নাগপুর (মহারাষ্ট্র)

রেল বাজেট এবারও উদ্বৃত্ত

ভাড়া বাড়েনি,যাত্রীদের বাড়তি সুবিধা

বিশেষ প্রতিনিধি

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সংসদে পেশ করা জনতা সরকারের দ্বিতীয় উদ্বৃত্ত রেল বাজেটে যাত্রীভাড়া ও মাশুল তো বাড়েই নি, বরং রেলযাত্রী ও কর্মীদের জন্য নতুন কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, ট্রেনে এক টাকায় 'জনতা খানা'র প্রবর্তন এবং রেল কর্মীদের জন্য কিছু সুবিধা।

১৯৭৮-৭৯ সালের রেল বাজেট পেশ করতে গিয়ে মন্ত্রিসভা রেলমন্ত্রী জানালেন, রেলের সমৃদ্ধিকে যাত্রী সাধারণ ও রেল কর্মী উভয়ের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া উচিত। অধ্যাপক মধু দণ্ডবতে জানান, পরস্বাপহরণ যাই হোক না কেন আগামী ১ এপ্রিল, ১৯৭৮ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের গিপাথ-চার্জ বাবদ মাত্র পাঁচ টাকা দিতে হবে।

১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে আনুমানিক রেলের আয় হবে ২,২২৫ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৮৮ কোটি টাকা বেশী। রেলের কাজকর্মের জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে ১৭৩১ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্বার্থে সুপার ফাষ্ট এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে সারচার্জের হার বাজেটে দেড়টাকা থেকে কমিয়ে এক টাকা করা হয়েছে। শুধুমাত্র সুপার ফাষ্ট বলে চিহ্নিত ট্রেনগুলিতে কোন সারচার্জ থাকবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসন ও শয়নযান থাকা আসন সংরক্ষণের মাশুলের হার বর্তমানের ৫০ পয়সা থেকে কমিয়ে ২৫ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে দিন কয়েকের রিজার্ভেশন এখান থেকে সারা বছরের জন্য চালু থাকবে।

আরামপ্রদ রেলভ্রমণ

দ্বিতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের স্বার্থে আলোচ্য বছরে সুপারফাষ্ট প্রতিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল কামরায় গদীর আসন থাকবে। আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রতিটি সুপারফাষ্ট রেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে থাকবে পাখি ও আরামপ্রদ ব্যবস্থা সম্বলিত দ্বিতীয় শ্রেণীর শি টানার কামরা, যেমনটি রয়েছে 'গীতাঞ্জলি' এক্সপ্রেসে। এরফলে বহু প্রথম শ্রেণীর যাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে আকৃষ্ট হবেন বলে রেলমন্ত্রী আশা করেন।

এরপর থেকে সমস্ত শ্রেণীর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরার সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না বলে রেলমন্ত্রী স্থির করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে, শীঘ্রই আরো পাঁচটি ট্রেনে নতুন ধরণের গতীবৃদ্ধ পবনযান কামরা চালু হবে এবং ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে অধিকাংশে দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে ঐ ধরণের কামরা সংযোজিত হবে। আলোচ্য বছরে এজন্য প্রায় ৪০০ নতুন কামরা তৈরী হবে। চলতি বছরে এপ্রিল থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি রুটে দ্বিতল বিশিষ্ট কামরাও চালু হবে যাবে।

অধ্যাপক দণ্ডবতে আরো জানান, প্রতিটি সুরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীবহন ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। এরফলে প্রতিটি ট্রেনে অতিরিক্ত ২০০ থেকে ৩০০ যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন।

এক টাকায় জনতা খানা

রেলে সস্তায় খানা পরিবেশনের জন্য যাত্রীদের দাবী মেনে নিয়ে রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সুরপাল্লার ট্রেনে এক টাকায় জনতা খানার প্যাকেট বিক্রি করা হবে। মেনুর বিভিন্ন অন্নের খাদ্যবস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিন ধরণের খাদ্যের ঐ প্যাকেট বিক্রি করা হবে। এছাড়া বর্তমান খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাও চালু থাকা হবে।

আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত দুর্নীতির মোকাবিলা করার জন্য রেলমন্ত্রী জানান, নীতিগতভাবে বড় শহরগুলির গুরুত্বপূর্ণ বুকিং অফিসগুলিতে শুধুমাত্র মহিলা রেলকর্মী নিয়োগের বুকিং ক্লার্ক ও তত্ত্বাবধায়ক রেল কর্মী নিয়োগ করা হবে। দুর্নীতি রোধের জন্য চারটি বড় শহরের জনসংরক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে কম্পিউটার চালু করার কথাও রেলমন্ত্রী চিন্তা করে দেখছেন বলে জানান।

এল হাজার নতুন পদ

ট্রেন চালনায় নিরাপত্তা বিধানের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও রেলমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, রেল চালনার জন্য পর্যাপ্ত-ভাবে সংখ্যায় এমন ১৫ হাজারটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে করে রেলকর্মীরা যথেষ্ট বিশ্রামের সুযোগ পান। তিনি বলেন যে, সম্প্রতি সংঘটিত কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনার নীতি চালু করার জন্য ২৭০০ অতিরিক্ত গার্ড নিয়োগ করা হচ্ছে।

রেলকর্মীদের বিভিন্নমুখী বেতনের ক্রমবিন্যাসগুলিতে এবার থেকে বেতনক্রম বাধা হবে বলে তিনি জানান। রেলের খরচেতে পদোন্নতক্রমে এটা করা হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেতনের কর্মীর প্রাথমিক বেতন বাড়ান করে থাকেন।

অধ্যাপক দণ্ডবতে মন্তব্য করেন, রেল-কর্মীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবারের বাজেট রচিত হয়েছে, যার ফলে রেলের বর্তমান সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকে সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ৫০০ টি পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার

সিদ্ধান্তও বেলমন্ত্রী ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর থেকে প্রথম শ্রেণীর অফিসার পদগুলিতে পদোন্নতির কোটা ৩৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে বাড়ানো হয়েছে এবং লোকো রানিং স্টাফ ও অন্যান্য রানিং স্টাফের কর্মীদের ওভার টাইমের পারিশ্রমিকও বাড়ানো হয়েছে। খাদ্য পরিবেশক বেসরকারি দীর্ঘদিনের দাবী মেনে নিয়ে তাদের পর্যায়ক্রমে নিয়মিত বেসরকারি করে দেওয়া হবে। বেলমন্ত্রী আরো জানান, নতুন পরপর সংকেত সরকারি নিয়ন্ত্রণে তুলে নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে বেসরকারি ইউনিটগুলি সমস্তরে সরবরাহ করা হবে এবং প্রতিটি ইউনিটকেই বাড়ি তৈরির মাপ অনুযায়ী সেলাই করা হবে। উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির ফলে ১৯৭৮-৭৯ সালে রেলের কাজকর্ম আরো ভালো হবে বলে বেলমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক দণ্ডবতে জানান, রেলের কাজকর্মে ক্রমাগত উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭৭-৭৮-এর মোট সংশোধিত আয়ের হিসেব ২১৩১ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। যাত্রীভাড়া ও মাশুলের ক্ষেত্রে বাজেটের হিসেব ছাড়িয়ে গেলেও রেলচালনায় সংশোধিত হিসেব, যা ধরা হয়েছে ১৬১১ কোটি টাকা, তা থেকে ৩৭ কোটি টাকার নীচে হবে। চলতি বছরের সাত মাসে রবিশস্যের মূল্য ভাড়া প্রদান ও ট্রেন চালনার আনুপাতিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মাশুলের পরিমাণ আরো বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ১৯৭৭-৭৮-এর উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৮৯.৩২ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। বাজেট নির্ধারিত ৩২.৫ কোটি টাকার চেয়ে উল্লিখিত উদ্বৃত্ত প্রায় ৫৭ কোটি টাকা বেশী।

১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট প্রসঙ্গে অধ্যাপক দণ্ডবতে বলেন, আলোচ্য বছরে মোট আয় ধরা হয়েছে ২২২০ কোটি টাকা, যা ১৯৭৭-৭৮ সালের সংশোধিত হিসেবের চেয়ে ৮৮ কোটি টাকা বেশী। আলোচ্য বছরে ২২.২ কোটি টন মাল পরিবহণ হবে যা চলতি বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২১.৪ কোটি টনের চেয়ে ৮০ লক্ষ টন বেশী। আর যাত্রীভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ ৫ শতাংশ বাড়বে আশা করা যাচ্ছে।

রেল ব্যবস্থা। চালু রাখার জন্য ধরা হয়েছে ১৭০১ কোটি টাকা—চলতি বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৯০ কোটি টাকা বেশী। মূল্যহ্রাস বাবদ সংরক্ষিত তহবিলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৪৫ কোটি টাকা—চলতি বছরের হিসেবের তুলনায় ৫ কোটি টাকা বেশী। পেনশন তহবিলেও বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের ৪০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৮-৭৯ সালে ৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

বেলমন্ত্রী বলেন, রেল চালনায় ব্যয়-বৃদ্ধি ও তহবিলগঠনে বাড়তি টাকা বরাদ্দের ফলে ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে মোট উদ্বৃত্তের হিসেব দাঁড়াবে ৬৫.৪৩ কোটি টাকা। এরফলে সাধারণ রাজস্বের ক্ষেত্রে রেলের ঋণের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাবে।

সামাজিক দায়দায়িত্ব বাবদ চলতি বছরে ধরা হয়েছে ১৭০ কোটি টাকা যার মধ্যে ৬৯ কোটি টাকা রয়েছে কয়েক ধরণের সামগ্রী পরিবহণের জন্য এবং ২১ কোটি টাকা কয়েকটি অলাভজনক শাখা লাইন চালু রাখার জন্য। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি স্বল্প দূরত্বের ও শহরতলীর ট্রেনের ব্যবস্থা যা ক্ষতি সত্ত্বেও চালাতে হচ্ছে।

এক নজরে রেল বাজেট

(কোটি টাকার অংকে)

	প্রকৃত হিসাব ১৯৭৬-৭৭	বাজেট হিসাব ১৯৭৭-৭৮	সংশোধিত হিসাব ১৯৭৭-৭৮	বাজেট হিসাব ১৯৭৮-৭৯
মোট আয়	২০৩৬.১১	২২১০.২৪	২১৩১.৬১	২২২০.৮৩
রেল চালানোর সাধারণ ব্যয় বরাদ্দ	১৫৪৬.৯৬	১৬৪৮.৭৪	১৬১১.০৬	১৭০০.৯০
অবচয় রিজার্ভ তহবিলের জন্য ব্যয় বরাদ্দ	১৩৫.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১৪৫.০০
পেনশন তহবিলের জন্য	৩৫.০০	৪০.০০	৪০.০০	৫০.০০
অন্যান্য ব্যয় বরাদ্দ	২০.৮৬	২৩.৬৮	২৪.১৬	২৫.৭১
মোট	১৭৩৯.৮২	১৮৫২.৪২	১৮১৯.২২	১৯২১.৬১
মোট রেল রাজস্ব	২৯৬.২৯	২৫৭.৮২	৩১৬.৩৯	২৯৮.২৫
সাধারণ রাজস্বের অন্তাংশ	২০৯.০৩	২২৫.৩২	২২৭.০৭	২৩২.৮২
মোট উদ্বৃত্ত (+)	+ ৮৭.২৪	+ ৩২.৫০	+ ৮৯.৩২	+ ৬৫.৪৩
লভ্যানুপাতিক হিসেব	৮৪.৪%	৮৬.৬%	৮৪.%	৮৪.৪%

রাজ্য বাজেটঃ

• দেড় লক্ষ বেকার ভাতা পাবেন
• ৩৭১ কোটি টাকার পরিকল্পনা বরাদ্দ
• নতুন কর ২০ কোটি টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি

রেলমন্ত্রী জানান যে, ১৯৭৮-৭৯ সালের বার্ষিক রেল যোজনার মাপ হয়েছে ৫৩৩.৩০ কোটি টাকা। এরমধ্যে ভূগর্ভস্থ রেল প্রকল্পগুলির জন্য ১৩ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রানির ক্ষেত্রে মূলধনী সাহায্য বাবদ ৫ কোটি টাকাও ধরা হয়েছে। চলতি বছরের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ৪৮৮.৫৫ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৮-৭৯ সালে ৫১.৭৫ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হবে। ১৯৭৮-৭৯ এর বরাদ্দে রোলিং স্টক বাবদ ২৩৬ কোটি টাকা এবং নতুন লাইন বাবদ ২৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

অধ্যাপক মধুদণ্ডে জানিয়েছেন, আলোচ্য বছরে নতুন তিনটি রেল লাইন বসানোর কাজ আরম্ভ হচ্ছে। এর মধ্যে একটি লাইনের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী উপনগরী ও বর্তমান কল্যাণী স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া ১৯৭৮-৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে বজবজ-নামখানা লাইনের চূড়ান্ত সমীক্ষার কাজ আরম্ভ হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের রোমোহিনী-চাংরাবান্ধা লাইনের সম্ভাব্যতাও খতিয়ে দেখা হবে।

রেলমন্ত্রী বলেন, অপরিহার্য নয় এমন ধরণের ব্যয়বাহুল্য বর্জন করা হবে। যেসব বিভাগে ডিজেল বা বিদ্যুৎ চালু হয়েছে সেখানকার স্থানীয় লোকো শেডগুলিকে আস্তে আস্তে অপসারণ করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক রেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বলে তিনি জানান। রেলের নিজস্ব 'সেলুনগুলিকে' কয়েকটি ক্ষেত্রে পর্যটকদের ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে আয় বাড়ানোর একটি প্রস্তাবও তিনি বিবেচনা করে দেখছেন। এরপর থেকে রেল অফিসারদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে 'তিনটি পাশের' সুযোগ প্রত্যাহার করা হচ্ছে। অফিসারদের ব্যক্তিগতভাবে 'ধাওলো' শিওনের ব্যবস্থাও বন্ধ করার কথা তিনি চিন্তা করছেন। এভাবে সাশ্রিত অর্থ যাত্রী সাধারণের, বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যয় করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী আর্থিক বছর থেকে এরাজ্যে বেকার ভাতার এক দীর্ঘমিত প্রকল্প চালু করছেন। প্রথম বছরে দেড় লক্ষ বেকার এই ভাতা পাবেন। ভাতার পরিমাণ হবে মাসে ৫০ টাকা। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র রাজ্য বিধান সভায় ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। যাঁদের পারিবারিক আয় মাসে ৫০০ টাকার কম এবং যাঁরা একটানা পাঁচ বছরের বেশী কর্মসংস্থান কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রীভুক্ত তাঁরাই এই ভাতার অধিকারী হবেন। এই ভাতা তাঁরা পাবেন যতদিন কোনো কাজ না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত, তবে তিন বছরের বেশি নয়। যাঁরা এই ভাতা পাবেন তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজিক স্বাস্থ্য, বস্তি-উন্নয়ন প্রভৃতি অনুমোদিত সমাজকল্যাণ প্রকল্পে সপ্তাহে দু-দিন অংশ নিতে হবে। এই কর্মসূচী বাবদ রাজ্য সরকারের ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৭৮-৭৯ সালের রাজ্য বাজেটে বার্ষিক পরিকল্পনা খাতে মোট ৩৭১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি বছরের থেকে ৫৯ কোটি টাকা বেশী। এবারের বাজেটে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, সেচ ও বিদ্যুতের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরমধ্যে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ ৪০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বাবদ ১১৫ কোটি টাকা, এবং সেচ খাতে ৪০ কোটি টাকা। শিক্ষার জন্যও রাজ্য অর্থমন্ত্রী বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রায় ৪০ কোটি টাকা করেছেন। এছাড়া আরো ১৩ কোটি টাকা পরিকল্পনাবহির্ভূত অতিরিক্ত বিনিয়োগ হিসেবে ব্যয় করা হবে। এরমধ্যে বাজেটে বিভিন্ন খাতে কর্মসূচীর জন্য ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। মূলধন ও মূল শিল্পখাতে ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। মূলধনে খাতে বরাদ্দ ছাড়াও ২৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে ১৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ডঃ মিত্র বলেন, ১৯৭৮-৭৯ সালে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে তিনি অন্তত ২৫ কোটি টাকা করতে চান। এইজন্য বাজেটে ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য খাদ্য দিয়ে এই বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী জানান, ১৯৭৭-৭৮ সালের আর্থিক বছরের শেষে সংশোধিত হিসেবে রাজ্যের কোষাগারে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। আগামী বছরে কাজের ও রাজস্ব বহির্ভূত খাতে মোট ঘাটতি দাঁড়াবে প্রায় ২৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। ফলে ২৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার প্রারম্ভিক ঘাটতি সহ আগামী আর্থিক বছরের শেষে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। ডঃ মিত্র প্রায় ৩০ কোটি টাকার মতো ঘাটতি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে এই ঘাটতি ২৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব রেখেছেন।

এই ১৫ কোটি টাকার মধ্যে ১৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে রাজ্য অর্থমন্ত্রীর বিভিন্ন কর প্রস্তাব থেকে। আর বাকী ২৫ কোটি টাকা বলেন। রাজস্ব আদায় থেকে তুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

কর প্রস্তাব

১৯৭৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ পল্লী কর্মসংস্থান ও উৎপাদন আইন অনুযায়ী কলকাতা থেকে প্রতিটি কলা প্রেক্ষণের ওপর ৫০ পয়সা হারে যে গ্রামীণ ও কর্মসংস্থান উপকর ধার্য করা হয়েছিল ডঃ মিত্র ১৯৭৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে তা বাড়িয়ে টিন প্রতি ২ টাকা ৫০ পয়সা করার প্রস্তাব করেছেন। এবাবদ ১৯৭৮-৭৯ সালে আয় হবে ৫ কোটি টাকা।

পণ্য প্রবেশ করের বর্তমান হার পরিবর্তন করে পুরো এক বছরে অতিরিক্ত রাজস্ব আসবে প্রায় ৩ কোটি টাকা। এই টাকা শহর-উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগবে। বিক্রয় কর আইন সংশোধন করে ঘড়ি, রেডিয়ো প্রভৃতি কয়েকটি পণ্য এর আওতায় এনে রাজ্য অর্থমন্ত্রী বছরে অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ করবেন।

ভারতে তৈরী বিদেশী মদের ওপরে অন্তঃশুল্কের বেসব বিশেষ সুবিধা এতদিন ৩য় প্রতিরক্ষাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কর্মচারীরা ভোগ করতেন ডঃ মিত্র তা তুলে নিয়েছেন। মদের ওপরে বিশেষ সুবিধাটুকু ছিল তাও তুলে নেয়া হয়েছে। বিয়ারের ওপর শুল্ক পুনর্নির্ধারণ করে সর্বক্ষেত্রে ১ টাকা ৫০ পয়সা করা হয়েছে। কর্মরত লাভজনক কয়েকটি শ্রেণীর উৎপাদনে নাবালক মেশানোর ওপর পাস কি শতকরা ৫০ ভাগ করানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশ আইন ও কলকাতা শহরতলি আইনের আওতাভুক্ত কিছু কিছু পরিবর্তনও অর্থমন্ত্রী করেছেন। অন্তঃশুল্ক ও প্রতিষ্ঠান-গত কিস্তে এইসব বিলাসদ্রব্যের নীট ফল হিসেবে প্রতি বছরে প্রায় ১ কোটি টাকার বাড়তি রাজস্ব হবে।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী বলেছেন, জমির উৎপাদন ক্ষমতা বিচারে কৃষি আয়কর প্রবর্তনের ব্যাপারে এক বিশেষজ্ঞ দল এখন বিচার-বিবেচনা করে দেখছেন। তিনি জানান, ১৯৭৮-৭৯ সালের কোন এক সময়ে কৃষি জমির ওপর এই নতুন কর বসিয়ে বছরে ৭ কোটি টাকার মত বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে।

মোটরযান করের পরিবর্তন ঘটিয়ে ডঃ মিত্র আগামী বছরে বাড়তি নীট ২ কোটি টাকা আয়ের আশা করেছেন। তিনি পেশাবৃত্তি ও চাকুরির ক্ষেত্রে এক রাজ্য করবিধি প্রবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমান বছরে এই সূত্র থেকে কোন রাজস্ব আদায়ের হিসাব রাখেননি।

অর্থমন্ত্রী নতুন কর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বাড়তি সুযোগসুবিধাদানের কথাও ঘোষণা করেছেন। তিনি শিল্পের প্রসোদকর আইন সংশোধন করে ছুটি সর্বনিম্ন স্তরে রঙিন চলচ্চিত্রের ওপর সারচার্জ ১৫ পয়সা করে কমাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিবন্ধীকৃত বিক্রেতাদের কাছ থেকে কেনা কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য করভার তিনি শতকরা ৪ ভাগ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশে করেছেন।

সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে রাজ্য বাজেটে গুড এজ পেনসনের প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা ১০০০ থেকে বাড়িয়ে ৮২৫০ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৮-৭৯ সালে মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আবাসন স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেবার সংকল্প ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা এবাবদ অতিরিক্ত অর্থের জন্যে সপ্তম অর্থকমিশনের কাছে দাবী রেখেছেন। তিনি আশা করেন কমিশন সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এব্যাপারে পৃথক সাহায্য চাইবেন। অর্থমন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন, রাজ্য বেতন কমিশন দুর্মূল্য ভাতার হার সম্পর্কে কোন অন্তর্বর্তী সুপারিশ করলে রাজ্য সরকার তা কার্যকর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

পেনসনভোগীদের জন্য সুবিধা

পেনসনভোগী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ডঃ মিত্র কিছু সুবিধা দিয়েছেন। ১৯৭৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে তাঁদের পেনসন মাসিক ১৫ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। রাজনৈতিক নির্যাতিত কর্মীদের ন্যূনতম পেনসনও এবারের রাজ্য বাজেটে ১৯৭৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে বাড়িয়ে মাসিক ৫০ টাকা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজ্যের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের পরিবার বর্গকেও এই রাজনৈতিক পেনসন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে রাজ্য সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর এক রূপরেখাও তুলে ধরেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম রচনা ও রূপায়ণ করতে সর্বনিম্ন স্তরের পঞ্চায়েতগুলিকে দায়িত্ব দেয়া হবে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মোট ৩,৫০০ পঞ্চায়েত সরাসরি গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে লিপ্ত হবে। এজন্য পঞ্চায়েতগুলির নামে ডাকঘরে ও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। সেখান থেকে তারা প্রয়োজন মত টাকা তুলবে। গড়ে অন্তত ১০ জন গ্রামবাসীকে একটি করে পঞ্চায়েত প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় বাজেটের মতো রাজ্যের বাজেটের জন্যে তেমন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা থাকে না, কারণ রাজ্যের বাজেটে থাকে না কেন্দ্রীয় বাজেটের মতো চমক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট প্রস্তাবে জীবনের যতো দিক ছুঁয়ে যেতে পারেন কোনো রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তা পারেন না। বড় রকমের চমক দেখাবার মতো যথেষ্ট মালমশলাই অভাব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর। তিনি বড় জোর আমদানি রপ্তানির হারের হেরফের করতে পারেন, বিক্রয় কর কমাতে-বাড়াতে পারেন, কম-বেশি করতে পারেন ভূমি রাজস্বের হার। আর্থিক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতারই প্রতিফলন এটা। কিন্তু কর প্রস্তাব ছাড়াও রাজ্য সরকারের বাজেটে থাকে আরো একটি আকর্ষণ। তা হলো আলোচ্য বছরে রাজ্য সরকার কী করতে চান তার একটা ছবি পাওয়া যায়। তা ছাড়া পাওয়া যায় রাজ্যের আর্থিক অবস্থার ছবি। এই সব কটি দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটকে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক স্বাস্থ্য যে ভালো নয় তা এবারে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের বাজেট ভাষণে খুব স্পষ্ট-ভাবেই ফুটে উঠেছে। পূর্বতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার খুব উন্নতি হয়, এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিদায়ী অর্থমন্ত্রী ডঃ গোপাল দাস নাথ গত বছর মার্চে ১৯৭৭-৭৮ সালের যে বাজেট পেশ করেন তাতে দেখানো হয়েছিল চার কোটি টাকার মতো উদ্বৃত্ত। ডঃ নাথ তখন বলেছিলেন, কংগ্রেস সরকার যে উপর্যুপরি তিন বছর উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করলেন তা থেকেই বোঝা যায়, অর্থস্তর কতো ভালো-ভাবে কাজ চালাচ্ছেন।

কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ডঃ মিত্র যে বাস্তব অর্থনৈতিক বিবরণী পেশ করলেন তাতে দেখা গেল একেবারে উল্টো ছবি। উদ্বৃত্ত দূরে থাক, প্রারম্ভিক তহবিলে ঘাটতি পড়লো ৪৬ কোটি টাকার বেশি ঘাটতি। এর ওপর বিদায়ী সরকার চাপিয়ে যান ৩০ কোটি টাকার মতো বাড়তি দায়। কাজেই আর্থিক অবস্থার অবনতির পরিমাণ প্রায় ৯০ কোটি টাকা বলে নতুন অর্থমন্ত্রী জানান।

ডঃ মিত্র গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট পেশ করলেন তাতে দেখা গেল, ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রারম্ভিক ঘাটতির পরিমাণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ৫৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। চলতি আর্থিক বছরে নতুন কর বসানো হয়েছিল ৪২ কোটি টাকা। তবু শেষ পর্যন্ত ঘাটতি থেকে যায় ২৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

১৯৭৮-৭৯ সালে আর্থিক অবস্থা কী রকম দাঁড়াবে? চলতি বছরেই যখন বড় রকমের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে তখন তার জের তো টানতেই হবে। তার ওপর বাড়তি খাতে ঘাটতি দাঁড়াবে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব খাতের ঘাটতি ২৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে ঘাটতি দাঁড়াবার কথা ৩৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু আর দাঁড়াবার যে ব্যবস্থা অর্থমন্ত্রী করেছেন তাতে এই ঘাটতি কমে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আগেকার চলতি বছরের মতোই।

আয় বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে ৩৩ কোটি টাকা। এর বেশিটাই আসবে নতুন কর থেকে—প্রায় ২০ কোটি টাকা। বাকিটা আসবে চলতি করই আরো তাড়াতাড়ি আদায় করে। মাত্র চারটি খাতের সীমিত ক্ষমতার এক বছরে ২০ কোটি টাকা নতুন করের প্রস্তাব করা খুব কম কথা নয়, বিশেষত যদি আমরা মনে রাখি যে চলতি বছরে নতুন কর বসানো হয়েছিল ৪২ কোটি টাকা। অমন কোনো রাজ্য সরকারই এক বছরে এত বিপুল পরিমাণ কর বসান নি।

আগামী আর্থিক বছরে যেসব সূত্র থেকে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় করের ওপর ধার্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান আদায় সেস্-এর হার বৃদ্ধি। এত দিন এই হার ছিল টন প্রতি ৫০ পয়সা। পয়লা এপ্রিল থেকে হবে আড়াই টাকা। এর ফলে বাড়তি আয় হবে পাঁচ কোটি টাকা। গ্রামে কর্মসংস্থানের জন্য পূর্বাঞ্চলের জন্যে সেস্-এর এই হার বৃদ্ধিতে কেউ আপত্তি করবেন না বলে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর ফলে করলার কিছুটা দাম বাড়বে। ডঃ মিত্র বাজেট পেশ করার তিন দিন পরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও যে কয়লার ওপর কেন্দ্রীয় অনেকটা হার বাড়িয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

চুক্তির তালিকায় আরো কিছু পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে আয় বাড়বে দু কোটি টাকা। কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে চুক্তির হারেরও রদবদল করা হবে। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল চুক্তি তুলে দেওয়ার জন্যে রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করেন কারণ এই কর আদায়ের খরচা অনেক। কিন্তু ডঃ মিত্র এই প্রস্তাবে তেমন উৎসাহ দেখান নি। কারণ চুক্তি তুলে দিলে রাজ্যের আয় কমে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেই ক্ষতি পূরণ করে দেন তবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার চুক্তি তুলে দিতে পারেন।

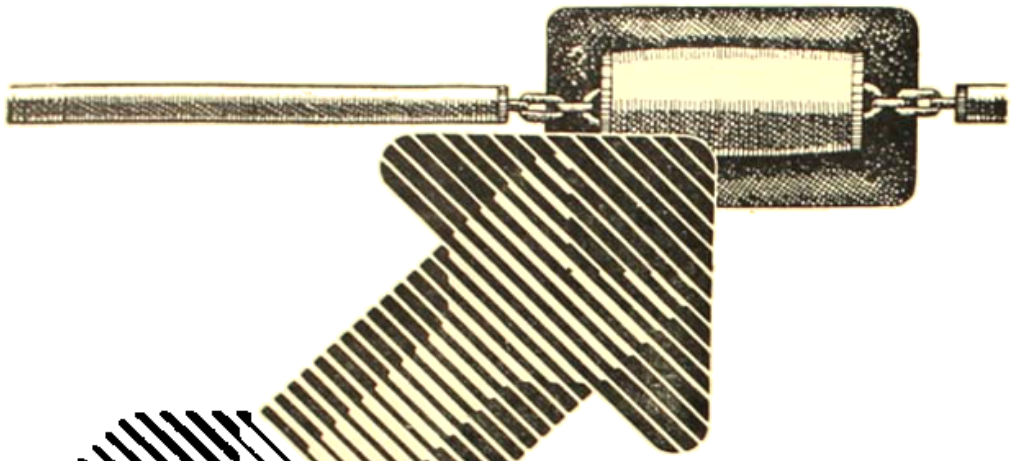

বিপদ-শৃঙ্খলের অপব্যবহার বন্ধ করতে সাহায্য করুন

ট্রেন 'লেট' করলে আপনারা স্বভাবতই আমাদের উপর বিরক্ত হন।

অথচ আপনি একথা কি জানেন—অযথা বিপদ-শৃঙ্খল টানার জন্যেই বেশির ভাগ সময় ট্রেন 'লেট' হয়। কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন যাত্রী আছেন যাঁরা কারণে-অকারণে বিপদ-শৃঙ্খল টানেন। ফলে ট্রেন যায় থেমে, সবকিছু ঠিকঠাক করে আবার ট্রেন চালু করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে।

এছাড়া, একটি ট্রেন 'লেট' করলেই পরপর ট্রেন 'লেট' করতে থাকে। ফল! আপনার মতো আরও হাজার হাজার যাত্রীর অযথা দুর্ভোগ। আমাদের সাহায্য করুন....এইসব দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের ধরিয়ে দিন। যদি অপরাধী সাজা পায় তাহলে আপনি ১০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পাবেন।

অপরাধীকে ধরিয়ে দিন...
...ভাল কাজের পুরস্কার নিন

পূর্ব রেলওয়ে

বিক্রয় করের ক্ষেত্রেও অল্প কিছু রদবদল করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। বিক্রয় কর আদায়ের জন্যে দুটি আইন আছে। একটি ১৯৪১ সালের, অপরটি ১৯৫৪ সালের। প্রথমটিতে বিক্রয় কর আদায় হয় কেনাবেচার শেষ পর্যায়ে, দ্বিতীয়টিতে হয় প্রথম পর্যায়ে। চলতি বছরের বাজেট পেশের সময় এই দুটি পণ্য-তালিকায় রদবদল করা হয়েছিল। আগামী বছরে আরো কিছু রদবদল করে প্রথম আইনের আওতা থেকে আরো কিছু পণ্যকে (যেমন পাখা, রেডিও) নিয়ে আসা হবে দ্বিতীয় আইনের আওতায়। বিক্রয় কর সংক্রান্ত আইন দুটির সংশোধনও করা হবে, উদ্দেশ্য আরো ভালোভাবে কর আদায়।

ডঃ মিত্র যে সব করের প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বোধ হয় জোত কর বা ল্যান্ড হোল্ডিং ট্যাক্স। ভূমি রাজস্ব আদায়ের বর্তমান ব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ তা অনেক বিশেষজ্ঞই বলেছেন। এই রাজস্বের সঙ্গে কৃষিজাত আয়ের তেমন সম্পর্ক থাকে না। তাই ভূমি রাজস্বের বদলে জোত কর প্রবর্তনের প্রস্তাব ডঃ মিত্র গত দুবারই করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি জটিল বলে ইতিমধ্যে সেই ব্যবস্থা কার্যকর করা যায় নি। ১৯৭৮-৭৯ সালে এই নতুন কর চালু করা যাবে বলে তিনি আশা করেছেন এবং এর ফলে আদায় হবে অতিরিক্ত সাত কোটি টাকা।

কোনো বাজেটই যেহেতু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত জমা-খরচের হিসেব হয়ে থাকতে পারে না, তাই আর্থিক দৈন্য সত্ত্বেও সরকারকে উন্নয়নের কাজের ব্যবস্থা করতে হয়। রাজ্য সরকারও তাই করেছেন। বার্ষিক যোজনার ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৭ কোটি টাকা থেকে ৩৭১ কোটি টাকা। এই বার্ষিক যোজনার প্রধান গুরুত্ব গিয়ে পড়েছে চাষবাস, সেচ, বিদ্যুৎ এবং শিক্ষার ওপর। প্রথম দুটি খাতের প্রত্যেকটিতে ব্যয়ের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকা, বিদ্যুতের জন্যে ১১৩ কোটি টাকা এবং শিক্ষার জন্যে ৪০ কোটি টাকা। এই সব খাতে ব্যয়বৃদ্ধি এবং গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করবেন না। এই রাজ্যে ধান বা চালের উৎপাদন নীতি-সঙ্গত বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু বিঘা প্রতি উৎপাদনের হার এখনও সন্তোষজনক নয়, বিশেষ করে চালের ক্ষেত্রে। বাড়তি চাষের জমির ব্যাপক অংশেই এখনও পর্যন্ত সেচের কোনো ব্যবস্থা নেই। আর বিদ্যুতের জন্যে ব্যয়বৃদ্ধির গুরুত্ব নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই। শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রসারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তও নিশ্চয়ই অভিনন্দিত হবে।

তবে পশ্চিমবঙ্গের এই বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বিষয় বোধ হয় এই যে, প্রচলিত বিভিন্ন খাতে ব্যয়বৃদ্ধি ছাড়া রাজ্য সরকার কয়েকটি বাড়তি সামাজিক দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। সরকারী কর্মীদের পেনশন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে, বৃদ্ধদের পেনশনের হার বাড়ানো হয়েছে, বাড়ানো হয়েছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীদের পেনশনের হার। স্বাধীনতার পর যে সব রাজনৈতিক কর্মী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিতে নিষিদ্ধ হয়েছেন তাঁদেরও পেনশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে, কারণ 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের' দাবী নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তবে রাজ্য বাজেটের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব নিশ্চয়ই বেকার ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব। তবু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে পঞ্জীভুক্ত বেকারের সংখ্যাই যেখানে তেরো লক্ষ সেখানে মাত্র তেত্রিশ লক্ষ বেকারকে মাসে ৫০ টাকা ভাতা দেওয়া খুবই সামান্য ব্যবস্থা বলে মনে হতে পারে। তবু এই ব্যবস্থাকে বিপ্লবাত্মক বলতে হয়, কারণ অন্য কোনো রাজ্য সরকারই এ পর্যন্ত এই ধরনের ভাতা চালু করেন নি। বেকার ভাতা চালু করা ছিল বাম ফ্রন্টের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এই দায়িত্ব দেওয়ার ফলে রাজ্যের আর্থিক দায় বাড়বে ৯ কোটি টাকা। তবে ভাতা প্রবর্তন যে বেকার সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে উপযুক্ত পথ নয়, একথা নিশ্চয়ই বাম ফ্রন্ট সরকারও অস্বীকার করবেন না। তাই এ-বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদী নীতি রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থা, বাজেট বাস্তবতা, নতুন কর প্রস্তাব ইত্যাদির মতো গুরুত্বই থাক, তবুও অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে এ সবের চেয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে বলে মনে হয়। সেটি হলো কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক। বিশেষ কোনো সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বা অদক্ষতার কোনো রাজ্যের আর্থিক দৈন্য যে দেখা দিতে পারে না তা নয়, কিন্তু এর মূলে রয়েছে অন্য রোগ। সেই রোগ হলো, রাজ্যের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা। এই দুর্বলতার জন্যে রাজ্যগুলি কীভাবে মার খাচ্ছে, তার একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ ডঃ মিত্রের বাজেট ভাষণ। যদিও বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের কথা মনে রেখে বলা হয়েছে এই সব কথা, তবু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোনো অঙ্গরাজ্যের বক্তব্য বলে ধরা যায় এটাকে। কেন্দ্রীয় সরকার বা সপ্তম অর্থ কমিশন এই সমস্যার কতোটা সমাধান করতে পারেন তার ওপরেই নির্ভর করছে রাজ্য গুলির আর্থিক ভবিষ্যৎ।

প্রাঙ্গণ

এবার ইডেনে পাশাপাশি দুটো বড় খেলার আসর বসেছিল। সন্তোষ ফুটবল ও সাতটা ভলিবল প্রতিযোগিতা (২১ থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠিত হওয়ায় অনেকটা পুষিয়ে গেছে। ভলিবল ফাইনালে পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব বাংলাদেশকে ১৫-১ পয়েন্টে ও মহিলা বিভাগে কেরালা বাংলাকে ১৫-২ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত বারের বিজয়ী মাদ্রিসেসকে (পুরুষ) তামিলনাড়ু ১৫-৩ পয়েন্টে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে এবং বাংলা কেরালা (মহিলা) অনুরূপ ফল লাভ করেছে। এইবার নিয়ে পর পর দুবার জাতীয় ভলিবলের আসর এখানে বসলো। (খ)—কেরালা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং সমু ও কাশ্মীর। (গ)—মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, বিহার, কর্ণাটক ও হিমাচল প্রদেশ (ঘ)—রেল, অন্ধ্র, হরিয়ানা, ইউ. পি. এবং এম. পি.।

পুরুষ দলের মধ্যে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, ইউ. পি., কর্ণাটক ইত্যাদি দল কোয়ার্টার ফাইনালে না যেতে পারলেও বোমবাটি তামাশের সঙ্গে খেলেছে। মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের খেলাটি বেশ উপভোগ্য হয় এবং দীর্ঘ ১২০ মিনিট ধরে লড়াইয়ের পর মহারাষ্ট্র ১৫-১২, ১৩-১৫, ১৫-১৩, ৮-১৫ ও ১৫-১২ গেমে জেতে। তাদের এই দলের মূলে ছিল স্যাশাপ আবদুল বশীর। এবং বাংলা দারুণ খেলে ইউ, কিছুই না। অথচ বাংলার খেলোয়াড়রা যখন নিজ নিজ ক্লাবের হয়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে যায় সেখানে কিন্তু প্রশংসা কুড়োয়।

পুরুষের কোয়ার্টার ফাইনালের ফল :- পাঞ্জাব বনাম গুজরাট—১৫-৩, ১৫-৭ ও ১৫-১৩। রাজস্থান বনাম রেল—১৩-১৫, ১৫-১৩ ও ১৫-৮। তামিলনাড় বনাম বিহার—১৫-১৩, ১৩-১৪ ও ১৫-১৩।

এবার মহিলা বিভাগে বাংলা, রেল, তামিলনাড়ু ও কেরালা ছাড়া বাকীরা নীচু মানের। গত বারের বিজয়ী বাংলার মহিলা দল থেকে প্রথম সারির ৮ জন খেলোয়াড় চাকরির সুবাদে পূর্ব রেলে যোগদান করলেও বাংলা দল যে ভেঙে পড়েনি এ আসরে তার পরীক্ষা দিতে তারা সমর্থ হয়েছে। যদিও এ দলটি অনভিজ্ঞ, তবু বেশ নতুন মুখে শৈক্ষিত। বয়সের গড় মাত্র ১৯।

জাতীয় ভলিবলে পাঞ্জাব সাতবার বিজয়ী হল

এবার জাতীয় ভলিবলে সেরা খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছে। কারণ এই প্রতিযোগিতার পরই প্রশিক্ষণ শিবির সফরকারী ও বিশ্বকাপে বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারতীয় দল নির্বাচিত হবে। এবার পুরুষ বিভাগে ২৪ টি দল ও মহিলা বিভাগে ১৯ টি দল যোগদান করেছে।

পুরুষদের প্রাথমিক 'ক' বিভাগে ছিল—সার্ভিসেস, হরিয়ানা, পি. এণ্ড. টি., গুজরাট, আসাম ও চণ্ডিগড়। 'খ' বিভাগে—রেল, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, এম. পি, পণ্ডিচেরী ও মহারাষ্ট্র। 'গ' বিভাগে কেরালা, রাজস্থান, বিহার, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ। 'ঘ' বিভাগে—পাঞ্জাব, ইউ. পি., বাংলা, কর্ণাটক, সমু ও কাশ্মীর, মণিপুর এবং ওড়িষা।

মহিলা বিভাগ (ক)—বাংলা, দিল্লী, পি. এণ্ড. টি., গুজরাট ও চণ্ডিগড়।

পি-কে ১৫-৮, ১৫-১৩, ১৪-১৬, ও ১৫-৩ এ পরাজিত করে।

পুরুষ বিভাগে ৮টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে যায়—পাঞ্জাব, গুজরাট, রেল, তামিলনাড়ু, বিহার, সার্ভিসেস এবং বাংলা।

বাংলা (পুরুষ) প্রাথমিক লীগের খেলায় অন্য দল কাঁটিতে জয়ী হলেও পাঞ্জাবের কাছে ১৫-৯, ১৫-৮ ও ১৫-১ এবং কোয়ার্টার ফাইনালে সার্ভিসেসের কাছে ১৫-১৩, ১৫-৮ ও ১৫-৩ এ হেরে আসর থেকে বিদায় নেয়।

বাংলা পুরুষ দল যে এতদূর উঠতে পেরেছিল তাই যথেষ্ট। কারণ যেখানে অনুশীলনের নামে প্রহসন চলে, কোচের নাম অনেক দেরীতে জানা যায়, আর ভলিবল সর্বকর্তাগণও ভাবেন, কী লাভ ভলিবলটিকে আরো সুস্থ করে। সেখানে ভালো খেলা আশা করা বাতুলতা ছাড়া

মহিলা বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালের ফলাফল হলো : রেল বনাম দিল্লী—১৫-৪, ১৫-৪ ও ১৫-২। কেরালা বনাম হিমাচল প্রদেশ—১৫-১০, ১৫-১৩ ও ১৫-১২। তামিলনাড়ু বনাম পাঞ্জাব—৫-১৫, ১৩-১৫, ১৫-৩, ১৫-৭ ও ১৫-১২। বাংলা বনাম অন্ধ্র—১৫-৫, ১৫-১ এবং ১৫-৫।

পুরুষ বিভাগের সেমি ফাইনালে রাজস্থান সার্ভিসেসকে ১৫-২, ১৫-৩, ১১-১৫ ও ১৫-১১ গেমে পরাজিত করে প্রমাণ করে দিল যে তরুণের জয় জয়কার। দলটি অলরাউণ্ডার, সম্ভবত সেরা। এরা এইবার প্রথম ফাইনালে উঠলো। এই দলে রয়েছে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত খেলোয়াড় প্যারালাল বাও।

অপর সেমিফাইনালে (পুরুষ) পাঞ্জাব তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ৫-১৫, ১৫-৫, ১৫-৫, ১৩-১৫ ও ১৫-৪ গেমে জেতে। তবে তামিলনাড়ুর একটি সার্ভিসকে কেন্দ্র

করে মাঠে নেওয়ার ব্যবস্থা ও তিল পড়ে। পাওয়ার ফলটি বেশ বড়িয়ে বেশ ফল ঝেঁপোয়াড় নিয়ে হয়েছে। এই বলে আছেন নিবেদিতা গিরি (অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত) গিনি ৫৬ সাল থেকে ভারতীয় ভলিবলে অংশ গ্রহণ করে আসছেন। তাঁর আমলের বাংলার অনেক খেলোয়াড় এখন কর্মকর্তা। আর কারও নিয়ে চৌখস খেলোয়াড়।

মহিলা বিভাগের সেমি ফাইনালে বাংলা তামিলনাড়ুকে হারায় ১৫-৩, ১৫-৬ ও ১৫-৩ বলে বেশ পরাজিত করে ফেরালাকে ১৫-৫, ১৫-৩ ও ১৫-৫ ব।

বহু অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলার মেয়েরা ফাইনালে খেলেও বিরুদ্ধে তুল থেকে অনবদ্য প্রেসিং, ব্লকিং, লিফটিংএর ফলে ১৫-৮ ও ১৫-৮ পেয়ে প্রথমে খেলেও তৃতীয় খেলের শুরুতে ১-৩ পিছিয়ে পড়েও পরে ১৩-১৩ সমতা আনে। কিন্তু এ খেলে প্রচণ্ড বড়ে খেলে (১৫-১৩) তিনিয়ে নেয়। আবার পাল্টা আক্রমণ শুরু বাংলা চতুর্থ খেলে ৭-১ এগিয়ে খেলেও খেলা হিতাচ্ছে খেলেনি (১৫-৯)। পঞ্চম খেলেও খেলার শুরুতে ছন্দ থায় (১৩-৫)। খেলার খেলে বাংলার মেয়েরা কেঁদে ভাসিয়েছে আর খেল ফল উল্লাসে মেতে উঠেছে।

পুরুষদের ফাইনালে পাওয়ার দারুণ খেলে বাজস্থানকে ১৫-১২, ৩-১৫, ১৫-৭ ও ১৫-৭ খেলে হারিয়ে চারা ৭ বার বিজয়ী হয়। পাওয়ারের ধারাবাহিক দিং খেলা শুরুতে টেনে নিয়ে গেছে। ৮টি ফাইনালেই অভিজ্ঞতার জয় হলো।

গতবারের ফাইনালের চেয়ে এবারের ফাইনাল অনেক প্রাণবন্ত। স্মাশ, ব্লক, প্রেসিং, লিফটিং দাড়ির ইত্যাদি দর্শক ছিল উচ্চমানের, যা দেখে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ। বার বার করতালি দিয়ে এরা সারা খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছে।

নির্মলকান্তি ঘোষ

সংবাদ

কৃষি উদ্ধারের কাজ এগোচ্ছে

দেশে বইমানে প্রায় ৭ হাজার হেক্টর পতিতজমিতে চাষের কাজ চলছে। এই জমিগুলি বেশিরভাগ প্রাকৃতিক কারণে চাষের উপযোগী ছিলনা। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ওগুলিকে পুনরায় চাষোপযোগী করে তোলা হয়েছে। চলতি অর্থিক বছরে প্রায় লাখে বাকরা হাজার হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা হবেছে। এবং চলতি বছরে প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমির খার করানো হবেছে। পঞ্চম যোজনায় এজন্য দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সম্প্রতি এই কাজ বিহার এবং পশ্চিম বাংলাতেও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর্নালের সেন্ট্রাল মাটির লবণাক্ততা বিভাগ ইনভাইরনমেন্ট পরীক্ষা করে দেখেছেন এই ধরনের পুনরুদ্ধার করা পতিত জমিতে হেক্টর পতি গড়ে ১৫ কুইন্টাল বাড়তি ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। এবং এর ফলে দেশে পতিত ২৫ লক্ষ হেক্টর জমি পুনরায় চাষের কাজে লাগাতে পারলে অতিরিক্ত ১২২.৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব—যার দাম প্রায় ১৩০ কোটি টাকা এবং এরফলে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক কাজ পাবে।

কয়লার উৎপাদন বাড়ছে

সম্প্রতি কয়লা উৎপাদনে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে দৈনিক উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বেড়েছে। গত নভেম্বর মাসে দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টন। এ বছর জানুয়ারী মাসে দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টন। প্রতি মাসে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টন। নভেম্বর মাসে কোল ইন্ডিয়ায় উৎপাদন ছিল ৬৪ ডিসেম্বর মাসে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ লক্ষ টন এবং জানুয়ারী মাসে উৎপাদনের পরিমাণ ৮৪ লক্ষ টন।

উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে রেল বহনের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন বেড়েছে। বর্তমানে মাসিক পরিমাণ ১ কোটি টনের মত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে বহনের পরিমাণ ৮৩ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছিল এবং বিহার ক্ষেত্রে কয়লার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রেলমন্ত্রী শ্রী পি বালচন্দ্রন বোম্বাইয়ে কর্মচারীদের এই তথ্য জানিয়েছেন।

কয়লা শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের কাছে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী শ্রী বালচন্দ্রন কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি চেয়ারম্যান মানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর এবং কয়লা খনির আঞ্চলিক ম্যানেজারদের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য কয়লা শিল্পে নিযুক্ত প্রমিকদের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

জাহাজী চিত্র

১৯৭৭ এর প্রথমদিকে ভারতীয় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন ওজনের সমুদ্রগামী ৫ জাহাজ ১৬ টি পুরোনো জাহাজ কিনেছে এবং ২ লক্ষ ১১ হাজার টন ওজনের ১৩ টি জাহাজ তৈরীর অর্ডার দেওয়া হয়েছে। জাপান, নেদারল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী এবং বিদেশী দেশগুলি থেকে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টন ওজনের মোট ১৮ টি

নতুন জাহাজ কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগই সমুদ্রগামী ও পণ্যবাহী। এর [illegible] জাহাজের ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টন [illegible] ২৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত জাহাজী সংস্থাগুলি [illegible]। এছাড়া, বিশাখা-[illegible] এবং কলকাতার জাহাজ নির্মাণ [illegible] আরও ১২ টি জাহাজ [illegible]

[illegible] বছরের শেষে ভারতের বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা ছিল ৩৭১ টি। এগুলির বহন ক্ষমতা ছিল ৫৩ লক্ষ ৫ হাজার টন। ঐ বছরের শুরুতে বহন ক্ষমতা ছিল ৫১ লক্ষ ১২ হাজার টন।

বিদেশ থেকে জাহাজ কেনার জন্য ৫০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার ব্যবস্থা রয়েছে। জাহাজী উন্নয়ন তহবিল কমিটি এপর্যন্ত বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে এবাবদে ১৮১ কোটি টাকা অনুমোদন করেছেন।

আরো দুটি সার কারখানা

পশ্চিম উপকূলে দুটি বৃহদাকার সার কারখানা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কারখানা দুটি চালু হলে প্রতিটিতে বৈশিষ্ট ১৩৫০ টন অ্যামোনিয়া এবং ১৮৫০ টন ইউরিয়া উৎপন্ন হবে। বোম্বে হাই-এর গ্যাস এই সার কারখানা-গুলিতে ব্যবহৃত হবে।

ঘড়ির উৎপাদন আড়াইগুণ বেড়েছে

দেশে এক বছরে ঘড়ির উৎপাদন আড়াইগুণ বেড়েছে। ১৯৭৭ সালে দেশে ঘড়ি তৈরী হয়েছে মোট ৩০ লক্ষ ৯৮ হাজার। তার আগের বছর উৎপাদন হয়েছিল ১৩ লক্ষ ৮৯ হাজার। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ১২১ ভাগ। সবচেয়ে বেশী ঘড়ি তৈরী করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্। তাঁরা তৈরী করেছে ১৯ লক্ষ ১০ হাজার ঘড়ি। আগের বছরের তুলনায় শতকরা ১৩৮ ভাগ বেশী। বেসরকারী ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে ১০ লক্ষ ১২ হাজার এবং কুটির শিল্পে তৈরী হয়েছে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার।

এইচ. এম. টি তার উৎপাদন বৃদ্ধির এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বছরে ২০ লক্ষ ঘড়ি তৈরী করা তাদের লক্ষ্য।

ভূকম্পপ্রবণ ও আদিবাসীদের জন্য গাড়ীর পারমিট

কেন্দ্রীয় জাহাজী ও পরিবহণমন্ত্রী শ্রী চাঁদ রাম বলেছেন, সংসদের আগামী অধিবেশনে তপশীলি জাতি ও উপজাতি লোকেরা যাতে মোটর গাড়ির পারমিট পেতে পারেন সেজন্য পারমিট সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য বিল পেশ করা হবে। শ্রী চাঁদ রাম সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে সড়ক পরিবহণের উপর উন্নয়ন কাউন্সিলের যৌথ কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি আরো বলেন যে, তার মন্ত্রক ইতিমধ্যেই মোটর গাড়ি টায়ারের মাইল ও প্রশাসনিক খোল নলচে পরীক্ষা করে এর সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি

ইস্পাত ও খনিমন্ত্রী শ্রী বিজু পট্টনায়ক সম্প্রতি ইস্পাত পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ইস্পাত কারখানাগুলির পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পুনর্মূল্যায়ণ করেন এবং ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি টন ধার্য করেন।

আপনার আয়কর কত হবে

২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

(ক) বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ আয় : ১,৬২০ টাকা

(খ) অফিস যাতায়াত বই কেনা প্রভৃতি বাবদ আয় (Standard deduction) : ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২,০০০ টাকা
বাকী ৩,২৮৪ টাকার জন্য ৩২৮ টাকা
মোট ২,৩২৮ টাকা

(গ) জীবন বীমা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ডাকঘরে রাখা বা পেনের বাবদ আয় ৩,৩৯৬ টাকা

মোট ছাড় (ক+খ+গ) ৭,৬১৪ টাকা

অবশ্য এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ী ভাড়াকে মোট আয় থেকে বাদ দিতে হয়, এ ব্যাপারে নিয়ম হল নিয়োগকারী তাঁর কর্মচারীকে যে বাড়ীভাড়া ভাতা দিচ্ছেন

(১) সেই পরিমাণের (actual amount) ভাতাটুকু, অথবা

(২) মাসে চার শত টাকা করে ভাতা, অথবা,

(৩) কর্মচারীর বেতনের এক দশমাংশের অতিরিক্ত যে ভাতা, অথবা

(৪) কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, শ্রীনগর, বেনারস প্রভৃতি স্থানে কর্মচারীর বেতনের এক পঞ্চমাংশ।

—এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে কম সেই টাকাটা বাড়ীভাড়া ভাতা হিসাবে ছাড় পাওয়া যাবে।

এই ব্যক্তির আয়ের ১৭,৬০৪ টাকা থেকে ৭৬১৪ টাকা বাদ দিলে থাকে ৯,৯৯০ টাকা। যেহেতু এই টাকা ১০,০০০ টাকার কম অতএব তাঁকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হবে না। আয়কর দাতাদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার সুযোগও থেকেও তিনি বেহাই পেয়ে যাবেন, কেননা তিনি আয়করদাতাই নন।

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষার প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. ডি. রাঘবন্‌জান।
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিচালন কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্রাসগো প্রিন্টিং কোঃ প্রাইভেট লিঃ, হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

পঞ্চাশ পয়সা

১৫ মে ১৯৭৮

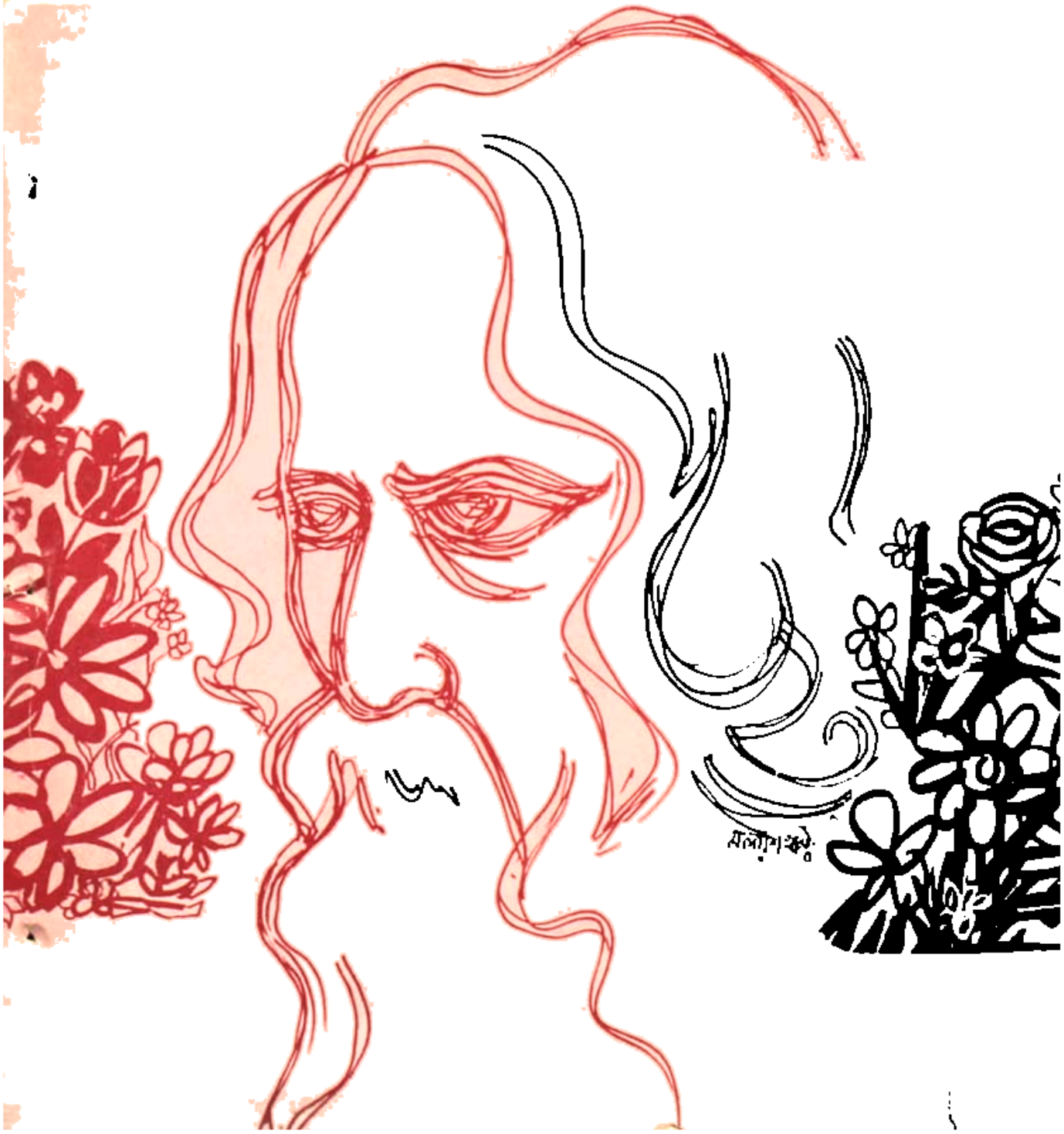

চিঠি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মহাশয়,

আপনার সুসম্পাদিত পত্রিকার সম্প্রতি দুটি সংখ্যা (১৬-২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮, বিশেষ পরিকল্পনা সংখ্যা এবং ১৬-৩১ মার্চ, বাজেট সংখ্যা) খুব ভালো লাগল। তথ্যসমৃদ্ধ এই সংখ্যা দুটির প্রথমটিতে পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুলিখিত। অতি সাধারণ পাঠক যাঁরা তাঁদের কাছে এই জটিল বিষয়টির নানা দিক প্রবন্ধকর্তাদের মাধ্যমে চিত্তাকর্ষক ভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকার তুলনায় আপনি পরিকল্পনা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এই রকম একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে পাঠকদের প্রশংসাভাজন হলেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'পরিকল্পনার নব-রূপায়ণ' প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ; লেখককে ধন্যবাদ জানাই এজন্য।

দ্বিতীয় বাজেট সংখ্যাটির সম্পাদনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের এমন সরস অথচ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা খুবই প্রশংসার যোগ্য। 'আর্থিক বাজেট, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি'—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ্ ডঃ ভবতোষ দত্ত অতি মনোজ্ঞভাবেই পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। এই সংখ্যার অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও উপভোগ্য হয়েছে।

অমি বাগচি
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

মহাশয়,

'যোজনার' ১৬-৩১ এপ্রিল সংখ্যা হাতে পেলাম। এলাহাবাদ বীরেন সাহার 'ধরাপাতা নড়ল পাতা' লেখাটি বড় সুন্দর লেগেছে। উনি মাঝে মাঝে এমনি সরস করে মনের কথা লিখবেন ভালভাবে প্রকাশ করুন। অমর পালের 'ঝোপাড়া মেলা', যেন পরিশ্রমে একটি ছবির মতো রচনা। কিন্তু সবচেয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবারে প্রকাশিত প্রমথনাথ পাল মহাশয়ের চিঠিখানি। চিঠিখানিতে তিনি মন্তব্য-কার কি বলতে চেয়েছেন বোঝা বড় শক্ত। তাঁর উক্তি থেকে বলছি: এতে অন্যান্য অনেক ভালো বিষয় আছে। তবে এর কেন বহু লেখাপড়া জানা লোকেরও শিক্ষণীয় ধরণের কিছুটা অভাব লক্ষিত হয়। সাধারণে সুস্থ সমালোচনা করার মনোভাব এবং তা গ্রহণ করেনেওয়ার মতো করার মনোভাব প্রায়ই দেখা যায় না। ফলে মামুলি আলোচনার গণ্ডিই পক্ষের বাড়ে হয় না।' পাল মহাশয় চিঠিখানিতে এমন দুটি সংখ্যা অর্থাৎ পরিকল্পনা ও বাজেট সংখ্যা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন না ভালো বিষয়ে ভরপুর একথা তিনি স্বীকার করছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে 'শিক্ষণীয় ধরণ' অভাবের কথা বলছেন। ভালো বিষয়ের সঙ্গে এখানে 'শিক্ষণীয় ধরণ' বিরোধ তিনি কোথায় পেলেন? সরকারের পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে খুটিনাটি আলোচনা, সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিচার বিশ্লেষণ করাটা তবু কি মামুলি আলোচনার পর্যায়ে পড়ে? এর থেকে আমাদের পাঠকের কি কোন লাভ নেই? সরকারী নীতি এবং তার রূপায়ণে বাধতে থাকতে পারে কিন্তু সরকারের আসল নীতিটা কি না জানলে তার গলদটাও খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। 'সচেতন জনমত' গণতন্ত্রের প্রহরী। আলাপ-আলোচনা পঠন-পাঠন না অনুশীলিত হলে আমরা তো অন্ধকার জগতের অধিবাসী হয়েই পড়ে থাকব। সেটা কি পাল মহাশয়ের কাম্য? তিনি উপসংহারে লিখেছেন 'কিন্তু তাতে একজন লোকেরও চোখ ফুটেছে বলে মনে হয় না।' এটা কি কোন সমীক্ষকের 'ধরণা' না তাঁর মনোক্তি? সরকারী প্রচার-যন্ত্রের ঢাক পিটিয়ে জনকল্যাণ আসে না সত্যি কথা কিন্তু জনস্বার্থে গণতান্ত্রিক দেশে সরকার লুকিয়ে চুরিয়েও কিছু করতে পারেন না। ভাল কাজে সরকারের সমর্থন এবং প্রয়োজনে খারাপ কাজে বিরোধিতাও তাঁরা করতে জানেন সুতরাং হতাশ হবার কারণ নেই।

বাবলুকুমার বণিক
বারোপাড়ী বাগান,
মাদিকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৯

'যোজনা' ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'যোজনা'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার:

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

গ্রাহকের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত যে কোন বইয়ে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাবলিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ও গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা:
যোজনা, পাবলিকেশন্স ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন: ২৩-২৩৭৬

সম্পাদক
শিশিরকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন দাস
উপ-সম্পাদক
ত্রিপথ চক্রবর্তী

ধনধান্য

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
অগ্রণী পাক্ষিক

১৭—৩১ বৈশাখ ১৩৮৫
১—১৫ মে ১৯৭৮
নবম বর্ষ : একবিংশ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

চৈত্র-বৈশাখের রিক্ততা ও রবীন্দ্রনাথ
ধরপ্রসাদ মিত্র ২

সরকারী কর্মনিযুক্তব্যবস্থার কয়েকটি দিক
বাসব দত্ত ৪

১৯৭৮-৮৩ সালের খসড়া পরিকল্পনা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিজস্ব প্রতিনিধি ৭

তুমি কবে আসবে ফিরে ?
কবিতা সিংহ ৯

সংবাদ ১২

অসংগঠিত শ্রমিকের সমস্যা
অশোক ঘোষ ১৩

ঘরে ঘরে দুর্গা গড়ে তুলুন
দুর্গা বসু ১৫

খেত খামার
সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ১৭

গ্রন্থ আলোচনা
অমর দাশ ১৮

শিল্প সংস্কৃতি
বীরেন সাহা ১৯
নির্মল বসু ২০

প্রাঙ্গণ
কেশবলাল দাস ২১

প্রচ্ছদশিল্পী—বলরামকৃষ্ণ লাখপত্র

সম্পাদকীয়

বর্ণভেদ থেকে মুক্তির উপায়

সম্প্রতি লোকসভায় হরিজন-নিগ্রহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্ক হয়ে গেল। পত্রিকান্তরে মুখর হয়ে উঠেছিল লোকসভা কক্ষ। যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হওয়া উচিত, সেগুলি নিয়েও যে এই ধরনের আলোড়ন সমালোচনা সরকারের বা কোন রাজনৈতিক দলের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, সেকথা সক্রিয় সহযোগিতার আবশ্যিকতা নিয়ে প্রতিবাদে আসতে হবে হরিজনদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে সরকারের হাত শক্ত করতে।

আইন পুনর্বহাল করার প্রশ্নটি হয়তো গৌণিক প্রশ্ন। হরিজনদের সঙ্গে সংঘর্ষের অনেক ঘটনার সূত্রপাত হয় তাদের অন্য নিয়ে। তাই সেপ্টেম্বর মাসেই প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠি লিখে বলেছিলেন যে হরিজনদের কাছ থেকে জোর করে অতি চিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাকে আদালতে বিচার্য অপরাধ বলে গণ্য করা হোক যাতে পুলিশ সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে। তিনি আরও সুপারিশ করেছিলেন যে হরিজনদের নির্যাতন বা তাদের উপর বলপ্রয়োগের যে কোন ঘটনা অবিলম্বে প্রতিরোধ করবার দায়িত্ব থাকবে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের উপর বজায় রাখার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এবং তাদেরকে এই ভূমিকা পালন করতেই হবে।

আইন পুনর্বহাল প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমস্যার প্রকৃত সমাধানের সূত্র রয়েছে অন্যত্র। আমরা জানি হরিজনদের নিয়ে যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে স্থিন যোগাচ্ছে বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষের মনোভাব যার শিকড় রয়েছে অতীতের সমাজে। এর মূলকারণের প্রশ্নটি মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক। হরিজনরা যতদিন উচ্চবর্ণের শোষণের দাস স্বীকার করে এসেছে ততদিন ঘন্দের কোন অবকাশ ছিল না। স্বাধিকারে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা বর্ণাভিমানী কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতায় নেমেছে। এই কায়েমী স্বার্থই তাদের অগ্রগতির পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে।

এই প্রতিরোধ যত তীব্রই হোক না কেন হরিজনদের অগ্রগতি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতেই হবে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাই তাদেরকে শক্তি ও সাহস যোগাবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষের মত বাঁচতে। সরকারের অর্থনীতির নব রূপায়ণে হরিজনদের আর্থিক উন্নয়নের উপর যে জোর আরোপ করা হয়েছে তার ফলে হরিজনদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।

সেই সঙ্গে সামাজিক স্তরে চালাতে হবে বর্ণ বিদ্বেষের মনোভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করতে। পাঁচ বছরের মধ্যে জেল থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করবার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন। সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ আইন বলবৎ করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করা। এই জনমত গঠনে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একাজে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সরকারও এদেরকে বর্ধিত হারে অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

চৈবৈশাখের রুক্ষতা ও রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ মিত্র

জিতের কবিতার প্রথম পর্বের কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে 'অবাক্তের বেদনা', 'অপরিস্ফুটের বাণীকুসুম', 'ভোলনের ভাষা' ইত্যাদি প্রসঙ্গ লিখেছিলেন। এবং 'নীহারিকার' সঙ্গে অপরিস্ফুট কবিতার সাদৃশ্যের কথা উঠেছিল সেই সূত্রেই—"যেমন নীহারিকাকে কবিতা বলা চলেনা কারণ তাহা সৃষ্টির একটা অবিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে কাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সম্ভাবনাই অপলাপ করা হয়।" আবার তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর বক্তব্য যে—"কুসুমকে লইয়াই বৃন্তের, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি"। এই উক্তিও 'জীবনস্মৃতি'।

তিনি যখন 'ছবি ও গান'-এর কবিতাগুলি লেখেন, তখন—"নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।" তাঁর কবিতার ধারায় ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারেবারে, একথা তিনি শেষ পর্বের এক কবিতার বইয়ের ভূমিকায় নিজেই জানিয়ে গেছেন। প্রথম জীবনে 'প্রভাতসংগীত'-এ একটি পালা শেষ হয়; 'ছবি ও গান'-এ আর এক পালার সূচনা ঘটে।

কিন্তু শেষ পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে পালাবদল যতোই ঘটুক চৈত্র-বৈশাখের রূপ তিনি একইভাবে উপভোগ করে গেছেন। সমাজ-সংসারের বিচিত্র সংঘাত ও সমস্যা ঘিরেও এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক অবসাদবোধ ঘটলেও বসন্ত ও গ্রীষ্মঋতুর উদ্দীপনা কোথাও মান হয়নি। 'পুনশ্চ'র 'কোপাই' থেকেই কথাটা শুরু করতে বাধা নেই। এই কবিতা লেখা হয় শ্রাবণ ভাদ্র, ১৩৩৯ সালে। সে তো শরৎকাল কিংবা বর্ষার শেষ। বর্ষা এবং শরৎ, দুই ঋতুতেই কোপাই-এর রূপ কেমন লাগে রবীন্দ্রনাথ তৎপ্রসঙ্গে লিখে গেছেন—

বর্ষার ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
রচনা-ছাওয়ালি গাঁয়ের মেয়ের মতো—

এবং—

শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
কাঁপ ধরে তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে
তখন শীর্ণ নদীরোতের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লক্ষ্মী দিতে পারেনা।

সেই ১৩৩৯-এর শ্রাবণেই ভরা বর্ষার দেখা হয় 'খোয়াই' কবিতাটি। কবে শরতের কোন্ দিনান্তে সূর্যাস্তের রং দেখেছিলেন তিনি খোয়াইয়ের "উমিলা লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়"-এর ওপর। শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও সে রঙ ভোলেনি। শ্রাবণের সেই রচনাতেই প্রকাশ হয়ে—

এই পথে বেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
খেপা ধাওয়ার বাঁশি সৈন্যের মতো,—

'শেষদান' কবিতাটি এই ভাদ্র লেখা হলেও তাতে কালো গোরু রিঠিভার কুকুর চেঙ্গির বর্ষাদিনের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর সেই একটা ফাল্গুনকে মনে পড়েছে, যখন বসন্তের সাথে মিলিমিশি খেলেনা। সেই গাছটিতে থরে থরে কিংশুক-বেগুনি ফুল ফুটে ওঠে—

পাত্র গেলনা দেখা,
যতই ঝরে ততই ফোটে
তাতে রাখল না কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় করে।
তার পরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।

এই রচনার পুলিন পরেই 'স্মৃতি' কবিতাটি লেখা হয়—যাতে পশ্চিম কোনো শহরের গ্রীষ্মঋতুর দৃশ্য—

দিনের তাপ আগলে আছে একলা অদ্ভুত
বাড়ি
চারিদিকে চাল পড়েছে ঝুঁকে।

এবং—

বুড়ো নিমগাছের তলায় উদাসী,
খোঁপা দিয়ে ফুল টেনে তোলে মালী।
তার কানুষনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ।
তার জলধারার চঞ্চল ভঙ্গীর থেকে।

গরম হাওয়ার ঝাপসাগন্ধ আসছে
মাঠের থেকে,
খবর আসছে মহানিমের বকুলীতে
বৌবাছির বসেছে মেলা।

তিনি লিখে গেছেন যে তাঁর কবিতার একটি মাত্রই পালা—সে হলো সীমা-অসীমের। কিন্তু নীচে বর্ষার শরতে দেবের সে পালা তো আছেই; আছে বসন্তে এবং গ্রীষ্মঋতুতেও। কিনু গোয়ালার গলির সেই নোতুন বাড়িটা অবশ্য বর্ষাকালের—বর্ষা যেন মোর! কিন্তু 'উদ্ভাতি'

কবিতাটি যদিও আষাঢ়ে রচিত তবু তাতে বসন্তের উল্লেখ আছে এবং সে বসন্ত মর্মান্তিক, সকলেই জানেন। অনেক কাহিনী আছে, বিখ্যাত 'শিবতীর্থ' আছে 'পুনশ্চ' বইটিতে। কিন্তু 'বিচিত্রিতা'র পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুকে সত্তর বছরের প্রবীণ গুরু রবীন্দ্রনাথ যে আশীর্বাদ করেছিলেন তাতে জানান—

নন্দনের পুষ্পতলে বরুণার ধারা,
অমর-আলো তাহার জলে তোমার আনে তারা।

সেই বারাঙ্গনে তিনি নিজেও কি স্নান করেন নি? প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপের মধ্যে সেই 'বিচিত্রিতা'তেই ১৩ই জৈষ্ঠ ১৩৩৪ সালে লেখা হয় 'স্যাকরা' কবিতাটি। তাতে বাইরের প্রকৃতির ছবি নেই, কিন্তু ভেতরের প্রেয়সীর জন্যে তপস্যার কথা আছে—

কার লাগি এই গহনা গড়াও
যতনভরে।
স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।

বলা বাহুল্য, বর্ষা-ই রবীন্দ্রনাথের সবাধিক প্রিয় ঋতু। কিন্তু শুধু 'কল্পনা'-র আমলের 'বৈশাখ' কবিতাতেই নয়, শেষ পর্বের 'শেষ সপ্তক'-এর ভিন্ন ধরনের আত্মগহনমুখী রচনাগুলিতেও কখায়-কখায় চৈত্র বা বৈশাখ এসে পড়ে,—উঁকি দিয়ে যায়,—যেমন দেখা যায় এগারো নম্বর কবিতাটিতে—

চৈত্রমাস ঠেকল এসে শেষ দুপুরে।
আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকার
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দুর্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ;
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি বৌসুমি চাষায়
ফুলগুলি বং হারিয়ে সংকুচিত।

এবং উদাসীনতার থেকেও বড় তাঁর শেষপর্বের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তেমনি তপস্যার প্রসঙ্গও। 'শেষ সপ্তক'-এর সাইত্রিশ নম্বর কবিতায় বিশ্বলক্ষ্মীকে সেই কথাই বলা হয়েছিল—

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে একক তপস্যায়
সূর্যের চরণতলে।
তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,
নিষ্ফল তোমার কেশপাশ।

তারপর যথারীতি—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যাদেরকে যেমন সাজিয়েছেন সেই তপস্যার পরে—

অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে দেখা চৈত্র-বৈশাখ অথবা শ্রাবণ-ভাদ্র,—আশ্বিন বা অগ্রহায়ণ কোনোটাই কিন্তু স্থিতির সংকেত নয়। 'বীথিকা'র 'মাটি' কবিতায় তিনি দেখেন—

আমার সকল খেলা, সব কাজে,
এ তুমি জড়িত আছে শাশ্বতের বেন সে লিখন।

কিন্তু কালের ঢেউ ভাঙছে কেবলি। মনে মনে মানুষ আসে। তারা তুমি অধিকার করে। কিন্তু—

হায় আমি,
হায় রে ভুবনী,
এখানে তুলিছ বেড়া,—উপাড়িছ রেখা সেই তুমি।
এ বাটিতে সেই রসে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে'—
এই বলি বসে পড়ি আমি-পুনা চিরকাল-তরে।

এই আমিহীন উদাসিনী তুমির মধ্যেই প্রাণের নির্ঝর, বেদনার অতলীন ধারা! শেষপর্বের স্মৃতিচারণে 'নির্ঝরণ' কবিতাটি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। কোন্ চিরবিস্মৃতা নায়িকাকে ডেকে চন্দননগরে ১৯৩৫-এর ১৪ই জুন তিনি লিখেছিলেন সেকথা :—

একদা চলেনা সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণায় নহে আবাহন।
বেতের ডালায় বেলফি-কদম-টাপা
অকলঙ্কিত আম এনো গোটাকত।

এ তো বিস্মৃতার রূপ নয়। পূর্ব নিবেদের কলধ্বনি লেগে রয়েছে এইভাষেই। যেন একটি অপরাজিতার মধ্যে দিয়েছে শৈলতটের অবগাহনের সুর শোনা যায়। তাঁর মনোগহনের চৈত্র-বৈশাখ মোটেই অবিমিশ্র রুক্ষ নয়। তাঁরই কথা দিয়ে বলা যায়—

মরুপথে জেগে পিপাসার সম্বল
পাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল।

'বীথিকা'তে বোধ হয় শেষপর্বের একটি বিশেষ পালা শেষ হয়। তারপর 'পত্রপুট' আর-এক পালার সূচনা।

সরকারী বন্টনব্যবস্থার কয়েকটি দিক

রাখাল দত্ত

আমাদের দেশে সরকারী তত্ত্বাবধানে ভোগ্যপণ্যের বণ্টনের ইতিহাস খুব বেশি পুরোনো নয়। বস্তুত ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার আগে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার তাৎপর্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের ছিল না। এই পরিস্থিতি তাই সরকারকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এনে ফেলে এবং এর পর থেকেই সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের বণ্টনও অন্তর্ভুক্ত হয়।

এক দিক দিয়ে দেখলে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে বিলম্ব কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসনের প্রায় গোড়া থেকেই খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ নিয়মিতভাবে এই উপমহাদেশে দেখা দিত। ১৮৭৬-৭৭ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের দু একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ্য। কমিশন বলেন যে ভারত সরকারকে প্রতি দশ বছরের মধ্যে অন্তত দুই বছর দেশের কোনও না কোনও অঞ্চলে খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রতি ১২ বছরে একবার ব্যাপক ও মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার আশঙ্কা বর্তমান এবং দেশের যে কোনও অঞ্চলে ১১ বা ১২ বছর পর পর ধরা দেখা দিতে পারে। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের মতামত যে কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তার প্রমাণ ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সময়েও আর একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন বসানো হয়েছিল।

যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে সরকার বিভিন্নভাবে ভোগ্যপণ্যের বণ্টনে হস্তক্ষেপ করেছেন। কখনও প্রয়োজনের তাগিদে এই হস্তক্ষেপের মাত্রা বা ব্যাপকতা বেড়েছে। কখনও বা সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের, সুষ্ঠু বণ্টন আজ সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্বের অন্যতম বলে স্বীকৃত। বিশেষ করে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পটভূমিকায় এ ধরণের বণ্টনব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যক পণ্যের সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করতে চান। মূলতবি বিরতি বজায় রাখার সরকারী প্রয়াসের একটা মূল্য আজ ছিসেবেই আজ সরকারী বণ্টনব্যবস্থাকে দেখা হচ্ছে। গোড়ায় খাদ্যশস্য ও চিনির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা ন্যায্য মূল্যের দোকানে বা রেশনের দোকানের মধ্যে সীমিত ছিল। কোনও কোনও অঞ্চলে অবশ্য কেরোসিন তেলের বিক্রিও এই ব্যবস্থার আওতায় পড়ত। আজ আরও বেশি সংখ্যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরকারী বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে বিলি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগটি স্থাপিত হওয়ার পর এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। আজ তাই আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা সমতা আনা আপেক্ষিকভাবে সহজ। যেমন, ১৯৭৬-৭৭ সালে নিত্যব্যবহার্য কেরোসিন, কোক কয়লা, সিমেন্ট ইত্যাদির সাময়িক অভাব ধরা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদকদের কাছ থেকে সরবরাহ নিশ্চিত করে এই সমস্যার মোকাবিলা করা গেছে। সরকার অন্যভাবেও দেশের মধ্যে অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ বাড়াবার চেষ্টা করছেন। গত কয়েক বছর ধরে আলু ও পেঁয়াজের রপ্তানি বেড়ে যাবার ফলে এই দুটি আনাজের দাম বেড়ে যাচ্ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার আলু ও পেঁয়াজের রপ্তানি সীমিত করার ফলে কিছুটা সুফল দেখা দেয়। চায়ের কথাই ধরা যাক না কেন। রপ্তানি বাজার অসাধারণ ভাল হওয়ার জন্য চায়ের দাম গত দু বছর ধরেই বাড়ার মুখে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি কিলোগ্রাম চায়ের উপর ৫ টাকা করে রপ্তানি শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে ও প্যাকেটের চা প্রস্তুতকারী দুটি বড় কোম্পানীকে দাম কমাতে রাজী করিয়ে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পেরেছেন। বস্তুত, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একটা নির্দিষ্ট নীতি মেনে নিয়েছেন। নীতিটি এই যে দেশের ভোক্তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে সরকার অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য রপ্তানি করতে দেবেন না। অল্পদিন হল ডালডা ও ঘিয়ে রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং চাল, চিনাবাদাম ও কয়েক রকম খেলের রপ্তানিতে নিষেধ বজায় রাখা হয়েছে। তিল রপ্তানির খেলায়ও বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

একদিকে যেমন অত্যাবশ্যক পণ্য রপ্তানিতে বাধানিষেধ প্রয়োগ করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই ন্যায্য তেল, তুলো, কৃত্রিম তন্তু ইত্যাদি জিনিস আমদানি করে আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৬২ লক্ষ মেট্রিক টন ন্যায্য তেল আমদানির কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন তেল আমদানি করা সম্ভব হয়েছিল। বেসরকারী খাদ্যশস্যদেরও ন্যায্য তেল আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং এই সূত্রেও ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন ন্যায্য তেল আমদানি করা হয়েছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে। কাজেই ঐ সময় মোট প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ন্যায্য তেল আমদানি করা হয়েছিল। ১৯৭৭-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৮-এর অক্টোবর

পর্যন্ত সরকারী সূত্রে রান্নার তেল আমদানির পরিমাণ কেন উঁচু স্তরেই রাখতে হবে। কারণ, সরকার বনস্পতি শিল্পের তেলের প্রয়োজনের শতকরা ৭৫ ভাগ মেটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাছাড়া, পর পর দু'বছর সরষের উৎপাদন মার খেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই পরিমাণ রেপসিড তেল আমদানি করেছেন এবং প্রতি টন রেপসিড তেলে ১০০০ টাকা করে শুল্কভূর্কি দিয়ে কিলোগ্রাম প্রতি ৭.৫০ টাকা দরে তা বিক্রি করেছেন। সম্প্রতি এ দাম আরো কমাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিভিন্ন ভোগ্য-পণ্যের বেলায় আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিই এসব জিনিসের দাম সিমিতের মধ্যে রাখার সর্বপ্রধান দীর্ঘ মেয়াদী হাতিয়ার। ঠিক এই মুহূর্তে খাদ্যশস্যের সরবরাহের অবস্থা আপেক্ষিকভাবে সন্তোষ-জনক। কিন্তু ডাল, তৈলবীজ ও কয়েকটি মসলার ক্ষেত্রে অভাব প্রকট এবং তুলো ও পাটের বেলায়ও মাঝে মাঝে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। এই সব পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে না পারলে, শুধু সরকারী বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে খুব বেশি সাফল্য অর্জন করা যাবে বলে মনে হয় না।

খাদ্যশস্যের সরকারী বণ্টনের সঙ্গে সরকারের সংগ্রহনীতিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সরকারী বণ্টনব্যবস্থা অতদিন ধরে বিদেশ থেকে আমদানি খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করত। আমাদের সৌভাগ্য গত কয়েক বছর ধরে এই নির্ভরতা ক্রমেই কমে আসছে এবং আপাতত খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৭৭-৭৮ সালের ধান মরসুমের জন্য কৃষি মূল্য কমিশন ধানের সংগ্রহমূল্য প্রতি কুইন্টাল ১০৫ টাকা বজায় রাখার সুপারিশ করেন এবং ধানের সংগ্রহমাত্রা নির্ধারিত করেন ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকার ধানের ক্রয় মূল্য বাড়িয়ে ১১০ টাকা করেন এবং সংগ্রহ-মাত্রা তুলে দেন। একই সঙ্গে সরকার ধানের চলাচলে সব রকম বাধানিষেধও তুলে দেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের বর্তমান নীতি বাধ্যতামূলকভাবে খাদ্যশস্যের সংগ্রহের বিরুদ্ধে। ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংগ্রহ সংস্থা উৎপাদকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ১১০ টাকা করে ধান কিনতে বাধা থাকবেন ঠিকই। কিন্তু উৎপাদকদের উপর কোনও রকম লেভি থাকবে না। তাঁরা যা বিক্রি করবেন তার সবটাই হবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। ধানের বেলায় এই নতুন নীতি খুবই সফল হয়েছে। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারীর শেষ নাগাদ প্রায় ৫২ লক্ষ মেট্রিক টন ধান এই ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে উৎপাদকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ধান সংগ্রহ করেও একই সময় ৬৬ লক্ষ টন ধান পাওয়া যায়।

ধানের বেলায় কৃষিমূল্য কমিশন ১৯৭৭-৭৮ এর জন্য সংগ্রহ মূল্য প্রতি কুইন্টাল ৭৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৭ টাকা করেন। একই সঙ্গে কমিশন সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও ঠিক করেন ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকার ধানের দামের বেলায় কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কোনও সংগ্রহমাত্রা নির্ধারণ করেন নি। অবশ্য গমের মত ধান ও অন্যান্য পরিমিত পণ্যের অবাধ আন্তরাজ্য চলাচল অনুমোদন করেছেন। সরকারের এই নীতি নিয়েও গোড়ার দিকে কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। অন্ধ্রের ব্যাপক খরাপীড়িত ঐ রাজ্যের অধিক পরিমাণ ধান বাইরে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সব মিলিয়ে সংগ্রহ বেশ ভালই হয়েছে। ১৯৭৮ এর ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে ৩০ লক্ষ ৭ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে লেভি থাকা সত্ত্বেও একই সময়ে চাল সংগ্রহ করা গিয়েছিল ৩০ লক্ষ ৩ হাজার মেট্রিক টন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন রাজ্যের মধ্যে ধান চালের চলাচলে বাধানিষেধ তুলে দেওয়া ঠিক নয় এবং লেভি প্রথাও রাখা উচিত। কিন্তু এসব ব্যবস্থা বজায় রাখা সত্ত্বেও এবছরে পশ্চিমবঙ্গে ধানের উৎপাদনে বেকর্ড হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যে সংগ্রহের পরিমাণ শোচনীয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মাত্র ১½ লক্ষ মেট্রিক টনের মত চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

চাল ও গম উভয়ক্ষেত্রেই সরকার কিন্তু ঐ দুই পণ্যের 'ইস্যু' মূল্য (যে দামে সরকারী বণ্টনব্যবস্থাকে এই দুই পণ্য দেওয়া হয়) অপরিবর্তিত রেখেছেন। একটা বিরাট ভর্তুকির মাধ্যমেই এই দাম অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব। গত কয়েক বছর এই ভর্তুকির পরিমাণ বছরে ৫০০ কোটি টাকার মত দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকান বা রেশন দোকানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও চিনি বণ্টন করা হয়। সরকারী ভাণ্ডার থেকে যে খাদ্যশস্য বিলি করা হয় তার পরিমাণ কিন্তু একেক বছর একেক রকম হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সরকারী মজুত থেকে ৯০ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য তোলা হয়েছিল। এই পরিমাণ তিন পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন কম। ১৯৭৫-৭৬ সালেও খাদ্যশস্য আমদানি হয় এবং ভাল সংগ্রহও হয়েছিল। ফলে ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে খাদ্যশস্যের মোট মজুতের পরিমাণ হয়েছিল ১ কোটি ৭১ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৭৭ সালের মার্চে ঐ পরিমাণ আরও বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টনে। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৭-এর অক্টোবর পর্যন্ত সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ১ কোটি ১১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বণ্টন করা হয়েছে। আগের বছরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।

খাদ্যশস্য মজুত ও বণ্টনের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও একটা সমস্যা অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। দেশের এই বিরাট খাদ্য[illegible]

ভাণ্ডারে একদিকে যেমন নিরাপত্তাবোধ এনে দেয়, অন্যদিকে তেমনই কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি করে। একটি সমস্যা এই খাদ্যসম্ভার ঠিকমত মজুত করা নিয়ে জড়িত। প্রয়োজনের তুলনায় মজুত ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। খাদ্যশস্যের মজুতও যথেষ্ট ব্যয়বহুল। কাজেই আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন ঠিক কতটা খাদ্যশস্য মজুত করা আমাদের আর্থিক সামর্থ্যের অনুকূল। কারণ, অহেতুক মজুত করার ক্ষেত্র বাড়ানোও যুক্তিযুক্ত নয়।

সরকারী বণ্টনব্যবস্থার আর একটি দিকও তুলে ধরা দরকার। এ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার শহর ও শিল্পাঞ্চলেই বেশি বাস্তবায়ন হয়েছে। এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকতর সোচ্চার ও জাতীয় রাজনীতিতেও এদের প্রভাব বেশি। কিন্তু দেশের দরিদ্রতর অংশ সাধারণভাবে গ্রামেই বাস করে। সরকারী বণ্টনব্যবস্থার সুবিধা এদের মধ্যেও সম্প্রসারিত করতে হবে। এই দিকে সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। ঐ রাজ্যে ৩ হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকান এরই মধ্যে গ্রামাঞ্চলে খোলা হয়েছে।

একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। দেশের দরিদ্র শ্রেণীর কাছে অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বড় সমস্যা নয়। কারণ কোনও দামেই তাঁরা এসব জিনিস কিনতে পারেন না। তাঁদের ক্রয় সমস্যা আছে। যতদিন না সাধ্য বজায় করে ক্রয়ক্ষমতার ব্যবস্থা করা যায় ততদিন শুধু সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে তাঁদের উপকার করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের ভেবে দেখতে হবে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যেসব গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করতে রাজ্যসরকারগুলিকে সাহায্য করছেন সেগুলির সঙ্গে সরকারী বণ্টনব্যবস্থার সংযুক্তি সম্ভব কী না। যেখানে এ ধরনের কাজ চলছে সেখানে একটা ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা যেতে পারে।

যাই হোক যে কোনও উপায়েই সরকারী বণ্টনব্যবস্থাকে গ্রামমুখী করে তুলতে হবে। সরকারী বণ্টনব্যবস্থায় ভরতুকির পরিমাণ কীভাবে কমিয়ে আনা যায় তা নিয়ে চিন্তা করারও সময় এসেছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটিও রয়েছে। এসব ত্রুটির ফলে অপচয় হচ্ছে প্রচুর।

সুখের কথা ভারত সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে যথোপযোগী বণ্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছেন। সম্প্রতি আন্তর্বিভাগীয় সমন্বয়ের এবং সমবায় মন্ত্রক বিভিন্ন অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে একটি প্রকল্প রচনা করেছেন। এই প্রকল্পে উৎপাদন, সংগ্রহ, পণ্য গুদামজাত করা, পণ্যের পরিবহণ ও বণ্টন সব দিকেই নজর দেওয়া হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কাছে অত্যাবশ্যক পণ্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করে তোলা। প্রকল্পটির মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গুচ্ছে দুয়টি অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য বর্তমানে পথবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টিত হবে। এই পণ্যগুলো হল, গম, চাল, চিনি, কেরোসিন, ভোজ্যতেল, ছাপড়চোপড় এবং মালানী। পরে সাইকেল-এর টায়ার, টিউব, কাগজ ও কয়েকটি নির্বাচিত শিল্পজাত পণ্য এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে।

এই সব পণ্য সংগ্রহ করে সরকার নিজ বাজারে ছাড়া হবে। যতদূর সম্ভব অপচয় কমিয়ে আনার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হবে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক পণ্য বণ্টনের বর্তমানে যে সুযোগসুবিধা রয়েছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শহরাঞ্চলে ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডারের সম্প্রসারণ এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে সমবায়ের কাঠামোর প্রসারের মধ্য দিয়ে আরও সার্থকভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বণ্টন হবে। সরকার চলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়েও একাজ করা যেতে পারে। প্রতি ২০০০ অধিবাসীর জন্য অন্তত একটি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি যাতে লাভজনক হয়ে উঠতে পারে সেজন্য নিম্নতম বিক্রয়ের পরিমাণ ও বিভিন্ন ধরণের পণ্য বিক্রয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য নির্ধারিত করে দেবার কথা ভাবা হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা এই প্রকল্পের সঙ্গে ক্রেতাদের জড়িত করার চেষ্টা করা হবে। এভাবেই তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা সম্ভব। ক্রেতারা সতর্ক থাকলেই বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে।

বণ্টনের স্থায়ী বন্দোবস্তের উপর জোর দেওয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। এ দেশে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান আগামী কয়েক বছর থাকবে তা নিশ্চিত। কাজেই এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন স্থায়ী বন্দোবস্ত। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হয়েছে সমবায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় সমিতিগুলিকেও এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে প্রস্তাবিত প্রকল্প কতদূর সফল হবে তা বলা শক্ত। তাহলেও একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে অত্যাবশ্যক পণ্যের সুষ্ঠু বণ্টনে এই ব্যবস্থা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যক পণ্য সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব স্বীকার করলেন এবং অন্যদিকে এই উদ্দেশ্যে একটা স্থায়ী ব্যবস্থার কথাও ঘোষণা করলেন।

১৯৭৮-৮৩ সালের খসড়া পরিকল্পনা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

[redacted] নিজস্ব প্রতিনিধি

পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে ১৯৭৮-৮৩ সালের খসড়া পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন গত মার্চ মাসে। এই খসড়া পরিকল্পনায় মোট ১,১৬,২৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। তার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ ৬৯,৩৮০ কোটি টাকা। এই খসড়া পরিকল্পনায় অগ্রগতির হার ধরা হয়েছে শতকরা ৪.৭ ভাগ, এবং আশা করা হয়েছে পরিকল্পনাকালের শেষে ৫.৫ শতাংশ হারে অগ্রগতি সম্ভব হবে। পঞ্চম পরিকল্পনায় অগ্রগতির হার স্থির হয়েছিল শতকরা ৪.৩৭ ভাগ, কিন্তু ঐ পরিকল্পনার চার বছরে গড় হার দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৩.৯ ভাগ।

নতুন উন্নয়ন-কৌশল

পূর্ণ কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যদূরীকরণ ও সমধর্মী সমাজ গঠনের যে লক্ষ্য স্থির হয়েছে, সেই লক্ষ্যাভিমুখে এই পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সেই কারণে, খসড়া পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হল, দশ বছরের মধ্যে (১) বেকারী এবং লক্ষণীয় আধা-বেকারি দূর করা, (২) সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রণের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা এবং (৩) এই শ্রেণীর মানুষের কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা করা, যেমন—পরিষ্কার পানীয় জল, বয়স্ক সাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, পল্লী-সড়ক, পল্লী-অঞ্চলে ভূমিহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ এবং শহরাঞ্চলের বস্তিগুলির জন্য ন্যূনতম সুখসুবিধা বিধানের ব্যবস্থা।

এইসব প্রাথমিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (১) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির হার আগের চেয়ে বাড়ানো হবে, (২) আয় ও সম্পদের মধ্যে বর্তমান বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হবে এবং (৩) আত্মনির্ভরতার পথে দেশের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সুনিশ্চিত করা হবে।

এইসব লক্ষ্যপূরণে পরিকল্পনায় চারটি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে—কৃষি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, অখণ্ড পল্লী উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা, এবং ন্যূনতম চাহিদা পূরণ।

পরিকল্পনার কাঠামো

১৯৭৮-৮৩ সালের পরিকল্পনার মোট আয়তন ১,১৬,২৪০ কোটি টাকা। তার মধ্যে সরকারী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৬৯,৩৮০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গোটা পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৯.৭ ভাগ। খসড়া পরিকল্পনাকে পল্লীমুখী করা হয়েছে। পল্লী-উন্নয়ন ও কৃষি-উন্নয়ন খাতে খাতে পরিমাণ ধরা হয়েছে মোট পরিকল্পনা-ব্যয়ের শতকরা ৪৩.১ ভাগ। পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লী-উন্নয়নে মোট যত টাকা খরচ করা হয়েছিল, এই পরিকল্পনায় হবে তার প্রায় দ্বিগুণ।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১২ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন, তৈলবীজের উৎপাদন ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১ কোটি ১২ লক্ষ মেট্রিক টন আর তুলোর উৎপাদন ৬৪ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁট থেকে বেড়ে ৮১ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁট হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ধরা হয়েছে শতকরা ৩.২৮ ভাগ, শিল্প ও খনিজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ৬.৯২ ভাগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি শতকরা ১০.৮০ ভাগ, নির্মাণ শিল্পের বৃদ্ধি শতকরা ১০.৫৫ ভাগ, পরিবহণ বৃদ্ধি শতকরা ৬.২৪ ভাগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শতকরা ৬.০১ ভাগ।

খসড়া পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, ১৯৭৮-৮৩ সালে মাথাপিছু ভোগ্যপণ্য ব্যবহার বাড়বে শতকরা ২.২১ ভাগ হারে, এবং ১৯৮৩-৮৮ সালে এই বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে শতকরা ৩.১৮ ভাগ। ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট দেশীয় উৎপাদনের অনুপাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১৯.৮ শতাংশ, ১৯৮২-৮৩ সালে এই পরিমাণ বেড়ে ২৩.৪ শতাংশ হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৮২-৮৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে ৭,৭৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান।

কর্মসংস্থান

খসড়া পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বলা হয়েছে (১) বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসৃষ্টিকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, (২) কর্ম সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রাযুক্তিক পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা হবে, এবং (৩) পূর্ণ কর্মনিয়োগের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেচ-পুষ্ট কৃষির সম্প্রসারণ এবং গোপালন, বনপালন ও মৎস্যপালন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বেশ কিছু অতিরিক্ত কর্মসৃষ্টি হবে। সড়কনির্মাণ, বৈদ্যুতীকরণ, জল-সরবরাহ, পল্লী-বিদ্যালয় ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য কৃত্যকের সম্প্রসারণ এবং দরিদ্রদের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বাড়িয়েও এই পরিকল্পনায় বেশকিছু কর্ম সৃষ্টি করা যাবে। দরিদ্রদের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বাড়লে অতিরিক্ত কর্ম সৃষ্টি হবে, কারণ তখন ঐসব পণ্য এমন পদ্ধতিতে

প্রস্তুত করা যাবে, যাতে শ্রমিকের দরকার হয় বেশি।

সেচ, বিদ্যুৎ ও গৃহনির্মাণ কার্যক্রমেও কাজের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে এবং তাতে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

চিনিশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের যে-সব কারখানা নির্মাণাধীন সেগুলোতে কী ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তা চিন্তা করা হচ্ছে এখন। যেখানে উপযুক্ত বিবেচিত হবে সেখানে শ্রমিক-ভিত্তিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে উৎসাহ দেওয়া হবে। এইসব উৎসাহ ব্যবস্থার একটি হচ্ছে, গৃহনির্মাণ ও কুটিরশিল্পের জন্য কতকগুলি পণ্যের উৎপাদন সংরক্ষণ, এবং তাতে উৎপাদন শুল্কের ব্যাপারে সুবিধা দেওয়া হবে। এইসব ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে ৪,৯২,৬০,০০০ মনুষ্য-বর্ষের কর্ম সৃষ্টি হয়। এর ফলে ১৯৭৮-৮৩ সালের মধ্যে যে তিন কোটি নতুন শ্রমিক তৈরি হবে সেই শ্রমিকদের ও আগের বেকার শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশকে নিয়োগ করা যাবে।

ন্যূনতম প্রয়োজনের সংশোধিত কর্মসূচী

পঞ্চম পরিকল্পনার ন্যূনতম প্রয়োজনের কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনার এই কর্মসূচীতে বাস্তবরূপ ছিল ৮০০ কোটি টাকা, এই পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে ৪,১৮০ কোটি টাকা। ন্যূনতম প্রয়োজনের পূর্ব-তালিকার ছিল—পানীয় জল সরবরাহ, গৃহহীনদের বাস্তুজমি দানের ব্যবস্থা, গ্রামের প্রবেশপথ তৈরি, পল্লী-অঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী-স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা, পল্লী-বৈদ্যুতীকরণের সম্প্রসারণ, বস্তি-পরিবেশের উন্নতি-সাধন এবং জনের শরীরে পুষ্টির অভাব আছে তাদের সেই অভাব মেটানো। এখন এই পরিকল্পনার আর-একটি বিষয় যোগ হয়েছে—বয়স্ক শিক্ষা। এই কার্যসূচীর বিষয়গুলি হচ্ছে—

(ক) **প্রাথমিক এবং বয়স্ক শিক্ষা :** এই পরিকল্পনায় প্রায় তিন কোটি কুড়ি লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাতে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার হার ৬৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯০ শতাংশ হবে। দেশের ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স লোকদের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি লোক এখন নিরক্ষর। তাদের মধ্যে অন্তত ৬ কোটি ৬০ লক্ষ লোককে যাতে এই পরিকল্পনার সময়-সীমার মধ্যে সাক্ষর করা যায় তার জন্য চেষ্টা করা হবে।

(খ) **পল্লী স্বাস্থ্য :** যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্রতি এক হাজার লোকের জন্য যাতে একজন সর্বক্ষণ স্বাস্থ্যকর্মী ও একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাই নিয়োগ করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। যেসব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন নির্মাণ বাকি আছে সেগুলি এই পরিকল্পনার মধ্যেই শেষ করা হবে, অধিকন্তু প্রতি ব্লকে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নতুন ৩৮,০০০ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে। এছাড়াও ৪০০ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে উন্নীত করে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করা হবে।

(গ) **পানীয় জল :** আগের এক হিসাবে দেখা গিয়েছিল, এক লক্ষ গ্রামে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। এই পরিকল্পনায় ঐসব গ্রামে সে ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) **পল্লী সড়ক :** যেসব গ্রামের লোকসংখ্যা দেড় হাজার বা তার বেশি সেইসব গ্রামকে এবং যেসব গ্রামের লোকসংখ্যা এক হাজার থেকে দেড় হাজার সেইসব গ্রামের অর্ধেককে নতুন সড়ক নির্মাণ করে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে, বাকি অর্ধেককে করা হবে পরবর্তী পাঁচ বছরে।

(ঙ) **পল্লী বৈদ্যুতীকরণ :** পল্লী বৈদ্যুতীকরণের বর্তমান ব্যবস্থা জোরদার করা ছাড়াও প্রতি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শতকরা অন্তত ৪০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার জন্য যে পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেই কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ গ্রামকে বৈদ্যুতীকরণ করা হবে।

(চ) **গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়ন :** পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রায় ৭০ লক্ষ ভূমিহীন শ্রমিককে বাস্তুজমি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই জমিতে বাড়ি তৈরির জন্য কোনো অর্থসাহায্য দেওয়া হয় নি। এই পরিকল্পনার মধ্যে এখন একটা পরিকল্প আছে, যাতে প্রায় ৮০ লক্ষ ভূমিহীন শ্রমিক উপকৃত হবে। ঐ পরিকল্পে উদ্বৃত্ত বাস্তুজমি, প্রতি ৩০ টি ঘরের জন্য একটি করে পানীয় জলের কল, জনাময়-ব্যবস্থা এবং গৃহনির্মাণের সামগ্রী কেনার জন্য কিছু সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে। শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ কর্মসূচীতে বস্তি-উন্নয়নের ফলে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ বস্তিবাসী উপকৃত হবে, আরও যে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ বস্তিবাসী থেকে যাবে তারা উপকৃত হবে পরবর্তী পরিকল্পনায়। আর্থিক দিক দিয়ে যারা দুর্বল, তাদের গৃহনির্মাণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে, বিশেষ করে ছোটো ছোটো শহরে। শহর-উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল কথা হ'ল, ছোটো ছোটো শহরগুলির উন্নতি সাধন করা ও বড়ো বড়ো শহরের ভিড় কমানো।

(ছ) **পুষ্টি :** যেসব শিশুর শরীরে পুষ্টির অভাব রয়েছে তাদের মধ্যাহ্ন-আহার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এবং না ও কোলের শিশুদের অতিরিক্ত পুষ্টি কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। তবে যেসব ব্লকে তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতির সংখ্যা অধিক সেইসব ব্লকই এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

তুমি কবে আসবে ঝিনুক? কবিতা সিংহ

কলেজ স্ট্রীটের রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কমলেশের সঙ্গে। প্রদীপ অবাক হয়ে তার আপাদমস্তক শুধু দেখলই। পরণে চকচকে চৌবিদিদেরকম স্যুট, হাতে পোর্ট-ফোলিও, গালে চকচকে দাড়ি কামানোর লাবণ্য। মুখে একটা বনমহ সেলফ্‌স্যাটী হাসি।

কফি-হাউসের টেবিলে বসে বসে এই ধরণের লোকজনকে দেখলে তারা, মানে বছর দেড়েক আগে ওই কমলেশ তারই—বোকা বোকা বলে বেশ জানিয়ে জানিয়েই আওরাজ দিত।

কিন্তু একথা তো মানতেই হবে যে বছর খানেক বছর দেড়েক চলে গেছে। এবং হাওড়ার ব্রীজের তলা দিয়ে গঙ্গার অনেক অনেক জল। জানা গেছে পৃথিবীতে কফি-টেবিলের রাজারা কিন্তু এখন শাশ্বত নয়। ওখান থেকে বল ছুঁড়ে দিলে তা খুব এখন দেওয়ালের চৌহদ্দির বাইরে যায়না। সত্তিকারের হাঁটাচলা, রাত্রি-খাওয়ার পৃথিবীর বাইরে কফি-হাউসটা নেহাতই একটা যৌবনকালের স্বপ্ন হয়ে হয়ে থাকে।

প্রদীপের বাক্যস্ফূর্তি হবার আগেই কমলেশ বলল,—আরে প্রদীপ না? কিরে তোকে এত গাঁইয়া গাঁইয়া লাগছে কেন? পোড়া মোদ পোড়া চেহারা? কি করছিস এখন?

নিজের কথা চট করে মনে পড়ে গেল প্রদীপের। শহরতলির একটা কলেজে অধ্যাপনা করে। কষ্ট হয়। খুব কষ্ট হয়। তা-ও কলকাতার ছোঁয়াটুকু বজায় রাখার লোভে ভেলি প্যাসেঞ্জারী করে। হয়তো পেশা আর পরিবেশ তার ওপরও আলাদা ধরণের ছাপ্ ফেলেছে—বলল,

—আমিতো একটা মফস্বল কলেজে মাস্টারি করি, তুই?

একটা বড় কার্ডের নাম করে কমলেশ বলল অ্যাসিস্টেন্ট পি. আর. ও.। খুব খাটুনি, বুঝলি। তারপর জলের মত চোখের তারা দুটিকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল,—কিন্তু খুব স্যাটিসফ্যাক্‌শন আছে। তা, তুই কি, সেই রকমই না কোথায়? সেখানেই থাকিস?

—না, না, কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি—

—কেন? খানোখা এত কষ্ট করিস কেন? ওখানেই থাকবি। বেশ ভারিক্কী চালেই কথাটা বলল কমলেশ।

কমলেশ কফিহাউস গ্রুপের খুব একটা উজ্জ্বল সঙ্গী ছিল না। তবু, না পাওয়া যায় তাই, এই ভেবেই প্রদীপ বলল,

—চলনা, একটু কফি-হাউসে গিয়ে বসি।

—কমলেশ ভুরু তুলে চোখ ঘুরিয়ে বলল—পাগল, লোভ লাগে কিন্তু সময় নেই ভাই, সরি। আর একদিন হবে। বিয়ে করেছিস? করিসনি—আমি কিন্তু করেছি ভাই। বৌ-টা বড্ড একটু বাচ্চা হয়ে গেছে—কি আর করা যায়? প্রদীপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কমলেশ এগোলো।

প্রদীপ একটু পুরোনো বই-এর দোকানে বই ঘেঁটে একটা ভিড়ের বাসে উঠে পড়ল।

সত্যি সত্যিই আর পোষায় না। প্রথমত আজকাল কফি হাউসে গেলে একটা চেনা মুখ দেখা যায়না। সব নতুন নতুন। দু-একটা আছে সেগুলো ভ্যাগা-বণ্ড, নির্করা। প্রদীপদের আগেও ছিল প্রদীপদের পরেও আছে, কেবল বিনে পয়সায় কফি-সিগারেটের বাসা।

আর সেই সব মেয়েরা?—সরস্বতী উজ্জ্বল মেয়েরা? কোথায় গেল তারা? রত্না, পারিজাত, দীপ্তি, শুক্লা? কি সব রকমকে কথা বলত,—কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত সাজত। আসলে প্রদীপের কোনো বোন টোন ছিল না বলে মেয়েরা চিরকালই ওর কাছে রহস্যের একটা প্যাকেটের মত। যেন খুললেই কতসব অদ্ভুত ব্যাপার ফাট উঠতে থাকবে।

মনে আছে সে সব দিনে, আড্ডা ভেঙে নানারকম বিষয় নিয়ে ঝগড়া তর্ক করতে করতে, প্রদীপরা যখন বাড়ি ফিরত কফি-হাউস থেকে, তখন অনেক রাত পর্যন্ত, অনেক বিনিদ্র মুহূর্ত পর্যন্ত প্রদীপের মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ফিরত অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছবি। হয়তো কোনো মেয়ের হঠাৎ একটা ভঙ্গী, কারো লিপষ্টিক মাখানো ঠোঁট, কারোবা কাঁধে লুটিয়ে

পড়া এলোবেলো শ্যাম্পু চুল। কি সুন্দর সব দিন ছিল সেইসব। যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে প্রদীপ; যখন ডাইরেক্টর ইলা বিশার্ট করছে—আর নিরবিচ্ছিন্ন নায়ার ভূমিকা নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে কফি-হাউসের টেবিল জাঁকিয়ে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল প্রদীপ। মানুষ বোম্বাই বাসটা যখন বেশ একটা ঝাঁকানি দিয়ে মোড় ঘুরল তখন হুহু করে প্রদীপ ভাবল, না, যেখানে কলেজ সেখানেই সারা দুপুর থেকে যাওয়া ভালো। ইচ্ছে হলে শনি রবিবার কলকাতায় আসবে। দাদা বৌদিকে বার বার বলছে—পালোধা যাদবপুরের ফ্ল্যাটটা পুষে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। প্রদীপ যদি ওর সঙ্গে থাকতে না চায়, বা না হয় দাদা বৌদির কাছেই থাকবেন। মা-ও খানিকটা ছাড়ফট করেন বৈকি। দারোয়ান দিন প্রদীপের জন্যে একা একা ফ্ল্যাট আগলে বসে থাকা। ওদিকে একটু দূরেই দাদার ছোট্ট বাড়ি, নাতি-নাতনি। প্রদীপের বিয়ে না হলে মা বড় ছেলের কাছে গিয়ে থাকতেও পারছেন না। আজ দু-বছর হয়ে গেল প্রদীপের আর বিয়ের কথার সবরটই হচ্ছে না। আসলে প্রদীপ মাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছে না যে সাজানো গোছানো পাত্রীদের দেখলে তার গা গুলিয়ে ওঠে। মেয়েগুলো সামনে এসে বসে যখন নিজেদের গুণপনার ফিরিস্তি দিতে থাকে তখন প্রদীপের ঘেন্না করে।

আসলে, মা রত্না, পারিজাত, দীপ্তি বা তরুর মতোদের তেমন দেখেনি। দেখলে বুঝতে মেয়েরা আর সেই জন্য থেকেই বিবাহের জন্য বলি প্রথম ধরণের নেই। বুঝত প্রদীপ এই দুবছর বিয়ে এড়াচ্ছে কোন স্বপ্ন চোখ নিয়ে।

কিন্তু আজ কমলেশকে দেখার পর প্রদীপের ভিতরে কেমন একটা ভয় উঁকি দিতে লাগল। যদি রত্না, পারিজাত, দীপ্তি বা তরুরও অমনি—কমলেশের মত, —যেমন দেখেছে, তার চেয়ে অন্য আলাদা রকম হয়ে যায়?

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দরজার বেল টিপতেই একটি ডাগর বয়সী মেয়ে দরজা খুলে দিল। আলোটা পিছন দিকে বলে ছায়াময়ী মেয়েটিকে সহসা চিনতে পারল না প্রদীপ। তখন কুলকুল করে হেসে উঠল সে।

—চিনতে পারলেন না প্রদীপ দা। আমি ঝিনুক—এবার চিনতে পারল প্রদীপ। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের ভাগ্নি। অল্প পাড়াগাঁয়ে থাকে। বোধহয় হায়ার সেকেণ্ডারির পর আর পড়ে টড়েনি। চারমাস ছমাস অন্তর অন্তর কলকাতায় আসে। পাত্রী হয়ে নিজেকে দেখাতে। পরপর কদিন দেখিয়ে ফিরে যায়। প্রতি বারেই আশা করে ছেলেরা একটা পছন্দের চিঠি পাবে। কিন্তু কোনো চিঠি পত্তর যায়না। সুতরাং ঝিনুক আবারও আসে।

প্রদীপ বলল,—কি এবার কটা সিটিং দিচ্ছ—

—তিনটে।

আবার হাসল ঝিনুক। বার বার তো কলকাতায় আসা সম্ভব নয়—আর মা ওই কাগজ দেখে দেখে ছাটাই করে তিন চারটে পার্টির সঙ্গে একবারে যোগাযোগ করেন। যাতে আমার বাড়ি এসে সবগুলোকেই পরপর ডাকা যায়। বলুন প্রদীপদা কোনো রকমে একটা মেপে ফেলেই তো রাণী। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঝিনুক বলল,—আমিও বাঁচি মা-ও বাঁচেন।

প্রদীপ নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—কিন্তু ঝিনুক যদি পছন্দ না হয় তোমাকে ওই অত সাজগোজ, সবর নষ্ট, এত সব সত্ত্বেও রসগোল্লার খরচ তো জলে যায়।

হাসতে হাসতে ঝিনুক এগিয়ে যায় ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, —যাঃ, আপনারা ছেলেরা এ্যাপ্রিসিয়েশনের সঙ্গে পোট্রেট আর্টার হাতেন না? রেলগাড়ি ছেপে ছেপে মাইল মাইল পেরিয়ে ইন্টারভিউ দিতে যান না? আজকাল তো মেয়েরাও যায়।

প্রদীপ হেসে বলল, কিসের সঙ্গে যে কিসের তুলনা করো তুমি ঝিনুক। ইন্টারভিউ দিলে এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে না? ঝিনুক এবার মাকে সাক্ষী করল, আমাদেরও তো এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে বলুন মাসিমা—বাদের ঘরে কিনেমাইনের বি হতে হবে, তারা ঠিক কেমন? কত পাত্রপক্ষের সামনে দাঁড়ালাম না-তে, যার কুড়িক ই'ল এই নিয়ে, মানুষ যে কতরকম হতে পারে কত অদ্ভুত কত নীচ, কত খানদেয়ানী তার সবইতো দেখলুম।

ঝিনুকের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে নিতে প্রদীপ বলল,—নাঃ ঝিনুক, তোমার দৃষ্টিভঙ্গী টঙ্গীগুলো বড় বয়স্কি হয়ে যাচ্ছে। বিয়েটাকে তুমি চাকরির সঙ্গে একক্করে ফেলেছ একেবারে—তোমাকে যদি কারো পছন্দ না হয়—সেটা তাদের বোধ না তোমার—কথাটা বলে ফেলেই প্রদীপ বুঝতে পারল কি বলতে সে কী বলে ফেলেছে।

খতাত্ত সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। যাকে বলে পাঁচপাঁচি। কোনো প্লাস্-পয়েন্ট নেই মেয়েটার। যদি চোখদুটোও একটু ভাসা ভাসা হত, যদি গালেও একটা বিউটি স্পট থাকত। নাঃ —কথাটা বড় সত্যি, অপ্রিয় সত্যি আর সেই জন্যেই কথাটা ঝিনুককে বলা উচিত হয়নি প্রদীপের।

ঝিনুক কিন্তু কথাটার গূঢ়ার্থ কিছু বুঝল বলে মনে হলনা। সে হাসতে হাসতে রান্নাঘর থেকে প্রদীপের জন্য জল খাবার নিয়ে এল। তারপর আলমারির আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, ওমা প্রদীপদা, এ কী? কুলদানীটার নেইযে আমি নাকিপ্লাস্টি লাগিয়ে রেখে গেলাম তারপর আর জল দেননি—ঘরে শুকিয়ে হয়েছে। এতদিনে আপনার কত কত টাকা হয়ে যেত—

প্রদীপ সবটা কথা বুঝতে পারলো। তারপর মনে পড়ে গেল তার, এর আগের বার ঝিনুক যখন এসেছিল প্রদীপ খুব সাজবার জন্য ঝাড়তাপ করছিল। ঝিনুক একদিন পাড়ার কোন একটা বাড়ি থেকে মানিপ্লান্ট এনে তার ড্রয়িংরুমে রেখে দিয়েছিল। বলেছিল মাঝে মাঝে একটু একটু জল দেবেন তবু—তাহলেই পাতা হবে। আর পাতা হলেই টাকা হবে।

ঝিনুক আবার উঠে পড়েছে—এবার ও প্রদীপের ঘরের বারান্দার দিকে চলেছে—

প্রদীপ বলল, ঝিনুক তুমি আবার ওপর রাগ করোনি তো?

ঝিনুক ফিরে দাঁড়াল। বলল, কেন রাগ করব, কেন? ওকথাতো আমার নিজের মা-ই চল্লিশ বছর বলে। কিন্তু প্রদীপদা একটা কথা সত্যিই বলুন তো একদিন সন্ধেবেলা কলেজের আলোয় একটা মেয়েকে একটুখানি দেখলেই কি তার সব কিছু চেনা যায়? যে লোকটাকে আপনারা টেলিভিশনে নাচ করে যেন —হয়তো সেই যে চাকরি পেল তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ দেখাতে পারত।

বারান্দা থেকে ঘুরে ফিরে এসে হতাশ কণ্ঠে ঝিনুক বলল—না; যা ভেবেছিলুম তা হয়নি। বোধহয় হবেও না।

প্রদীপ বলল—ঝিনুক তুমি বড্ড বেঁয়ালী করো. কি ভেবেছিলে? কি হয়নি?

ঝিনুক বলল,—সে বলব কেন? —চলি প্রদীপদা আবার আবার রাতের ট্রেন। সব গুছোতে গাছাতে হবে।

ঝিনুক চলে যাবার পর প্রদীপের মা প্রদীপকে বকুনি দিলেন।

—ছিঃ, মেয়েটার মনটা বড় ভালো—ওর মুখের ওপর অমন করে বলতে হয় দীপু—আমিত জানি যতক্ষণ বিয়ে না হচ্ছে— সুন্দরী মেয়েরাও কত ভাবনার ভোগে—

প্রদীপ মার কথার কোনো উত্তর দিল না। মায়ের কাজ যে অনেক চলে গেছে। তা সে নিজেও জানলো। মায়ের বয়স, পারিজাত, দীপ্তি, তাদের মত মেয়ে বিশেষ দেখেনি। কিন্তু বারান্দার কি দেখতে গিয়েছিল ঝিনুক? প্রদীপ বারান্দায় গেল। কতকগুলো ভাঙাচোরা কাঠের আসবাব, ইট আর গাছগাছালি ছাড়াতো বারান্দায় কিছু নেই? —নাকি বারান্দার পর বারান্দার ওপাশের ভ্যাট বাড়ির কোনো যুবকযুবক ঝিনুকের মনোযোগ আকর্ষণ করছে? কে জানে?

কদিন ধরে কালবৈশাখী অবোর ধারণ বৃষ্টি হয়ে গেল।

প্রদীপের বৃষ্টিটা ভালোই লাগছিল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। বাতির সামনের গাছা কৃষ্ণচূড়া আর বাগাচূড়ার ঝরে পড়া পাপড়িতে লাল-বেগুনে মাখামাখি হয়ে আছে। গাছগুলো যেন নেয়ে উঠেছে।

প্রদীপ আকাশটাকে ভালো করে দেখবার জন্যে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল সরানাটিতে টাকা বাতির টব দুটিতে। ছোট ছোট সবুজ সবুজ বিন্দের যেন ঘন চারা বেরিয়েছে। এত সুন্দর এত সবুজ এত কোমল, যেন গুচ্ছ গুচ্ছ সিল্কের লেসের মত।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বলল—মা, দেখ এসে—মা ওর চিৎকারে অবাক হয়ে বললেন, কি রে? এত চিৎকার করছিস কেন? কি হয়েছে?

—আমার বারান্দার টবে কতসব গাছ বেরিয়েছে/কিসের গাছ মা? কে পুঁতেছে?

মা বললেন দেখি দেখি,—আমি ঝিনুকের সঙ্গে তর্ক করেছিলাম বলেছিলাম ছেয়োধেনা—ওরা এটত, লতা-চারা, বনেজাক, ছোলাগাক—

প্রদীপ অবাক হয়ে মায়ের বালিকার মত আনন্দে ভরা মুখখানির দিকে তাকালো।

—তাঁড়াস ওছোতে ওছোতে ঝড়তি-পড়তি সব বলদার কৌটোকৌটো ঝেড়ে দুচারটে বীজ পেয়েছিল ঝিনুক, সেগুলোই এই টবে পুঁতে দিয়েছিল।

আশ্চর্য—এতদিনে সেই বীজ থেকে কত কত গাছ বেরিয়েছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে গাছ।

প্রদীপ কোনো কথা না বলে সবে গিয়ে নিজের চেয়ারটায় চুপচাপ বসে পড়ল। চোখ দিয়ে। দূর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে। বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশ। মাঝখানে সবুজ দেবদারুর সেপ্ সেপ্ পাতা। বারান্দার টবের দিকে তাকিয়ে সবুজ পাতার ছোট ছোট মাথাগুলির দোলাদুলি দেখতে দেখতে—মনে মনে ঝিনুককে উদ্দেশ্য করে বলল—ঝিনুক, আজ বুঝতে পারছি খুব সাধারণ একটি ছেলে আমি, এমনকি, তোমার তুলনায়ও খুব সাধারণ। এত সাধারণ যে ঝিনুক, তোমার ভিতরের মুক্তোটা দেখতে পাইনি। দেখতে পাইনি ঝিনুক। তুমি আমায় ক্ষমা কোরো!

তুমি কবে আসবে ঝিনুক?

আগামী সংখ্যায়

ভারতীয় গ্রন্থাগারের ৭৫-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সুভাষ দেবাঞ্জনাদেবের রচনা

আকাশবাণী-দূরদর্শনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা

আরতি সেনের গল্প

ফসল তোলার সময়

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নতুন সাহায্য প্রকল্প

পরিবেশের [illegible] ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারের [illegible] বিভিন্ন সংস্থাকে সাহায্য দানের [illegible] করেছেন। এই প্রকল্পে [illegible] পরিবারের [illegible] উৎপাদনশীল [illegible] দেওয়া হবে। কারখানা, [illegible] এবং অন্যান্য পরিবারের [illegible] হবে। একটি [illegible] সম্পূর্ণরূপে করা হবে।

[illegible] মহিলারা সাধারণত স্থানীয় [illegible] অথবা ঘরে মাদুরের [illegible] তৈরী করে থাকেন। বিশেষ সমবায় [illegible] বিভিন্ন [illegible] যুক্ত করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক [illegible] মহিলাকে ১৯ লক্ষ টাকার [illegible] দিয়েছেন। প্রত্যেক মহিলা কিস্তির টাকা পরিশোধ করে এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে মাসে প্রায় একশ টাকা উপার্জন করছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই [illegible] শ্রীবিশ্বনী সিংহী ওলাংচুংকে মহাত্মা গান্ধীর বচন সম্বার উপহার দিচ্ছেন

সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি মিনি সিমেন্ট কারখানা

ভারতের সিমেন্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিনি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের প্রযুক্তি-বিদ্যা উদ্ভাবন করেছে। সম্প্রতি কোকরাঝাড় শিল্প দপ্তরের ডাইরেক্টর শ্রীমতী আভা মাইতি একথা ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিনি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব সরকার পরীক্ষা করে দেখছেন। ১৯৮৫ সালের মধ্যে ৪৩টি মিনি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন। এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪টি, বেলারপুর, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ও তামিলনাড়ুতে তিনটি করে, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, কেরল, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে দুটি করে এবং অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, নাগাল্যান্ড এবং উত্তর প্রদেশে একটি করে মিনি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য এলাকার জন্য নতুন প্রকল্প

চলতি আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে এইসব এলাকায় ক্ষুদ্র সেচ, জলসরবরাহ, সেতু নির্মাণ, স্কুল ভবন সংস্কার, চিকিৎসার সুবিধা, পশুপালন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হবে।

সামাজিক আবাসন প্রকল্পে লক্ষাধিক গৃহ

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহ-নির্মাণ মন্ত্রকের এক কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের সামাজিক গৃহনির্মাণ প্রকল্পে প্রায় ১ লক্ষ বিশ হাজারটি গৃহ নির্মাণ হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী শ্রী সিকান্দর বখত এই তথ্য জানান। তিনি আরো জানান আলোচ্য বছরে ১৫ লক্ষ বাস্তু জমি গ্রামীণ ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

অসংগঠিত শ্রমিকের সমস্যা

অশোক ঘোষ

১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য প্রথমবার সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রমমন্ত্রী শ্রীবসন্ত বর্মা বলেছিলেন: 'স্বাধীনতার তিন দশক পরেও আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে আছে শহরে শ্রমিকের সমস্যাবলী এবং সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর কাজের শর্তাবলীর উন্নয়নের চিন্তা। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের আর্থিক উন্নয়নের আশু উপায় চিন্তা করতে গিয়ে আমরা দেশের সর্বনিম্ন শ্রমিকের এক বিরাট অংশ (প্রায় আশি শতাংশ)—যাঁরা গ্রামীণ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত—তাঁদের উপেক্ষা করেছি। আমাদের নীতি বদলের সময় এসেছে, আজ আমাদের দুর্বলতর গ্রামীণ এবং অসংগঠিত শ্রমিকের সমস্যার প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে।'

অসংগঠিত শ্রমিকের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর শ্রমিক বলতে আমরা বুঝি কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক, ঠিকাদারী শ্রমিক, তাঁত শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপৃত ঠিকা শ্রমিক। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কৃষি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত বেতনভোগী কর্মীর সংখ্যা ধরা হয়েছিল দু'কোটি চল্লিশ লক্ষ। এই সংখ্যা থেকে যদি রেজিস্ট্রীকৃত কারখানা, খনি, বাগিচা, ব্যাঙ্ক, বন্দর, বীমা, সরকারী ও আধা সরকারী কর্মীদের বাদ দেওয়া যায় তাহলে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ধরা যেতে পারে প্রায় এক কোটি। এছাড়া কুটীর শিল্প, হস্তশিল্প এবং গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত যাদের সাধারণ সংজ্ঞায় কর্মচারী বলা যায় না, তাঁদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ।

কৃষিশ্রমিক নিঃসন্দেহে অসংগঠিত, অরক্ষিত এবং সর্বতোভাবে শোষিত। এদের মোট সংখ্যা কত তা নির্ভর করছে কৃষি-শ্রমিক কাকে বলা হবে তার তাত্ত্বিক বিতর্কের নিষ্পত্তির উপর। কৃষিশ্রমিকের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা ধরা যেতে পারে 'যে ব্যক্তি অপরের জমিতে পরিমর্দন বা পরিচালনের কাজ ছাড়া কৃষি সম্পর্কিত অন্য কাজের জন্য বেতনের বিনিময়ে নিযুক্ত (বেতনের মাধ্যম সম্পূর্ণত মুদ্রা, সম্পূর্ণত দ্রব্য বা আংশিক মুদ্রা ও আংশিক দ্রব্য অথবা উৎপন্ন ফসলের অংশও হতে পারে)।' কৃষি শ্রমিকের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এ পর্যন্ত তিনটি কমিটি গঠিত হয়েছে—প্রথম কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি ১৯৫০-৫২, দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি ১৯৫৬-৫৭, গ্রামীণ শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি ১৯৬৪-৬৫। এই তিন কমিটির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তিকরে কৃষি শ্রমিক সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা হ'ল:

কমিটি	সাল	অনুমিত কৃষিশ্রমিক পরিবার সংখ্যা	পরিবার-প্রতি বেতনভোগী শ্রমিকের সংখ্যা
প্রথম কমিটি	১৯৫০–৫২	১৮৫ লক্ষ	১
দ্বিতীয় কমিটি	১৯৫৬–৫৭	১৯৩ লক্ষ	
গ্রামীণ শ্রমিক কমিটি	১৯৬৪–৬৫	১৫৩ লক্ষ	

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে দেশের মোট কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা আজ তিনকোটির কাছাকাছি।

এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, দেশের সংগঠিত শ্রমিকসংখ্যা যেখানে দেড় কোটি, অসংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা সেখানে প্রায় দুয় কোটি। এ কথাও অনস্বীকার্য যে এই বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত শ্রমিকের বেতন বা কাজের শর্তাবলী সংগঠিত শ্রমিকের তুলনায় ভয়াবহরূপে শোচনীয়। ২৫ নং ন্যাশনাল সাম্পল সার্ভে অনুযায়ী দেখতে পাই, একজন গ্রামীণ শ্রমিকের গড় দৈনিক আয় মাত্র ৬৮ পয়সা যেখানে সংগঠিত শিল্পশ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক আয় প্রায় সাত টাকা।

সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির আন্দোলন এবং প্রগতিশীল সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনোত্তর তিন দশকে আমরা শ্রমিককে অনেকাংশে শোষণমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকের বেতন, নিরাপত্তা, কাজের অবস্থা ও পরিবেশ এবং কল্যাণব্যবস্থার বহুল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আজকের ভারতীয় শিল্পশ্রমিক নিঃসন্দেহে জীবনযাপনের ন্যূনতম মান অর্জন করেছেন। বেতন ছাড়াও তিনি আজ বোনাস, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ছুটি এবং নানান সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারী। তাঁর কর্মনিয়োগ, কর্মচ্যুতি এবং চাকরির শর্তাবলী বিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট। তুলনা-মূলকভাবে আমাদের দেশের অসংগঠিত শ্রমিকের অবস্থা আজও শোচনীয়। শিল্পবিপ্লবের সময়কার শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার চেয়ে তা কোনও অংশে উন্নততর বলা যেতে পারে না।

অসংগঠিত শ্রমিকের স্বার্থে যে অল্পসংখ্যক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট, কন্ট্রাক্ট লেবার রেগুলেশন এ্যাণ্ড এ্যাবোলিশন এ্যাক্ট এবং বণ্ডেড লেবার এ্যাবোলিশন এ্যাক্ট। সার্থক প্রয়োগের অভাবে এই আইনগুলি যতটা কার্যকর হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। কেন্দ্রীয় প্রমমন্ত্রী সম্প্রতিকে এক ঘোষণায় স্বীকার

করেছেন যে, অনেক রাজ্যেই ঠিকাদারী প্রথায় নিয়োগ প্রথা বিলোপের জন্য কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অতি সামান্য সংখ্যক বৃত্তিতে সর্বনিম্ন বেতন বিধিবদ্ধভাবে ধার্য করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বিধিবদ্ধ সর্বনিম্ন বেতনের প্রয়োগ ঠিকমত হচ্ছে না। একবার ধার্য হওয়ার পর এই বেতন ধারণক্ষেত্রে বছরের পর বছর অপরিবর্তিত থাকছে। কৃষিশ্রমিকের বেতনও বিভিন্ন রাজ্যে এলাকা অনুযায়ী ধার্য হয়ে থাকে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কৃষিশ্রমিকের কাজ মরসুমী। কাজেই মোট কৃষি শ্রমিকের প্রায় ২০ শতাংশ কাজ পান বা সারাদিন। যে দুটি অনুসন্ধান কমিটির কথা আগে উল্লেখ করেছি তার পরিসংখ্যান অনুযায়ী অসংগঠিত ক্ষেত্রে কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত শ্রমিকের দৈনন্দিন মজুরী হল :

	কৃষি শ্রমিক (Casual)		অকৃষি শ্রমিক (Casual)	
	১৯৫০-৫১	১৯৫৬-৫৭	১৯৫০-৫১	১৯৫৬-৫৭
পুরুষ	১০৯ পয়সা	১১ পয়সা	১০৮ পয়সা	১০৭ পয়সা
নারী	৬৮ পয়সা	৫১ পয়সা	৬১ পয়সা	৬২ পয়সা

ভারতবর্ষের কৃষিশ্রমিকের সমস্যা গ্রামীণ অর্থনীতির দুটি মৌল সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—প্রয়োজনের তুলনায় বহুসংখ্যক এবং ক্রমবর্ধমান বাড়তি শ্রমিকের অস্তিত্ব এবং জমি এবং শ্রমিক উভয়েরই নিম্ন উৎপাদকতা। ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সম্ভবত ন্যূনতম। স্বভাবতই এর ফলে কৃষি-আয়ের উপর নির্ভরশীল মালিকের আর্থিক সামর্থ্য উচ্চতর মজুরীর অনুকূল নয়। কৃত্রিম উপায়ে কৃষি-মজুরী বাড়াবার চেষ্টা করা হলে তা কেবল কৃষি ক্ষেত্রে আরও বেকারীর সৃষ্টি করবে। পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক কৃষি মজুরী আট টাকা দশ পয়সা ধার্য করার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল তা আমরা সকলেই জানি।

সুষ্ঠু সংগঠনের অভাব দেশের বৃহত্তর শ্রমিক সমাজ—কৃষি এবং গ্রামীণ শ্রমিকের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলার পথে মূল বাধাগুলি হল কাজের মরসুমী প্রকৃতি, অজ্ঞতা এবং অশিক্ষা, কর্মক্ষেত্রগুলির বিচ্ছিন্নতা এবং একক বা যুগ্মভাবে মালিকপক্ষের বৃহত্তর সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষমতা। বৃহত্তর শ্রমিকস্বার্থে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির অবিলম্বে এঁদের সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৪১ নং কনভেনশন (গ্রামীণ শ্রমিককে সংগঠিত করার ব্যাপারে) অনুমোদন করেছে। এই কনভেনশন অনুযায়ী অনুমোদনকারী সদস্যরাষ্ট্রকে গ্রামীণ শ্রমিককে সংগঠিত করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সংগঠিত শিল্পশ্রমিকের পক্ষ থেকে হয়তো আপত্তি হতে পারে যে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যেই আজ আমরা অসংগঠিত শ্রমিকের দুঃখে সরব হয়েছি। আমার মনে হয় এ আশঙ্কা অমূলক। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সেই বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া ঘোষণাটি তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন না—'Poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere'

১৯৭৮-৮০ সালের খসড়া পরিকল্পনা-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পাবে। এই হিসাবে পুষ্টি পরিকল্পে প্রায় ২৬ লক্ষ নতুন শিশু আসবে আর বর্ষাঞ্চল-আহার পরিকল্পে ৪০ লক্ষ নতুন শিশু।

খসড়া পরিকল্পনায় এমন প্রস্তাব আছে, যা রূপায়িত হলে দারিদ্র্যরেখার নীচে লোকসংখ্যা বেশ কিছু কমে যাবে। কিন্তু সেই প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য আরও সক্ষম পুনর্বণ্টনে কতকগুলি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। সেইসব ব্যবস্থার প্রথমেই সম্পত্তির বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত, বিশেষ করে, কৃষিভূমির, শহরাঞ্চলের অস্থাবর বিষয়-আশয়ের এবং যৌথ উদ্যোগের সম্পত্তির। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির উচিত স্বল্প-আয়ের ক্রেতাদের স্বার্থে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর বণ্টনব্যবস্থা পরিচালনা করা, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থাদি গড়ে তোলা এবং সমাজ-পরিষেবার সৃষ্টি আয়োজন করা। তৃতীয়ত, উৎপাদনের ক্ষেত্রে—ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদান সংস্থা থেকে ক্ষুদ্র চাষীদের ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাপ্য ঋণ ও উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণ বাড়ানো এবং তারা যাতে আরো বেশি করে কারিগরী ও বিপণন সাহায্য পায় তা দেখা দরকার। চতুর্থত, যে নীতি বেকারী কমায় সেইসব নীতি অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করবে বলে আশা করা যায় এবং পরিশেষে, পল্লী ও শহরাঞ্চলের পরিষেবের সংগঠিত করা প্রয়োজন।

সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও উৎপাদন, বণ্টন ও নিয়োগনীতির সবক্ষেত্রে এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির সাংগঠনিক প্রচেষ্টার একটা পুনর্বণ্টনমূলক ঝোঁক গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্র কতকগুলি পুনর্বণ্টনমূলক নীতি প্রস্তাব করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে ভূমিসংস্কার, ভারতী অর সংস্কার, শহর ও যৌথ সম্পত্তির বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন, সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে পণ্য বণ্টন ব্যবস্থা আরও কার্যকর করা, দু রকম মূল্য নীতি প্রণয়ন, ভোগ্যপণ্য বণ্টনে সরকারী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা, এবং ক্ষুদ্র উৎপাদক ও চাষীদের ঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া।

পুনর্বণ্টনমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে অনগ্রসর শ্রেণী ও অনগ্রসর এলাকাগুলির উন্নতি বৃদ্ধির জন্য খসড়া পরিকল্পনায় কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। আঞ্চলিক পরিকল্পনা ব্যবস্থায়, ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচীতে এবং অনগ্রসর শ্রেণীর, পার্বত্য অঞ্চলের ও উপজাতি অঞ্চলের বিশেষ কর্মপরিকল্পনায় সেগুলি অগ্রাধিকার লাভ করবে। আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসের জন্য একটা আয়-নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর এই পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে।

খসড়া পরিকল্পনায় পল্লী অঞ্চলের অনুকূলে একটা বড়ো রকম সম্পদ নিয়োগের প্রস্তাব আছে।

"কাঁচা দিয়ে কাঁচা ঘর—আঠা দিয় সেঁটে,
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে খুতু দিয়ে চেটে।
ভর দিতে ভর ঘর ঘর বুকি পড়ে,
ধস্ ধস্ কাশি দিলে ঠক্ ঠক্ নড়ে।
ডাকে যদি কেরীওলা, হাঁকে যদি গাড়ি,
ধসে পড়ে কড়িকাঠ, ধসে পড়ে বাড়ি।
কাঁচা চোরা ধরণের কাঁচা কাঁচা কত,
কাঁচ দিলে ধরে পড়ে কাঠ কুটো মত।"

তবু স্বর্গত সুকুমার রায়ের 'বুড়ীর বাড়ী'র নয়, আজ গ্রামবাংলার অধিকাংশ বাড়ীরই এই হাল। দেয়াল বর্ষার জলে গলে বিবর্ণিত প্রতিবাদ খোড়ো রূপ নিয়েছে; ছাদের পচা খড়ের ফাঁকে রোদের অবারিত আনাগোনা; দরজার কপাট উইয়ে খেয়ে গেছে; জানালার পাল্লা এঁটে বন্ধ—খুলতে গেলে জানালা উপড়ে আসবে; মেঝে স্যাঁতসেঁতে, পা রাখলে ভিজে যায়। রাতে মাতাসহীন সে অরক্ষণে ছেলে মেয়েরা সারা বছর ধরে ভোগে সর্দি, কাশি আর জ্বরে।

ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন

দুর্গা বসু

বাংলার কুঁড়েঘর এককালে ছিল স্থাপত্য শিল্পের অনাত্ত নিদর্শন। তার এই হাল কেন? প্রধান কারণ তিনটি—এক, বাড়ী-তৈরীর অস্বাভাবিক খরচ; দুই, সিমেন্ট, অ্যাসবেস্টস্, টিন বা পোড়ানো ইঁট অর্থাৎ সেই বাসযোগ্য বা তৈরী বাড়ীকে দেয় দীর্ঘ জীবন তার অভাব, বিশেষ করে গ্রামবাংলায়; তিন, গ্রামীণ মিস্ত্রিদের ঢেঁকসই বিকল্প বাসযোগ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

গ্রামীণ ভারতে, যেখানে দেশের আশি শতাংশ অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোক বাস করে, সেখানে ঘরে ঘরে মজবুত ঢেঁকসই দুর্গ গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন কম খরচে বিকল্প বাস যোগ্য দিয়ে বাড়ী তৈরীর গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া গ্রামীণ কারিগর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অ্যাপ্লাইড টেকনোলজীর মতে, এই শতকের শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬৫০ কোটিতে। এই জনসমুদ্রকে 'গৃহদান' করতে হলে বছরে দু কোটি সত্তর লক্ষ বা রোজ চুয়াত্তর হাজার বাড়ীর প্রয়োজন। সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ অবধি যত বাসযোগ্য মানুষ লাগিয়েছে বাড়ী তৈরীর কাজে, আগামী তেইশ বছরে প্রয়োজন হবে প্রায় ততখানিই। ইঁট, সিমেন্ট, টিন বা অ্যাসবেস্টস্ দিয়ে এ প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব। উপায়? উপায় একমাত্র গাঁয়ের ভাষায় মাটির ব্যবহার।

প্রতিবাসের সর্বপ্রাচীন বাড়ী তৈরীর উপকরণ মাটি আজো সব উপকরণের থেকে সস্তা। মজুরও এর ভাড়ার। তাপ-রোধক ক্ষমতা এর অসীম। মাটির একমাত্র দোষ তার সীমিত জলরোধক ক্ষমতা। মাটির দেয়াল অল্পেই জলে গলে কাদা হয়। ফলে মাটির ঘরের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মত বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলে আয়ু বড়ই কম, তত্ত্বাবধি বড়ই বেশী। এর জলরোধক ক্ষমতাকে বাড়ালে এ সমস্যার সমাধান হয়। এ পর্যন্ত যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা যায় মাটির সঙ্গে দুই শতাংশ সিমেন্ট বা চার শতাংশ আলকাতরা মেশালে তা মোটামুটি কাজ চালানোর উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সিমেন্ট মেশানো মাটির থেকে আলকাতরা মেশানো মাটির খরচ কম অথচ জল রোধক ক্ষমতা বেশী।

এই পদ্ধতিতে গড়ে তোলা এক নতুন ধরনের মাটির কুটিরের পরিকল্পনা দিলাম যা পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় দশ পনেরো বছর টিঁকে থাকবে মেরামতি ছাড়াই। এ বাড়ী তৈরীর খরচ সাধারণ খড়ের চালওলা মাটির বাড়ীর থেকে চৌদ্দ পনেরো শতাংশ বেশী হলেও, বার্ষিক মেরামতির হিসেব ধরলে দেখা যাবে এটাই লম্বা পড়ছে:

(ক) অবস্থান—বর্ষাপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে ঘরের লম্বা দাওয়া চওড়াই প্রধান বিবেচ্য। দাওয়া যত দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে। জানালাগুলি দক্ষিণ ও পূর্বমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে ঘরে প্রচুর বাতাস ও রোদ আসে। জানালার সীল নীচু হওয়া দরকার যাতে বেজের উপর প্রচুর দাওয়া থেকে মানুষের পরীবে চলার বাতাসের ছোঁয়া না লাগলে গুমোট ভাব কাটবে না।

ঘরে অন্তত একটা মেঝে-অন্ধকারী রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এর নিম্নতম মাপ ৩ ফুট চওড়া, ১ ফুট গভীর। ৪-৫ টি স্তরে

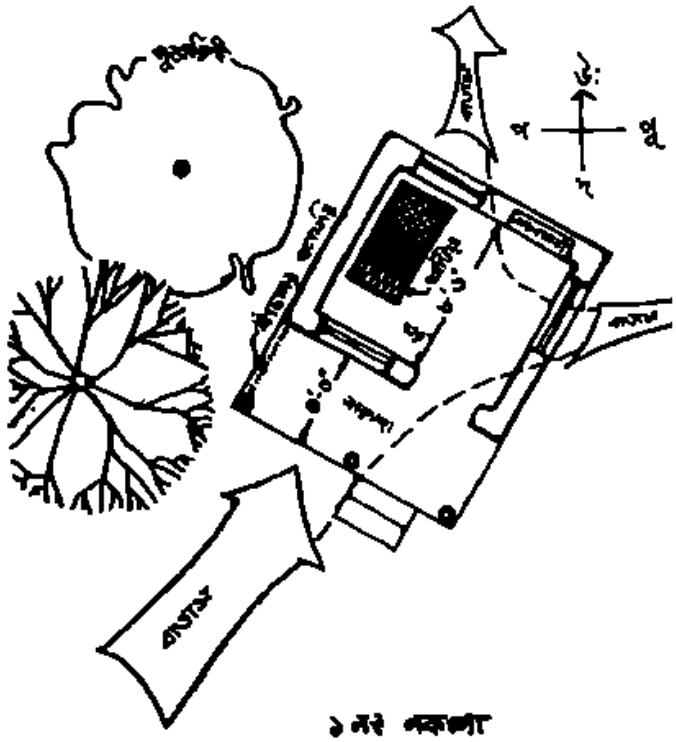

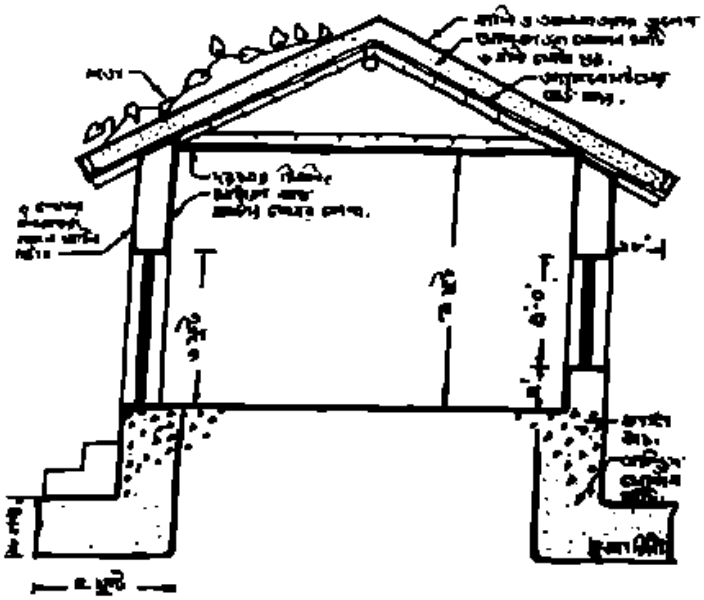

২ নং নকশা

থাকবে। ঘরই হোক বা বারান্দা বা আঙিনা—বিস্তৃতে মাপ একটা আন্দাজ রাখা ভাল যাতে খাবারের অযোগ্য। বারান্দা অন্ততপক্ষে ৫ ফুট চওড়া হবে, ঘর পাকে ৮ ফুট এবং আঙিনা ১২ ফুট। আঙিনার পশ্চিম দিকটা খোলা রাখা প্রয়োজন। পশ্চিম পাশে আম বা ঐ জাতীয় ছায়াওলা বড় গাছ লাগালে ঘর তপ্ত বা বিকেলে তীব্র আওতার থেকে ঠাণ্ডা থাকবে (১ নং নক্সা)।

(খ) **ভিত**—বাড়ির একতলা কুড়িয়ে ভিতকোন ইঞ্জিনিয়ারীং সমস্যা নয়। অবশ্য গ্রাম বাংলায় অন্য দুটি স্থানীয় সমস্যা দেখা দেয়....যার ফলে ভিত ধসে পড়তে পারে। তার একটি হল ইঁদুর, দ্বিতীয়টি উইপোকা। এদের উপদ্রব বন্ধ করতে হলে প্রথমে ভিতের মাটিতে কাঁচের টুকরো, জলা পিসি গোতল মিশিয়ে দিতে হবে যাতে ইঁদুর গর্ত করতে না পারে। তিতরে চারপাশের মাটিতে এক হাত গর্ত করে পাঁচ শতাংশ অ্যালড্রিন মেশানো জল বা ক্রিয়োজোট মেশানো কেরসিন তেল ছড়িয়ে দিলে উইপোকার উৎপাত বন্ধ হয়ে যায় (২ নং নক্সা)।

(গ) **দেয়াল**—জলনিরোধক দেয়াল তৈরীর পদ্ধতি দু-রকম :

(১) কুচোনো খড় ও দু শতাংশ সিমেন্ট মেশানো মাটি দুবারে কাঠের পাটাতন এঁটে দুহাতল পিটিয়ে জলসহ ও শক্ত দেয়ালে পরিণত করা (৩ নং নক্সা)। এই মাটিতে খাবার টুকরো মিশিয়ে দিলে আরো টেকসই হবে।

(২) ১ শতাংশ আলকাতরা (TAR) মেশানো মাটির ইট গড়ে তাকে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। গাঁথতে হবে ২ শতাংশ আলকাতরা মেশানো কাদা দিয়ে।

(ঘ) **প্লাষ্টার**—দেয়ালের বহি প্লাষ্টারকে জলরোধক করা যায় সিমেন্ট বা আলকাতরা মিশিয়ে। ভিতরে কাদামাটির প্লাষ্টার করে গোবর লেপে দিলেই যথেষ্ট। বাইরের প্লাষ্টার হতে পারে ৬ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেন্ট, ১ শতাংশ সাধান জলে মেখে কিম্বা মাটির সঙ্গে কুচোনো খড়, গোবর ও দশ শতাংশ আলকাতরা মিশিয়ে (২ নং নক্সা)।

(ঙ) **ঘরজা জানালা**—কাঠের প্যানেল পাল্লার থেকে কাঠের ফ্রেমে আটকানো অ্যাসবেস্টসের প্যানেল সস্তা ও বেশী টেকসই। দরজার মাপ অনেক সময় অযথা বাড়ানো হয়। ৬ ফুট × ২ ফুট ৬ ইঞ্চি যথেষ্ট। সে তুলনায় জানালাগুলি যথেচ্ছ ছোট ও উঁচুতে বসানো। ৪ ফুট × ৩ ফুটের বড় হওয়া উচিত নয়। মেঝে থেকে দু ফুটের উপর বসালে ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচল করে যথাযথভাবে (২ নং নক্সা)।

(চ) **ছাদ**—অ্যাসবেস্টসের ছাদই সবচেয়ে টেকসই। অবশ্য ব্যয় সাপেক্ষ। এ খরচের বোঝা যাঁরা বেতে পারবেন না, তাঁদের উচিত পোড়াবাড়ির চালি ব্যবহার করা। খড়ের চাল শুধু বরবাদীই নয়, বাড়ীতে আগুন লাগার প্রধান অবলম্বনও। অ্যাসবেস্টসের ছাদের উপর ৬ ইঞ্চি মোটা করে আলকাতরা মেশানো মাটির ঘর চাপিয়ে উপরে সিকি ইঞ্চি মোটা বালি আর আলকাতরার প্রলেপ দিলে ঘর ঠাণ্ডা থাকবে, ছাদ দিয়ে জল পড়ারও কোন সম্ভাবনা থাকবে না। কুমড়ো বা লাউডগার লতা ছাদে চড়িয়ে দিলেও ছাদ ঠাণ্ডা থাকে। ছাদ যেখানে দুপাশে দেয়ালের উপর দিয়ে ১ ফুট বেরিয়ে আসে, তাকে আরো ৬ ইঞ্চি বাড়িয়ে দিলে এই অংশটুকু দেয়ালকে রোদ বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবে (২ নং নক্সা)। বাড়ীর আয়ু অন্তত আরো ৫ বছর বাড়বে।

(ছ) **সিলিং**—ঘরের সিলিং ঘরকে ঠাণ্ডা রাখে। গ্রাম-বাংলায় এর বিশেষ প্রচলন নেই। অথচ পায়রার থাকণ ঘরকে সহনীয় করতে ঘরে ঘরে এর ব্যবহার। মাটির কুঁড়ে-ঘরকে আরো স্নিগ্ধ করে তুলতে সিলিং-এর ব্যাপক প্রসার কাম্য। সিলিং-এ চুনকাম করে দিলে ঘরে আলো বেড়ে যাবে। মেঝে থেকে সিলিং-এর উচ্চতা ৯ ফুট হওয়া উচিত (২ নং নক্সা)।

এই ভাবে গড়ে তোলা কুটিরগুলি বাংলার তথা ভারতের চেহারা পাল্টে দিতে পারে ঘরত আগামী তেইশ বছরের মধ্যেই।

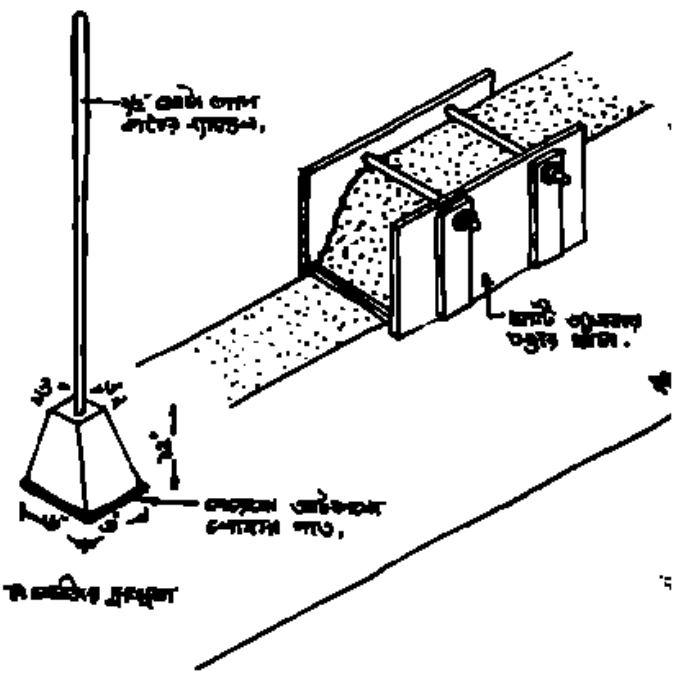

৩ নং নকশা

খেত খামার

আউশ চাষে অবহেলা কেন

পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় বর্ষা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা আউশ ধান চাষে মেতেছেন। সেচের জলের অভাবে বোরো ধান চাষ অনেকটা মার খেয়েছে। লম্বা মত বোরোর গোড়ায় জল না পড়ায় অনেক ধানই মুখ শুকিয়ে মারা পড়েছে। অবশেষে বর্ষা এসে আউশের আশাকে এখন অনেক ভোরসার করেছে।

এরাজ্যের পয়লা তালিকায় আমন ধানের পরই আউশ ধানের চাষ। প্রায় সমস্ত চাষযোগ্য জমিতে আউশের চাষ হয়। চাষীরা বলেন ধান চাষ করে আর লাভ নেই। একটু লোকসান হলেই চাষীর মাথায় হাত। কারণ দিন দিন ধানের দাম পড়ছে—তাতে খরচে পড়তা পড়ে না। কিন্তু চাষীরাই বলেন ধান চাষ নেশার চাষ। ধান আমাদের সবের ধন, মনের সঙ্গী। কাজেই ধান চাষ না করে উপায় কী? অন্যরা বলেন অন্য কথা। আউশ চাষ করলে এইসব অভাবের সময় পাকে বলে ছোট চাষীর উপকারী বন্ধুর কাজ করে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জমিতে আউশ চাষ আগাম হয়। সেখানে আউশ চাষ শুরু হয়েছে। মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গে আউশ চাষের মৌসুম মাঘ পর্যন্ত। পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণায় আউশ ধান প্রধানত ছিটিয়েই বোনা হয়। অন্যদিকে বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়ার জমিতে বোনা বোরা দুইই চলে। ছিটিয়ে বোনার চেয়ে বোরা করলে স্বাভাবিক কারণেই আউশ ধানের ফলন বেশি পাওয়া যায়। একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আউশ চাষে লক্ষ্য করা যায় প্রতিবছরই। সেটা হল চাষীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আউশ চাষকে খুবই অবহেলার চাষ ধরে নিয়েছেন। দু'একটা লাঙল একটা মই দিয়ে বীজ ধান ছিটিয়ে দিতে পারলেই কাজ শেষ। না আছে নিড়ানি, না আছে রোগ পোকার প্রতিকার বা পরিচর্যা। কাজেই ধান কেটে ফসল তুলে চাষী দেখেন বিঘায় মাত্র চার পাঁচ মন ফলন হয়েছে। কম ফলনের আরো একাধিক কারণ হল অনুন্নত দেশী ধানের বীজ হিসাবে ব্যবহার, আগাছার উৎপাত, প্রয়োজনমত সার কীটনাশক প্রয়োগ না করা, সেচের অভাব ইত্যাদি। অথচ একটু নজর দিলেই আউশ ধান চাষ করে বিঘায় দশ বারো মণ ধান তোলা খুব একটা কঠিকর ব্যাপার নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়ার দীমান্ত এলাকার জমিতে ব্যাপকভাবে চলছে জোলি, ঝউনাস, দাওড়া, খড়া ও চীনা আউশ ধানের চাষ।

আর একটা কথা চাষীদের জানা প্রয়োজন যে তাঁরা অধিলম্বে যদি এই অযত্ন ও অবহেলার চাষ বন্ধ না করেন তবে তাঁদের লোকসানের মুখ দিন দিন বাড়বেই। অনেকেই এখন দেশী চলতি জাতের পরিবর্তে উন্নত অধিকফলনশীল ধানের চাষ করেন। সার, সেচ, রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা করেন। তাতে খরচ খরচা বাদ দিয়েও বিঘায় লাভ তোলেন উন্নত প্রথায় চাষ করে।

উন্নত জাতের আউশ ধানের মধ্যে গাঙের পলিমাটি এলাকায় বোনার জন্য রয়েছে পলবন, সি-এস-এর ২৫, আই আই আর ২২২৬। এছাড়া অর্থাৎ এগুলো তো ওই এলাকায় বোনা করা চলবেই উপরন্তু বন্যা, মাকেড-৪, পুসা ৩৩-৩৬ ও আই আর ৩৬ বোরা করা যাবে। খরা এলাকায় চাষের জন্য বোনা আউশের জাতে রয়েছে আই-ই-টি ৮২৬ পলবন। এগুলোকে বোনা করাতো যাবেই, সঙ্গে বোরা যাবে বন্যা, মাকেড, পুসা ইত্যাদি ধান।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমনের মত আউশ ধান চাষেও খরচ অনেক কম। তার কারণ জলের জন্য এখনও আছে বৃষ্টি আর আছে অকৃপণ সূর্যালোক যা ধান চাষের অধিক ফলনের প্রধান সহায়ক।

প্রায় প্রতিটি জেলার খবর, পাট চাষ এবার বেশি হবে। চাষীরা এর প্রধান দুটি কারণ দেখিয়ে থাকেন। গতবছর চাষীরা পাটের মোটামুটি একটা লাভের মুখ দেখেছেন আর দ্বিতীয় কারণ ধান চাষ করে তাঁরা আর পড়তা করে উঠতে পারছেন না। সারের দামবৃদ্ধ খরচ, সার, কীটনাশক, বীজ এদের দামতো বাড়ছে ছাড়া আর কমছে না। চাষীরা দারুণভাবে বলছেন, ধান চাষ করে দেখছেন তাঁদের উৎপাদন খরচ উঠছে না। কাজেই এবার চাষীরা অনেকেই বলছেন এবার অনেক ধানের জমিতে পাট চাষ হবে।

পাট চাষের দু'চার কথা

পাট চাষীদের কাছে আর একটি সুখবর হল এবারের আগাম বৃষ্টি। আগাম বৃষ্টিতে জমিতে ভাল 'জো' এসেছে। চাষীরা তাই লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ জমিতে এর মধ্যেই তেতো পাটের চাষ শুরু হয়েছে। নিম্ন ও মধ্য দামোদর জেলা জমিতে চলছে লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করা। পাট জমিতে আগাম আগাছা দমনের ব্যবস্থার জন্য জমিতে একবার বৃষ্টি হলেই লাঙল দিয়ে

[illegible] ছেড়ে দিন। মাঝে মাঝে দু-একটি বৃষ্টি হলে পরের দিন দিন বড় বড় আগাছা। মাটি তুলে দাঁড়াবে তখন দু'একটি নিড়ানি দিয়ে আগাছা মেরে দেওয়া যায়। আগাছা নিড়িয়ে দিয়ে চারা গাছের গোড়ায় কেঁচো কম্পোস্ট দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলে চারা গাছ তাড়াতাড়ি বড় হবে।

এই ভাবে বছরে চাষীদের কাছে একটা বড় সমস্যা হল পরিচর্যার অভাবে। তাছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় গাছ বড় হয়ে ফুলে ফুলেও ভরে গেছে কিন্তু ফল ধরছে না। এটা হওয়ার মূল কারণ পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুলের পরিবর্তে হওয়া। এ সমস্যা দূর করতে হলে ৩ ভাগ পচা গোবর ১ ভাগ বালি ও ১ ভাগ কাঁচা ইটের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে কয়েকটি টব ভর্তি করে বীজ বোনার ১ মাস আগে থেকে টবগুলি গাছের গোড়ায় বসিয়ে দিতে হবে। এতে চাষীদের অনেক সুবিধা হবে।

বিশ্বের নানা প্রতিষ্ঠান থেকে চাষীদের উচ্চিত দামে বীজ সংগ্রহ করা।

উন্নত ধরনের গাছের মধ্যে কেন্দ্রীয়-১৬১২, কেন্দ্রীয়-৭০১, কেন্দ্রীয়-১৭৮ এ ধরনের, কেন্দ্রীয়-১৬১৫, কল্যাণী হেমন্ত, ঝিলমিল ফ্লাট কেন্দ্রীয়-১২৩ প্রভৃতি। এ ছাড়া বিভিন্ন ঢঙে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ সম্প্রতি একটি নতুন জাতের গাছ করবী নামে বের করেছেন। এর বীজ বোনা একরে ৬ থেকে আড়াই কেজি। এই গাছের ফলন হেক্টারে ১২৫ গাছের থেকে শুরু করে। ১৫০-২০০ ভাগ বেশি। এই গাছের ফুল বিভিন্ন রঙের। ১৫ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে ফোটা শুরু। ফুলে ফলন বিশেষ প্রভাবিত হয় না। করবী গাছের অন্যান্য সুবিধা হল চৈত্র থেকে শুরু করে বৈশাখ মাস পর্যন্ত এ গাছ বোনা যায়। এছাড়া রোগ ও পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য গাছের চেয়ে কম। কম সার দিলেও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হবেনা। গাছ পচতেও সময় কম লাগে।

অনেক বোরো চাষীই জানেন নতুন নতুন শস্য পর্যায়ের কথা। শস্য যায় বোরো তুলে সেই জমিতে সবজেই গাছ দিয়ে মাঘে আর একটি শস্য তুলে নেওয়া যায়। শস্য পর্যায়টি হতে পারে এরকম—বোরো ধান তুলে গাই অথবা আলু গাছ আমন গাইকালীন সবজি বা তিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে চৈত্র বৈশাখের মধ্যেই অধিকাংশ বোরো ধান উঠে যায়। সেখানে ঠিকমত চাষ আবাদ দিয়ে বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় উন্নত জাতের গাছ বীজ দিলে তিন মাস গাছে তিন মাসের মাথায় সামনে গাছ তুলে সেখানে অধিক ফলনশীল আমন ধানের চারা রোপণ করা যায় সহজেই। অবশ্য সেই আমন কাটিকে তুলে আলু বা গাইকালীন সবজি বা সরষীনা, মুগডাল, গাই বা মাঘ দিতে পারেন। তবে আগ দিলে জমি প্রায় এক বছর আটকা পড়ে থাকবে।

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

গ্রন্থ আলোচনা

The Calcutta Review (New Series Vol. No 2, October-December '77) Price : Rs. 2

কলকাতা বিশ্বিদ্যালয় সম্বন্ধে নতুন করে পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র এই পত্রিকাটি বিশ্ব মহলে বহুকাল থেকে সমাদৃত এবং সমালোচিত। সম্পাদকমণ্ডলীতে আছেন ডঃ সুনীল মুখোপাধ্যায় (উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ নরেন্দ্র কুমার পোদ্দার, চন্দনাকান্ত ভট্টাচার্য, ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রমুখ বিশ্ব সুধীজন। কার্যকরী সম্পাদক সলিল দত্ত।

এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—মাননীয় বহু দূত 'শ্রীনিকেতনের মাটি' শীর্ষক সম্বলিত প্রবন্ধ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন সর্বস্তরের বিষয়বস্তু পাঠকদের মনের খোরাক এই পত্রিকা নিঃসন্দেহে জোগাতে পারে। নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' সম্বন্ধে পাঠকের ধারণাকে স্বচ্ছ এবং দৃঢ় করতে চলে এ সংখ্যায় চঞ্চল মজুমদারের Some Interesting Topics in Newton's principia শিরোনামে প্রবন্ধটি।

'Tagore's criticism of the Tempest, comparative study of drama, A poet is dead : Robert Lowell, শিরোনামের আলোচনা খুবই মনোত্তীর্ণ ও মনস্বিতাপূর্ণ।

এ সংখ্যার 'কবিতা'র অভাব অনেক পাঠকের মন বাধিত করবে। তবে ভবিষ্যতে থাকবে এ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। আগামী সংখ্যাগুলোতে মুদ্রণ-প্রমাদ আরো সতর্কতার সঙ্গে এড়ানো দরকার।

বোম্বাই বিচিত্রা/৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৌষ-মাঘ, ১৩৮৪ / সপ্তাহিকাগুলী ডঃ রেখা বসু, মঞ্জুলিকা মুখোপাধ্যায়, সালেট ঘোষ; দাম ছিয় টাকা।

বোম্বাই বাঙালীদের সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ 'বোম্বাই বিচিত্রার' অবদান আজ সর্বজনবিদিত। পত্রিকার সপ্তম বর্ষে পদার্পণ এই প্রীতির ফসলকে পাঠকের দরবারে পাকা আসন এনে দিয়েছে। তাদের কাগজের মান এখন অনেক উন্নত বলিষ্ঠ এবং শিল্পমণ্ডিত।

এ সংখ্যার কবিতাগুলোর মধ্যে 'বনকুলের' কবিতা 'চারবরফ' পরম উপভোগ্য। 'কবিতার জন্ম', 'অঙ্গীকার', 'স্মৃতিটুকু থাক' ভালো লেগেছে। একটা সুন্দর গল্প পড়লাম দীর্ঘক রায়ের 'মহারাজ যারা গেছেন'-এ। লেখিকা বিভূতিভূষণের প্রভাব স্বীকার করেছেন তবুও প্রকৃতির সঙ্গে মিলনে আন্তরিকতা সার্থক সৃষ্টি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত প্রেমের অপেরা, মনির রোষের 'আই অব্ পেন্ডুলেম' ক্যালেন্ডার' উল্লেখযোগ্য রচনা। ভ্রমণবৃত্তান্ত ইরান ভ্রমণ: কুতজ্ঞতায়, ভালবাসায় রীতিমতো উপভোগ্য এবং সুখপাঠ্য। উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'একটি জার্মান চলচ্চিত্র ও বক্তব্যবাদী' নিবন্ধে জার্মান ফ্যাসিবাদের 'বেট্রোপোলিস' ও বক্তব্যবাদীর তুলনা সুন্দর এবং তথ্যনিষ্ঠ।

অমর দাশ

শিল্প সংস্কৃতি

এই তো ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নতুন দিল্লীতে সমকালীন চারুকলার চতুর্থ ত্রিবার্ষিক (ত্রৈবার্ষিকী) অনুষ্ঠিত হল। ডাকটিকিটকে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বাহক করে তোলার আধুনিক মনোভঙ্গির ক্ষেত্রে ভারতীয় ডাকবিভাগ যে পিছিয়ে নেই এই প্রদর্শনী উপলক্ষে তার আর একটি বড় নজির মিললো। কেননা এই প্রদর্শনীর স্মারক হিসেবে তাঁরা প্রকাশ করলেন আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ওপর চারটি ডাকটিকিট। এর আগে ১৯৭৩ সালে তাঁরা ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাচীন চিত্রকলা—মিনিয়েচার পেন্টিং-এর ওপর একটি সিরিজ বের করেছিলেন।

ডাকটিকিটে তাঁরা চারজন

কিন্তু গত ২৩শে মার্চ চতুর্থ ত্রৈবার্ষিকী সম্বলিত প্রকাশিত সিরিজটি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ওপর সর্বপ্রথম বলা যায়। অভিনব ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা, এক টাকা এবং দু টাকা মানের এই ডাকটিকিটের সিরিজে রয়েছেন যামিনী রায়, শৈলজ মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমৃতা শেরগিল। ভারতীয় চিত্রকলার নব-জাগরণের পুরোধা অবনীন্দ্রনাথ কিংবা নন্দলাল এঁদের ওপর ব্যক্তিগতভাবে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ বা যামিনী রায়ের শিল্পকৃতির ওপর ডাকটিকিট এই প্রথম। আলোচ্য সিরিজে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল না থাকলেও উল্লিখিত চার শ্রুতকীর্তি মহান-শিল্পীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলি স্থান পেয়েছে। সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় লোকশিল্পের নতুন ফসল ফলাবার যামিনী রায়ই করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম দুই বৈষ্ণবকে ভারতীয় ডাক তার বিভাগ তুলে ধরেছেন ২৫ পয়সার একটি ডাকটিকিটে। লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন শিল্পধারা প্রবর্তনের স্বাক্ষর যামিনী রায়ের এই ছবিটিতেও সুস্পষ্ট।

মাত্র আটাশ বছর বয়সে যে প্রতিভাবান শিল্পী মারা যান সেই অল্প ক'বছরেরই আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন যে, তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর আঁকা 'মাদারহুড' (মাতৃত্ব) ছবিটি চিত্রিত হয়েছে ৫০ পয়সার একটি ডাকটিকিটে।

রবিবর্মার বা ধুরন্ধর ব্যক্তিত্ব কালীঘাটি পট বা প্রাচীন ভারতের অজন্তা-ইলোরার রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চার সূচনা। অন্যান্য শিল্পীদের মতো তিনি যে শিল্পকলার ওপর

ধরা যায়। তাঁর শিক্ষানীক্ষা সবই হয়েছে শিল্পকলার তীর্থক্ষেত্র প্যারিসে। তাঁর এবং বোনের মডেল বিদুষিতীর যারা তিনি প্রথম জীবনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্যভাবে। ইম্প্রেশনিস্ট-পরবর্তী শিল্পরীতির প্রতিও তাঁর শিল্পকর্মে প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু শেষ দিকে ভারতের আকাশ, মাটি ও মানুষই তাঁকে কাছে টেনেছিল। পাহাড়ী নদী তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। পাশ্চাত্য রীতির ছায়া এবং ভারতীয় রীতির একত্র সমাবেশ লক্ষ্যণীয় হয়েছে এই ছবিটিতে। এটিকে তুলে ধরা হয়েছে দুটাকার একটি ডাক টিকিটে।

ইংরেজী মাই মাসে প্রথাত স্বাধীনতা-উত্তর কালের এক অসাধারণ শিল্পী চিত্রকর শৈলজ মুখার্জী। তাঁকে স্বাধীনতা-উত্তর আধুনিকতার কবির ছবি আঁকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সমালোচকেরা। হিসেবে দেখা যায়, প্রায় ২৫০০ শিল্পকর্মের মধ্যে তিনি অন্তত অর্ধেক ছবিতে চিত্রিত করেছেন কবি, তাঁর কবিতাকে কবি কল্পনা ও রেখায়। কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পকর্ম তাঁকে ব্যতিক্রমী করেছে। বিশেষতঃ চিত্রিত করেছে বিধবাদের দুঃখ। ছবিটি কবি যা মনে পড়ে। এমন ছবিটিই ডাকবিভাগ এবার একটি ডাকটিকিটে তুলে ধরেছেন।

আশা করবো, ডাকবিভাগ এবার স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগের আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অনেক আরো কয়েকটি সিরিজ অচিরে প্রকাশ করবেন। আর তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতের মতো ও অতীত মহান ঐতিহ্যের দেশ হিসেবে আরো বিশ্বে গণ্য হয়।

বীরেন সাহা

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের পঁচিশ বছর

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের স্বর্ণ কমলটী বছরটা কোনো বিতর্কের ঢেউ না তুলেই পার হল। সেরা ছবি (ঘাটশ্রাদ্ধ) শুধু নয়, সেরা শিল্পনির্দেশক (অজিতকুমার), পরিচালক (জি. অরবিন্দন), অভিনেত্রী (গোপী), সঙ্গীতকারের (কি-ভি-কারনাথ) পুরস্কারগুলি যাওয়া তবে ঘরে তুলে নিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক ও কেরালা। নতুন মুখের উপহার হিসাবে সেরা অভিনেত্রী (শ্রীমতী পাত্তিল) ও চিত্রনাট্যকারের (শ্যাম বেনিগাল ও সত্যদেব দুবে) পুরস্কার পেল পশ্চিম ভারতের ছবি। মানবিক আবেদনপূর্ণ সেরা ছবি (মারী) জনপ্রিয়তাও তাঁদের গলায়।

পূর্বাঞ্চলের মুখ রক্ষা করেছে আসাম (লটাবাগ) ও উড়িষ্যা (চিল্কা তীরে) সেরা আঞ্চলিক ছবির পুরস্কার দুটি পেয়ে। বাংলা ছবি কোনো পুরস্কারই পায়নি। লজ্জাহীন এই বেহায়া। ১৯৭৭ সালের মত দুর্বহ বাংলা ছবির ফলনও আর হবনি বুঝি!

এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা এইটুকু যে বাংলা ছবি পুরস্কার না পাক, কলকাতার প্রতিষ্ঠা চিত্রকারগণই সেরা শিল্পী (শতরূপ কে খিলাড়ী), শিশুচিত্র (সন্ধেশ যাওী), তেলেগু (ওকা উরি কথা) ও উড়িয়া (চিল্কা তীরে) ভাষার ছবির পুরস্কারগুলি পেয়েছেন। আর প্রবীণ পরিচালক নীতিন বসুর দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার প্রাপ্তিটাই কম কিসে।

কোনো পুরস্কার নিয়েই একটু কোনো গুঞ্জন ওঠেনি। শোনা যায় বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হয়েছে, কিন্তু পুরস্কার ঘোষণার পর কোন বিতর্ক নেই। মাদ্রাজের বিনোদনে করেকখানি কানাড়া ও মালায়ালম ছবি দেখার পরই বিশ্বাস জন্মেছিল, একটু জলের পাত্রকা হাতে নিয়েই তাঁরা পথে পা বাড়িয়েছেন। গিরিশ কার্নাডের 'ঘাটশ্রাদ্ধ', জি-অরবিন্দনের 'কোডিয়াটম', ভল্লর পাটোলের 'জরেত্ত যে জরেত', বি-ভি কারনাথ ও গিরিশ কারনাডের 'গোধুলি' স্পষ্টই প্রমাণ করে চলি নিয়ে নতুনতর ভাবনা চিন্তার ঝড় এখন দক্ষিণে, কলকাতার আর নয়। এখানে চলছে নকলনবিশী।

পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের তরুণ স্নাতক (বয়স বছজোর ২৮) গিরিশের প্রথম ছবি 'ঘাটশ্রাদ্ধ'। সমাজের একটি অমানবিক প্রথাকে ঘিরে এক তরুণীর জীবনব্রত অবলম্বন চিত্রায়িত করে তিনি যে পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে প্রশংসা করতেই হয়। ছবিটির গঠনশৈলিতে রয়েছে নাটকীয় গন্ধ, রয়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কঠিন ধীবর নিয়ম-কানুনের প্রতি দৃঢ় অঙ্গুলিনির্দেশ। যৌবনের বৃদ্ধ শিক্ষক বিধবাহীন উড়িয়া তরুণী বিধবা বোঝে যমুনাকূলা প্রেমে পড়ে পাশের গাঁয়ের কুল বাহারের সঙ্গে এবং সন্তান আসে তার গর্ভে। গ্রামের লোক এখবর জানার পর উড়িয়াকে আদেশ করে মেয়ের ঘাটশ্রাদ্ধ করে তাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে। এটাই সমাজের নিয়ম। বৃদ্ধ বাবাকে 'ঘাটশ্রাদ্ধ' করতেই হয়। (এই পর্বে নিখুঁত ডিটেলসে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কাণ্ডগুলি কি ভয়ানকভাবে সময় বিধায়ী) মেয়ে হয় নির্বাসিত। আর কদিন বাদেই গুরুবাক্য বৃদ্ধ উড়িয়ার কাছে প্রস্তাব আসে একটি তরুণীকে বিবাহ করার, সমাজ সে প্রস্তাব মেনেও নেয়। সংঘাত এখানেই। পরিচালক এই দুশোই ছবিটিকে অনায়াসে উত্তীর্ণ করে দেন। আর সমস্ত ঘটনাগুলি দেখানো হয় চৌদ্দর কিশোর ছাত্র নদীর প্রেক্ষিতে। নদীর সঙ্গে যমুনাকূলার সম্পর্কটিও সাবলীল, মধুর আবেদন নিয়ে উপস্থিত। সেই সঙ্গে কি-ভি-কারনাথের সঙ্গীতের ব্যবহার এখনও কানে বাজে।

এবারের প্রতিযোগিতায় সেরা পরিচালকের পুরস্কারটি পেয়েছেন কেরালার

স্বর্ণকমল-জয়ী বছরের সেরা ছবি, 'ঘাটশ্রাদ্ধ' (কানাড়া)

ভি অরবিন্দন (কাঞ্চন সীতা)। সত্যজিৎ যোগাপাত্রেই পড়েছে। বানাজপের উচ্চারণের ঘটনা অবলম্বনে ছবিটি একটি পিরিয়ড পীস্ হিসাবে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ বলছেন সত্যজিৎ রায়ের কথা, 'শত্রুর...' বেশী হয়নি, সুতরাং বক্তব্যে নিহিত থাকাই ভালো। আদুর গোপাল-কৃষ্ণণের 'কোডিয়াট্টম' ছিল ষাটোর্ধ্বের অন্যতম প্রতিযোগী। এই মালয়ালম ছবিটিও জীবনধর্মী বলিষ্ঠ বক্তব্য ও পরিচালকের প্রয়োগনৈপুণ্যে পুরস্কার-প্রশংসার দাবীদার। সেরা আঞ্চলিক ভাষার পুরস্কার পেয়েছেও। বাংলা ছবি পুরস্কার না পাওয়ায় একটি প্রশ্ন স্থানীয় চিত্রমহলে বেশ জোরদার। প্রশ্নটি হল 'মাটী' ছবিটি কি সেরা আঞ্চলিক ছবির পুরস্কার পাবার অনুপযুক্ত ছিল? এই প্রশ্নের সঙ্গে পূর্বেকার পুরস্কারের তুলনাটির কথাও তোলেন অনেকে। 'মাটী' নিঃসন্দেহে একটি পরিচ্ছন্ন মনোহারী চিত্রকর্ম, শিল্পকর্ম নয়। 'ডাক হরকরা'-য় যে আঞ্চলিক মাটির ভোঁয়া অনুভব করা গিয়েছিল, আলোচ্য ছবিটিতে তা অনুভূত হয়নি। হয়তো সেজন্যই প্রতিযোগিতায় পাল্লায় অন্যান্য বাংলা ছবির কথা বাদ। নিয়তির মানও তাদের ছিল কি? নিজেদের অপরূপ মাঝে নিজেরা নাই কেন! শুধুমাত্র নুধরক্ষা যে কলকাতার নীতিন বসু এবছর জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত। নিউ থিয়েটার্সের সমকক্ষ এই প্রবীণ পরিচালক ভারতীয় ছায়াচিত্রের পুরোধা পুরুষ। তাঁর সম্মান প্রাপ্তিতে বাংলা নিশ্চয়ই গর্বিত।

অন্যদিকে অন্য আঞ্চলিক ভাষার ছবির চেহারা ও প্রকৃতি অন্যরকম। কানাড়া ভাষায় ১৮ খানি ছবি ছিল প্রতিযোগিতায়, মালয়ালমভাষীরা পাঠিয়েছিল ১২ টি ছবি। হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষা, সুতরাং সে ভাষায় সবচাইতে বেশী ছবি থাকতেই পারে।

কিন্তু লক্ষণীয় ঘটনা হল আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলিই বাজীমাৎ করেছে এবার।

প্রাঙ্গণ

কলকাতায় জাতীয় ভারোত্তোলন

কলকাতার চোরাগলিতে হিন্দী ছবির শিল্পকর্ম খুব চলছিলো। সর্বভারতীয় পুরস্কারগুলির মধ্যে মাত্র দুটি পুরস্কার পেয়েছে হিন্দী ছবি। সেরা চিত্র-গ্রহণের পুরস্কার পেয়েছে 'ভূমিকা' (শ্যাম বেনিগাল ও সত্যদেব দুবে কৃত), সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার নিয়েছেন শিবানী পাণ্ডিত (ভূমিকা), সেরা শিশুচিত্রের পুরস্কার পেয়েছে তপন সিংহের 'সফেদ হাতী'। বাকি চিত্র-গ্রহণের জন্য সেরা চিত্রগ্রাহকের পুরস্কারটি পেয়েছেন সৌমেন্দু রায় (শত্রুরে কে খিলাড়ি) ও মহম্মদ খবি পেয়েছেন সেরা গায়কের (চাল কিসিসে কম নেহী) পুরস্কার। এবং 'স্বামী' ছবিটি পেয়েছে বছরের সেরা সুস্থ মানবতাবাদী চিত্র-কর্মের পুরস্কার।

বাকি পুরস্কারগুলি সবে তুলেছে আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলি। জীবন ও মাটির গভীরে এই ছবির সত্তাগুলি প্রোথিত—তাইনা এই জয়যাত্রা। জীবনচ্যুত বাংলা কোন সৃষ্টি বৃহৎ শিল্পকর্ম হতে পারে না। হয় না। মারাঠি ছবি 'জয়তে রে জয়তে', তামিল ছবি 'আধলারখিল কাদুখাই', কানাড়া ভাষার 'তবরিউ লোকাদে মাযাদেনু', তেলেগু ছবি 'ওকা উরি কথা', মালয়ালম ছবি 'কোডিয়াট্টম' উদ্গিরিত সত্যের মাতৃভূমা প্রবাহ। গভীর জীবনভেদী বক্তব্য, প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা ও নিত্যনতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার হস্তক্ষেপও এই সব আঞ্চলিক ছবির ছোট ছোট ভাষাগুলি। বিবাট বাজারের পরিধিতে বুঝি পরীক্ষার বিলাস সম্ভব নয়। এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সেকথাও জানিয়ে দিল।

বিমল বসু

পশ্চিমবঙ্গ রিক্রিয়েশন ডি এ্যান্ড টি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গত ৪ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার তাপধারক হলে জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন রাজ্য ও ইউনিট সহ মোট ১৮ টি দলের ২৬৫ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ১৭ জন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও ৫ জন অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন। প্রতি-যোগিতা হয় মোট ৯ টি বিভাগে।

প্রথম দিনে ফ্লাই ওয়েটে (৫২ কেজি) পূর্ব রেলের ২২ বছরের অনিল পাল প্রথম হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। সিনিয়র বিভাগে অংশ নিয়ে প্রথম আবির্ভাবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। স্ন্যাচ এবং ক্লিন-জার্কে যথাক্রমে ৮০ ও ১১৭.৫ = ১৯৭.৫ কিলোগ্রাম ওজন তুলে। গতবার মুম্বাইয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অনিল চ্যাম্পিয়ন হন। কিন্তু বার্ণপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতি-যোগিতায় কোন বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না। এই বিভাগে দ্বিতীয় হন তামিল-নাড়ুর ই. রুকণাকরণ। তৃতীয় স্থান পান গতবারের চ্যাম্পিয়ন কে. ভিটল।

ফ্লাই ওয়েটে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন তামিলনাড়ুর ই. রুকনাকরণ। তুলেছেন মোট ১৯৫ কেজি। দ্বিতীয় হন পশ্চিমবাংলার ডি. বোস চৌধুরী। তৃতীয় অন্ধ্রের এম. রামচন্দ্র। অন্যদিকে ভারতীয় প্রতিনিধি 'অর্জুন' অনিল মণ্ডল (রেল) এক বছর প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকার পর প্রথম ব্যানটামে (৫৬ কেজি) নেমে দ্বিতীয় স্থান পান। তবে এই

DHANADHANYE
Price 50 Paise

YOJANA
(Bengali)

REGD. No. WB/CC-315
May 1—15, 1978

পশ্চিমবাংলার তপন ঘোষ আন্তরাজ্য ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় হেভি ওয়েটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন

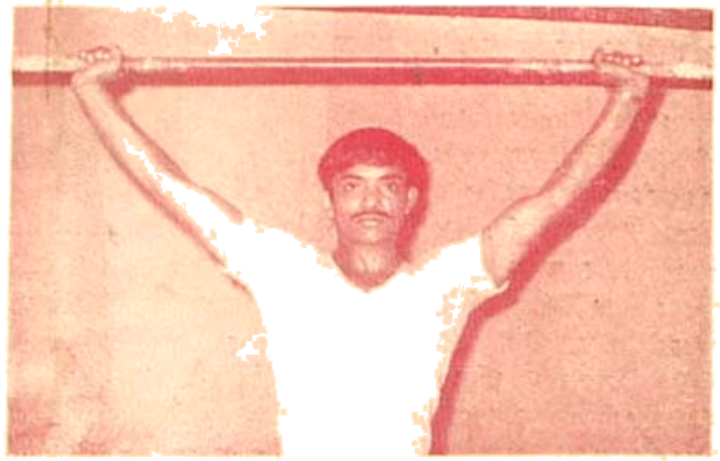

ফ্লাইওয়েট-এ মুনির খান প্রথম আবির্ভাবেই প্রথম হয়েছেন

দিবাংগে প্রথম হয়েছেন রেলেরই অপর প্রতিযোগী তাবিল দিনতান (মোট ২২০ কেজি)।

দ্বিতীয় দিনে সার্ভিসেসের কুড়ি বছরের দুঃখুট নয়া মুদর্ধন তরুণ ভিসপি কেজি ব্যান্টাম নাইট হেভি ওয়েটে দুটি সর্বভারতীয় রেকর্ড করে সবাইকে অবাক করে দেন। সতবীর সিং যেখানে ১২৫ কিলোর বেশী তুলতে পারেননি সেখানে ভিসপি প্রথম বারেই তোলেন ১২৩ কেজি।

মিডল ওয়েটে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ও অর্জুন বাল বুবধানন্দ সাবজেই জয়ী হয়েছেন। তিনি গত বছরের চেয়েও ৫ কেজি বেশী (মোট ২৬২.৫) তুলেছেন।

শেষ দিনে ভারোত্তোলনে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে। মোট হল রেলওয়েজের আদি কে ইরাণী সুপার হেভি ওয়েটে দুটি রেকর্ড ভাঙার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। তার চেয়েও বড় ঘটনাটি হলো এবারের প্রতিযোগিতায় আগামী ওয়ার যোগ্যতামান [illegible] হয়েছেন একমাত্র [illegible] হেভি ওয়েটে [illegible] রাজ্যের যোগীন্দর সিং তার সম্মান বজায় রেখেছেন দ্বিতীয় স্থান দখল করে। এই বিভাগে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রতিযোগিতায় বাংলার তপন ঘোষ দ্বিতীয় হয়েছেন। মিডল হেভিতে প্রথম হয়েছেন প্রয়াগী রাজকুমার।

মোট ১৫১ পয়েন্ট পেয়ে সার্ভিসেস এবছর সর্বপ্রথম ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হলো। গোল বারের বিজয়ী রেলওয়ে এবারও রানার্স হল ১৩৩ পয়েন্ট পেয়ে। চল্লিশতম আন্তরাজ্য প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র দখল করলো প্রথম স্থান।

ভারতীয় ভারোত্তোলক সংস্থা কমনওয়েলথ গেমসে যোগদানের জন্য সম্ভাব্য পাঁচ জনের নাম ঘোষণা করেছেন। আদি ইরাণী ছাড়াও এঁদের মধ্যে মুনির খানও আছেন।

সারা ভারতবর্ষ থেকে আগামী এশিয়ান গেমসে (কানাডার এডমনটনে) মাত্র যোগ্যতামান অতিক্রম করেছেন মাত্র একজন। কারণ হিসাবে দেখা গেছে ভাল সাজসরঞ্জাম ভাল খাবার এবং শিক্ষিত কোচের অভাব। অভাব রয়েছে আরও অনেক কিছুর। তার প্রতিবিধান করতে হবে—যেমন শরীর বিশেষজ্ঞের নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে, স্পোর্টস মেডিসিনের সাহায্য নিতে হবে। 'ভারীদের' এক জায়গায় এনে কোচিং এবং অনুশীলনের ব্যাপারটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বয়সোপযোগী খাদ্য গ্রহণ এবং ঠিক বয়সে ভারোত্তোলন শুরু করা ভবিষ্যতে শীর্ষ স্থান দখল করার অন্যতম হাতিয়ার। 'মর্টন' বলে মুরুপানন্দনের মতে এটা শুরু করা উচিত ১২ বছর বয়সে।

বিশ্ব প্রতিযোগিতার চলচ্চিত্র খেলোয়াড়দের দেখিয়ে তাদের গ্যান-ধারণা ও কৌশলগত জ্ঞান বাড়ানোর দিকেও নজর দেওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। খেলোয়াড়দের নিজেদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সারা বছর অনুশীলন করে যাওয়া উচিত যে ভারেই হোক না কেন।

অভাব অসুবিধা অনেক আছে। চেষ্টা হচ্ছে কিছু কিছু হচ্ছেও। কিন্তু একটা কথা উল্লেখ না করে পারছিনা। জাতীয় ভারোত্তোলনের মত একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কেন নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে করা গেল না? সাধারণ মানুষ যাদের যেখানে আদর বসছে প্রায়ই। তাছাড়াও মনে দেখেছি বিকৃটারদের ড্রেস করা বা ওয়ার্ম-আপ করার জায়গার খুবই অভাব।

কেশবলাল ভাশ

বাংলা, ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. জি. রামকৃষ্ণন।
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পত্রিকা-বিধিনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্লাডস্টো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

পঞ্চাশ পয়সা

১ - ১৫ জুন ১৯৭৮

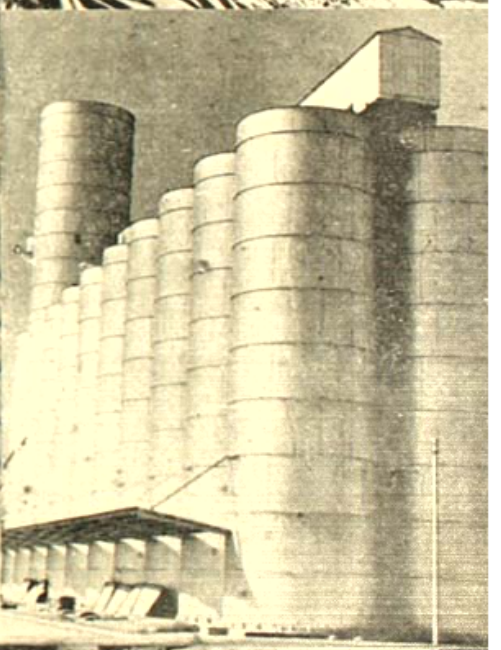

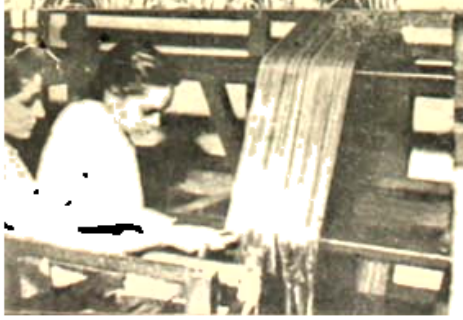

চিঠি

মহাশয়,

আমি বনবাণী পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। আপনাদের প্রকাশিত পত্রিকা এতদিন আকর্ষণীয় এবং সুখপাঠ্য হয়ে উঠছে এজন্য আপনাদের আমার ধন্যবাদ। সাম্প্রতিক ১-১৫ এপ্রিল সংখ্যাটি পড়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে। 'পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির দুই দিক' নিবন্ধের লেখক শিশিরকুমার বাদ দেবী বিস্তারীভাবে নিয়ে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। ওনার কৃতির লেখাটি তথ্য-ভারাক্রান্ত নীরস হয়ে ওঠেনি এবং সরবরিতার আন্তরিকস্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও প্রশ্ন 'কৃষি বিপ্লবের সুফল তাহলে কোথায় গেল?' গ্রামবাংলার পরিবর্তনে কৃষিজীবীর অবদান বর্ণনা খুবই যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী হয়েছে। সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও যুক্তিযুক্ত। সুশোভন সরকার 'কলকাতা বইমেলা' একটি ছোট সুন্দর আলোচনা। প্যারীলী বসু অনেক সময় দিয়ে এবারের মহিলাবন্দরের আলোচনাটি লিখেছেন। এ সংখ্যায় 'শেষ খেয়ার পঙ্কজকুমার' এবং নবনাটোর পুরোধা বিজন ভট্টাচার্য' বিশিষ্ট সংযোজন। এই সংখ্যা থেকেই 'গ্রাম বাংলার কড়চা' প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদককে অশেষ ধন্যবাদ। আহা, আমাদের মুরবানাম কি উঠে গেল? অনুরোধ—'বনবাণী'তে আরো দুটো বিভাগ সংযোজন করুন (এক) কবিতার পাতা, (দুই) ছোটদের পাতা। তাহলেই বনবাণী সর্বাঙ্গসুন্দর সবার উপযোগী এক সুন্দর পত্রিকা হয়ে উঠবে।

মিতা দাস
বামাঘাট, দমদম।

মহাশয়,

আমি 'বনবাণী' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও অনুরাগী। এই পত্রিকায় যেভাবে কৃষি, শিল্প, সাহিত্য ও বিবিধ বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয় তা অন্য কোন পত্রিকায় সাধারণত দেখা যায় না। গত ১-১৫ এপ্রিল সংখ্যাটিও পড়লাম। পূর্বের বারেই সংখ্যাটিও পড়েছি। এই সংখ্যায় 'শেষ খেয়ার পঙ্কজকুমার' ও 'নবনাটোর পুরোধা বিজন ভট্টাচার্য' রচনা দুটি পড়ে আনন্দ পেলাম। সরূপ বসু ও সত্যানন্দ গুহকে ধন্যবাদ। সুশোভন সরকার 'বইমেলা' এবং অনোদ দেবের 'দুধা থেকে পত্তি' লেখা দুটি চমৎকার। অনেক কিছু জানতে পারা গেল লেখা দুটি থেকে। তবে, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি হল শিশিরকুমার বাবের 'পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির দুই দিক'। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের গ্রামবাংলার কৃষিক্ষেত্রের প্রকৃত রূপটি সম্বন্ধে অবহিত হবেন নিশ্চয়ই লেখাটি পড়ে। 'খেয়ার মাঝি দুখে যায়ে' পড়ে সত্যিই বিচলিত হলাম। সাকী লেখাগুলোও সুন্দর হয়েছে। 'তাপ' গল্পটি মনে তাপ ফেলার মত না হলেও মন্দ নয়। সব মিলে সংখ্যাটি উপভোগ্য ও মনোগ্রাহী। 'বনবাণী'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি কামনা করি।

বুদ্ধদেব দাস
বৈদ্যর পাড়া লেন,
খুরুট, হাওড়া-৭১১১০১।

আগামী সংখ্যায়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ—ড: অবনীনাথ দত্ত
আকাশবাণীর পঞ্চাশ বছর—বি. ডি. কেসকার
রাজধানীর বসন্তবেলায় ওঁদের বাজার—দেবব্রত সরকার
ক্যাক্টাস (গল্প)—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
বেতুল ও নারীশিক্ষা—সুচেতন সিংহরায়
এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

'বনবাণী' ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিবেশ, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'বনবাণী'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্যের হার ঃ
একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য মণিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। গ্রাহকরা ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ডিভিশন। কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে ২০% কমিশন পাবেন। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাবলিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ও গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা :
বনবাণী, পাবলিকেশন্স ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯.
ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
শিশিরকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক
পীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

জনস্বাস্থ্য

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অগ্রণী পাক্ষিক

১৭—৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫
১—১৫ জুন ১৯৭৮
নবম বর্ষ ঃ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

আমদানি রপ্তানির নতুন ধারা
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ২

অর্থনৈতিক শুমারী—প্রাথমিক পর্যালোচনা
বিশেষ প্রতিনিধি ৪

সমাজ সেবা পরিকল্পনা—কয়েকটি দিক
ডঃ ডি. টি. দাস্তাওয়ালা ৫

কাঁচের বেয়াল
দেবযানী ৯

পরিবার কল্যাণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ
গোপালকৃষ্ণ রায় ১১

বিজ্ঞান প্রযুক্তি
সফর্ষণ রায় ১৩

সংবাদ ১৫

খেত খামার
কাজী নুরুন্নিসুল আমেরিন ১৬

নিত্য সংস্কৃতি
নির্মল বর ১৭

গ্রন্থ আলোচনা
কল্পনা রায় ১৯

জানা অজানা ২০

প্রাঙ্গণ
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

সম্পাদকীয়

মদ্যপান ও জনস্বার্থ

মদ্যপানের কুফল, বিপদ ও ঝুঁকি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার না থাকলেও এই সম্পর্কে অনেক ঘটনা কথার ক্ষেত্রে করণীয় আছে অনেক। এই জনমত গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন স্বার্থান্বেষী মহল থেকে মদ্যপান নিরোধের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হয়ে থাকে তার পুনরুক্তি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। তাদের বক্তব্য হল মদ্যপান নিরোধের ফলে মদের উপর আরোপিত শুল্ক থেকে সরকারের যে রাজস্ব আদায় হয় তা বন্ধ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সরকারের আয় কমে যাবে; মদশিল্প ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মীরা তাদের জীবিকা হারাবে, অর্থাৎ বেকারি বাড়বে এবং বেআইনী মদ তৈরীর লাইসেন্স না দেওয়া হলে বেআইনী চোলাই মদের ব্যবসা বেড়ে যাবে, ফলে মদ্যপানজনিত দুর্ঘটনা বাড়বে।

মদ্যশুল্ক বাবদ বছরে আদায় হয় আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা আর মদ বিক্রী হয় আনুমানিক ২০০০ কোটি টাকার। মদ্যক্রেতাদের অধিকাংশই হল অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর লোক যারা তাদের স্ত্রী সন্তান পরিজনদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও অন্যান্য সুখসুবিধার প্রয়োজন উপেক্ষা করে তাদের স্বল্প আয়ের মোটা একটি অংশ ব্যয় করে মদ খাওয়ার উচ্ছৃঙ্খল তৃপ্তিতে। মদ্যপান বোধ করা হলে এদের অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের ক্রয়ের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। চাহিদা মেটাতে স্বভাবতই তখন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বেড়ে যাবে এবং বাড়তি উৎপাদন শুল্ক থেকে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং মদ বর্জনে সরকারের রাজস্বের যে ক্ষতি হবে তা পূরণ হয়ে যাবে উৎপাদন শুল্কের বাড়তি আয় থেকে। অনুরূপভাবে মদশিল্প ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মীদের বিকল্প কর্মসংস্থান হবে ভোগ্যপণ্য তৈরীর নতুন নতুন কারখানায়। বে-আইনী মদ চোলাই বৃদ্ধির আশঙ্কাও অমূলক। তামিলনাড়ু ও গুজরাটে যেখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ, সেখানে চোলাই মদ পান করার ফলে মৃত্যুর ঘটনা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশী নয়।

যারা পানাসক্ত তারাও মদ্যপানের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলে থাকেন যে মদ্যপানে মনে সজীবতা আসে ও কর্মক্ষমতাও বেড়ে যায়। তাছাড়া মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের অর্থ হল ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা। কিন্তু ডাক্তারী গবেষণায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মদ্যপানে একদিকে যেমন শরীরের বিভিন্ন অংশে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তেমনি মনের ভারসাম্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লোপ পায়। একথাও আজ স্বীকৃত যে মদ্যপদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই বেপরোয়া মনোভাব শুধু নানা সামাজিক অনর্থেরই কারণ নয় ব্যক্তিগত জীবনেও ডেকে আনে চরম বিপর্যয়। তাই যে ব্যক্তিস্বাধীনতা আর দশজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সে স্বাধীনতা কখনও স্বীকৃতি পেতে পারে না। একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে হলে মদবর্জনের সপক্ষে জোরালো জনমত গড়ে তুলতেই হবে।

আমদানি রপ্তানির নতুন ধারা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

যে-কোনো দেশের যে-কোনো নীতিরই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটা মূল্য থাকে। সেই মূল্য যদি কমে যায় তবে পুরোনো নীতিকেও আঁকড়ে থাকার আর কোনো অর্থ হয় না। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে এই কথাটা খুবই খাটে। বিশেষ করে আমদানি নীতি সম্পর্কে।

স্বাধীনতার পর থেকে আমদানি নীতির প্রধান কথাই ছিল নিয়ন্ত্রণ আর কড়াকড়ি। অর্থাৎ বিদেশ থেকে মাল আনতে হলে অনেক বেড়া ডিঙিয়ে। সেই নীতি অনেকেরই পছন্দ হয় নি, বিশেষ করে কল-কারখানার মালিক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের। সরকারী মাল আনতে গিয়ে পার্মিট লাইসেন্স বিদেশী মুদ্রা ইত্যাদি যোগাড় করতেই তারা দিবালিশ খেটে যেতেন। কিন্তু কতোই অপছন্দ হোক, সেই নীতি অনুসরণ না-করে তখন উপায়ও ছিল না। একে তো যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রার অভাবে ইচ্ছামতো মালপত্র আমদানির সুবিধে ছিল না, তার ওপর ছিল দেশের মধ্যে নতুন কল-কারখানাকে রক্ষার প্রশ্ন। কারণ বিদেশ থেকে অঢেল তৈরি মালপত্র আসতে দিলে দেশী জিনিসপত্র মার খেত।

এখন একদিকে যেমন দেশের শিল্প-বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি অন্য দিকে বিদেশী মুদ্রার সেই টানাটানির দিন আর নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা কীভাবে ঠিকমতো খরচ করা যায় সেটাই এখন সরকারের অন্যতম প্রধান চিন্তা। দেশের মধ্যে যে-সব জিনিস তৈরি হয় তা দিয়েও আমদানি করতে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না অধিকাংশই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অনেকের কল-কারখানার ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে আগেকার সেই কড়াকড়ির নীতিরও কোনো অর্থ হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারও তাই নতুন পথে চলতে শুরু করেছেন। আমদানি নীতিতে শুরু হয়েছে নতুন পর্ব।

এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছে ১৯৭৮-৭৯ সালের আমদানি নীতি পেশ করতে উঠে বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া বলেন, এই নীতির মূলে দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বড় রকমের রদবদলের সূচনা হলো। তিনি খুব বাড়িয়ে বলেন নি, যদিও তিনি যাকে বড় রকমের রদবদল বলছেন তার শুরু ১৯৭৭-৭৮ সালের আমদানি নীতি (অর্থাৎ জনতা সরকারের প্রথম আমদানি নীতি) থেকেই। এমন কি কংগ্রেস শাসনের শেষ পর্ব থেকেই এর আরম্ভ বললে ভুল হয় না। তবে জনতা সরকার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ব্যাপারটাকে শুধু ত্বরান্বিত করেন নি, অনেক বেশি সুপরিকল্পিতভাবে এগোতে চাইছেন বলে মনে হয়। বাণিজ্য দপ্তরের সচিব শ্রীআলেক-জাণ্ডারের নেতৃত্বে তাই গঠন করা হয় একটি কমিটি। আলেকজাণ্ডার কমিটি সুপারিশ করেন, আমদানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি শিথিল করা হোক। তাঁরা এ-কথাও বলেন যে, আমদানি নীতি যেন এক বছরের বদলে তিন বছরের ভিত্তিতে। সম্প্রতি ঘোষিত আমদানি নীতি অবশ্য এক বছরের জন্যেই। তবে এর মেয়াদ বাড়ানোও যেতে পারে।

নতুন আমদানি নীতির কল্যাণে কল-কারখানার মাল তৈরির জন্যে প্রকৃত ব্যবহারকারীরা লাইসেন্স ছাড়াই প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আনতে পারবেন। ইস্পাত বা লোহার তৈরি মালপত্র আনার জন্যেও পৃথক অনুমতি লাগবে না। লাইসেন্স লাগবে শুধু সেই সব ক্ষেত্রে যে-সব পণ্যের আমদানিতে ব্যাপারিদের রয়েছে। রপ্তানি-পণ্য তৈরির জন্যে রপ্তানিকারকেরা প্রয়োজনীয় যে-কোনো উপকরণই আমদানি করতে পারবেন।

কল-কারখানার জন্যে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আনার পথও আগের তুলনায় অনেক সুগম হবে। আমাদের দেশে এখন নানা রকমের যন্ত্রপাতিই তৈরি হচ্ছে। তবে সরকার মনে করছেন, বিদ্যুৎ, সার, পেট্রোলিয়াম, পেট্রোলিয়ামভিত্তিক রসায়ন, ওষুধ প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিদেশ থেকেও যন্ত্রপাতি আমদানির সুযোগ থাকা উচিত। কল-কারখানা ছাড়া আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে (যেমন হাসপাতাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান) যাদের বিদেশী সাজসরঞ্জামের দরকার হয়। তাদের প্রকৃত ব্যবহারকারী হিসেবে গণ্য করে আমদানির সুযোগ দেওয়া হবে।

বিশেষ সুযোগ পাবে ছোটখাটো কল-কারখানাও। ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে যে কেউই তিন লাখ টাকা পর্যন্ত দামের মাল আমদানি করতে পারবেন। তপশীলভুক্ত জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠির কেউ অথবা কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত কেউ যদি অনগ্রসর এলাকায় নতুন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে তিনিও পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত দামের সাজসরঞ্জাম আনতে পারবেন বিদেশ থেকে।

যে কোনো নীতিতে যদি কড়াকড়ি থাকে তবে সেই নীতিগত কড়াকড়ির চেয়ে বেশি বিড়ম্বনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের দাপট। আমদানি নীতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এখন যে শুধু নীতির ক্ষেত্রেই কড়াকড়ি কমে গেল তাই নয়, আমদানির জন্যে লাইসেন্স ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারটাও বিকেন্দ্রিত করা হলো। প্রত্যেক লাইসেন্সিং অফিসেই এখন থেকে থাকবেন

একজন করে জনসংযোগ অফিসার। আবেদন পেশ করার আগে আবেদনকারী যাতে সব ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারেন সে-বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করাই হবে এই অফিসারের কাজ। এর ফলে আবেদন নিষ্পত্তির কাজ দ্রুততর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আবেদন পেশ ও আবেদন মঞ্জুরের পদ্ধতিও অনেক সরল করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, নতুন নিয়মে বহু ক্ষেত্রে আমদানি লাইসেন্স চাওয়ার দরকারই হবে না। শ্রীবাড়িয়া বলেছেন, তিরিশ বছর ধরে আমদানির কড়াকড়ির যে 'মাকড়সার জাল' জমে উঠেছিল তা এখন খুব হালকা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে আমদানির নতুন নীতি একটা 'দিকচিহ্ন' বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে নীতির পরিবর্তন ডেকে আনতে পারে তা আমরা দেখেছি। অপ্রয়োজনীয় বাধানিষেধ দূর হলে কল-কারখানা ও অন্যত্র যে কাজকর্মের সুবিধে হবে, সে কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু প্রশ্ন উঠতে পারে, এই নতুন আমদানি নীতির ফলে দেশের শিল্পের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পের কোনো লোকসান হবে কিনা। শ্রীবাড়িয়া অবশ্য জানিয়েছেন, নতুন নীতিতে অত্যাবশ্যক নয় এমন সব পণ্য, অথবা বিলাস পণ্য আমদানিতে উৎসাহ দেওয়ার কোনো চেষ্টা নেই। সরকারী শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং কুটীর শিল্পের রক্ষা-কবচের ব্যবস্থাও আছে। এই সব শিল্পের জন্যে যে-সব পণ্য সংরক্ষিত আছে সেগুলির আমদানি সাধারণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রীবাড়িয়া বলেছেন, নতুন নীতিতে নজর রাখা হয়েছে যাতে প্রয়োজনার লক্ষ্যগুলি পূর্ণ হয়। সেই সব লক্ষ্যের অন্যতম হলো কাজের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রযুক্তির প্রয়োগবিদ্যার মাধ্যমে সেই সুযোগ সৃষ্টি করাই জনতা সরকারের লক্ষ্য। নতুন আমদানি নীতিতে বিদেশ থেকে অর্থাৎ সাধারণত উন্নত দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনার কড়াকড়ি কমানো হয়েছে। উন্নত দেশে যন্ত্রপাতি তৈরি হয় সেই সব দেশের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে। উন্নত দেশের যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈরি হয় যাতে শ্রমিকের দরকার হয় কম। অর্থাৎ সেই সব যন্ত্র হবে সাধারণত আমাদের প্রয়োজনের বিপরীতধর্মী। সুতরাং এই যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যাপারে সতর্ক না থাকলে আমাদের দেশে উৎপাদন বাড়লেও কাজের সুযোগ সেই অনুপাতে হয়ত বাড়বে না।

শ্রীবাড়িয়া এই আশাও ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা যখন বিদেশী পণ্য আমদানির ব্যাপারে কড়াকড়ি কমালাম, এবার উন্নত দেশগুলিও আমাদের কাছ থেকে আরো বেশি পণ্য আমদানি করবে। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। ধনী দেশ গরীব দেশের কাছ থেকে ক্রমশ বেশি করে জিনিসপত্র কিনবে, ফলে গরীব দেশের আয় বাড়বে—এই আশার ভিত্তিতে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা বেশ কিছু দিন ধরেই চলছে। এ পর্যন্ত সেই চেষ্টা যে খুব বেশি ফলবতী হয়েছে তা নয়। তবু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গত কয়েক বছরে ভারতের রপ্তানি বেশ কিছুটা বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৭-৭৮ সালেও সেই ধারা অব্যাহত আছে। হিসেব পাওয়া গেছে অবশ্য ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ আর্থিক বছরের প্রথম নয় মাসের। ঐ কয় মাসেই রপ্তানির মোট অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৩,৯৫২ কোটি টাকার বেশি। পূর্ববর্তী বছরের ঐ নয় মাসের তুলনায় এই অঙ্ক শতকরা পৌনে নয় ভাগের মতো বেশি।

নতুন বাণিজ্য নীতিতে রপ্তানি আরো বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে রপ্তানিকারকদের নগদ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা ১৯৭৮-৭৯ সালেও চালু থাকবে। কুটীর শিল্পে তৈরি পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্যেও গৃহীত হচ্ছে বিভিন্ন ব্যবস্থা। কিন্তু আমদানির মতো রপ্তানির ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয়ে সরকারী সতর্কতার প্রয়োজন। কারণ এর আগে আমরা দেখেছি যেন তেন প্রকারেণ রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টায় কী ভাবে দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা পণ্যের ঘাটতি। সেই সব পণ্যের মধ্যে অনেকগুলিই নিত্য-প্রয়োজনীয়। যেমন, আলু পেঁয়াজ সস্তি নুন বাদাম সুতো ইত্যাদি। ঘাটতি দেখা দেওয়ার স্বাভাবিকভাবেই ঐ সব পণ্যের দাম চড়ার ঝোঁকও দেখা দিয়েছিল।

জনতা সরকার অতীতের এই ভ্রান্তির পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের রপ্তানি বন্ধ করেছেন। তার ফলে দেশের বাজারে দেখা দিয়েছে ভাল প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যবসায়ী-শিল্পপতি মহলের একাংশ থেকে দাবী উঠেছে, রপ্তানির ব্যাপারে এই ধরনের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হোক, কারণ এর ফলে নাকি অনেক জিনিসের দাম পড়ে যাচ্ছে। কোনো বিশেষ পণ্যের অঢেল উৎপাদনের ফলে যদি সাময়িক উদ্বৃত্ত দেখা দেয় এবং দাম খুব কমে যায় তবে তার রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু প্রতিটি পণ্যের কথাই বিবেচনা করতে হবে পৃথকভাবে এবং সর্বাগ্রে দেশের মানুষের চাহিদার কথা মনে রেখে।

সবচেয়ে যা মনে রাখা দরকার, কোনো বিশেষ পণ্যের চাহিদা দেশের মধ্যে আপাতত কম মানে এই নয় যে, সব মানুষের চাহিদা মিটে গেছে। আসলে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই ক্রয়ক্ষমতার অভাবই রয়েছে এই উদ্বৃত্তের মূলে। রপ্তানিতে এই সমস্যার সাময়িক সমাধান হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী সমাধান হবে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াসে। জনতা সরকারের উদ্যোগ এই প্রয়াসেই কেন্দ্রীভূত হোক।

অর্থনৈতিক শুমারী
—প্রাথমিক পর্যালোচনা

বিশেষ প্রতিনিধি

দুই পরিকল্পনার একটা নির্ভরযোগ্য উপাদানই হ'ল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান। যদিও উন্নতির অবকাশ রয়েছে তবুও গত তিন দশক কৃষি পরিসংখ্যানের বেশ ভাল একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সংস্থা, ব্যবসা, পরিবহণ ও নির্মাণ সংস্থার মতো অর্থনীতির অকৃষিক্ষেত্রের যে সব পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

কতকগুলি সুসংগঠিত ক্ষেত্র সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করা হলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইনের অধীনে যেসব রেজিস্ট্রীকৃত উৎপাদক সংস্থা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে বার্ষিক শিল্প সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অ-কারখানা সংস্থা, অর্থাৎ যেসব সংস্থায় বিদ্যুতের ব্যবহার করা হয় কিন্তু কর্মী সংস্থা ১০-এর কম বা যেসব সংস্থায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় না এবং কর্মী সংখ্যা কুড়ির কম এসব সংস্থা সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই। অনুরূপভাবে রেলওয়ে বা বিমান পরিবহণ সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া গেতে পারে কিন্তু দেশের সড়ক বা নদী পরিবহণ সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যাবে না। ব্যবসা, নির্মাণ ও সেবা (Service) এসব ক্ষেত্র সম্পর্কেও বিশেষ তথ্য নেই। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তথ্যের অভাবের ফলে একদিকে এই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা সম্ভব হয়নি, অপরদিকে কোন কোন ক্ষেত্র চড়া মাত্রার করের দাবী জারী রেখেছে। এসব ক্ষেত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এই তথ্য থেকে যে, আমাদের জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ আসে এইসব সংস্থা থেকে, আর এইসব সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছে আমাদের মোট শ্রমশক্তির এক পঞ্চমাংশ। এটা খুবই স্পষ্ট যে দেশের উন্নয়নে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কাজেই সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের স্বার্থেই অসংগঠিত অকৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং কাঠামো সম্পর্কে বিশদ তথ্যাদি প্রয়োজন।

সেইজন্য ভারত সরকার ১৯৭৬ সালে দেশের অর্থনীতির অকৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলির কাঠামো, উৎপাদনতা ও সাফল্য সম্পর্কে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক শুমারী চালাবার এবং পরে কতকগুলি সমীক্ষা চালাবার ব্যবস্থা করেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী অকৃষি অর্থনীতির প্রতিটি বড় বড় ক্ষেত্রের অসংগঠিত অংশগুলিতে বিভিন্ন সংস্থার অবস্থান ও তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলা পর্যায়ে এই সব সংস্থার বিনিয়োগ, উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদনের মূল্য এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে হিসাব তৈরী হবে।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা অর্থনৈতিক শুমারীর সাময়িক ফলাফলের যে প্রাথমিক পর্যালোচনা করেছেন তাতে দেখা যায় দেশে ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার অকৃষি সংস্থা রয়েছে। এগুলিতে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৮০ হাজার ব্যক্তির স্বাভাবিক কর্মসংস্থান রয়েছে আর এদের মধ্যে ২ কোটি ২৩ লক্ষই অর্থাৎ ৮৮'৬ শতাংশ হ'ল ভাড়াটে কর্মী। সংস্থাগুলির ৫৫ শতাংশই হ'ল গ্রামাঞ্চলে যেখানে মোট কর্মীর ৪০ শতাংশ কাজ করেন। মোট সংস্থার ৮৩ শতাংশেরই অবস্থিতি মালিক বা নিয়োগকর্তার আবাসস্থল থেকে দূরে। ১১'৫ শতাংশ সংস্থা আবাস গৃহ সংলগ্ন আর ৩'৩ শতাংশের নিজস্ব কোন স্থান নেই।

প্রকাশিত এই ফলাফল কিছুটা অসম্পূর্ণ কারণ জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যাণ্ড (যেখানে শুমারীর কাজ এখনও চলছে), মহারাষ্ট্রের কতিপয় জেলা ও আরও কয়েকটি রাজ্যের ছোট ছোট কয়েকটি অঞ্চলের তথ্য এই ফলাফলের মধ্যে ধরা হয়নি।

সিকিম ও লাক্ষাদ্বীপ ছাড়া সমগ্র দেশে ১৯৭৭ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই অর্থনৈতিক শুমারী চালানো হয়। এই শুমারীতে অকৃষি তৎপরতায় নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থার কাঠামো, কাজের প্রকৃতি ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানা গেছে। যে সব সংস্থায় নিয়মিত ভিত্তিতে একজন বা একাধিক ভাড়াটে কর্মী রয়েছে সেইসব সংস্থাকেই শুধু এই শুমারীর আওতায় আনা হয়েছে। পারিবারিক ভিত্তিতে যে সব সংস্থা চালিত সেগুলিকে এর মধ্যে ধরা হয়নি।

পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে এখন শুমারীর ফলাফল বিশদভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার জন্য যে তথ্য প্রয়োজন তার উপরেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আগামী দুই বছরের মধ্যে নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে অকৃষি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ, সম্পদ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং বেতন সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা হবে। শুমারী ও সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য জেলা পর্যায়ে পাওয়া যাবে অকৃষি তৎপরতার প্রতিটি বড় বড় ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে।

সমাজ সেবা পরিকল্পনা — কয়েকটি দিক

ডঃ ডি.টি.লাকডাওয়ালা

যে সব প্রশ্নের কাঠামোর সামাজিক পরিকল্পনা রচনা করা হতে থাকে, সে সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় পছন্দের রীতি, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পছন্দের সম্পর্ক এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও সমস্যাদির সামাজিক ও কারিগরী দিকের মধ্যে সম্পর্ক—আমি যতদূর জানি এখনও এসব প্রশ্নের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন হয়নি। এমন কি এসব ব্যাপারে যেটা একেবারে গোড়ার কথা তাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এখন পর্যন্ত আমাদের কৃতিত্বের সব চেয়ে বড় দিক হ'ল—কারিগরী দক্ষতা ও সাফল্য সম্পর্কে একটা আকর্ষণীয় দিগন্ত সৃষ্টি করা, যার আমাদের চরম ধার্যতম সম্ভবত সাধারণ মানুষের দক্ষতা না বাড়াতে পারা এবং তার কাজ ও বসবাসের পরিবেশের কোন লক্ষণীয় উন্নতি সাধন করতে না পারা। এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ জ্ঞানের অভাবই হয়ত এরূপ পরিস্থিতির জন্য কিছুটা দায়ী।

সরকারী ও বে-সরকারী ব্যয়

পরিকল্পনায় বরাদ্দ মোট ব্যয়ের মধ্যে সমাজসেবা খাতের ব্যয়ের আনুপাতিক হার কমেই যাচ্ছে। প্রথম যোজনায় ২১ শতাংশের জায়গায় দ্বিতীয় যোজনায় তা কমে দাঁড়ায় ১৩·৩ শতাংশ। চতুর্থ যোজনা পর্যন্ত এই হার মোটামুটি স্থির থাকে। সংশোধিত পঞ্চম যোজনায় তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩·২ শতাংশ। এটা সমাজ সেবাকে ক্রম অগ্রাধিকার দেবারই ইংগিত বহন করছে। আমাদের পরিকল্পনার সমর্থনে তিনটি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। প্রথমত, প্রথম যোজনার পর থেকে সমাজসেবার ব্যবস্থাদি ১২ গুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। আর টাকার দাম কমে যাওয়ার বিষয়টি ধরলেও বলতে হবে, বেশ মোটা টাকাই এক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমাজসেবা খাতে বিনিয়োগ ও অনাবর্তক রাজস্বের ভাগ বেশ কম এবং আবর্তক অংশ যা প্রতিটি যোজনার শেষে পরিকল্পনা বহির্ভূত বরাদ্দ হয়ে দাঁড়ায় তার ভাগ বেশ বড়। সুতরাং ঠিক মত তুলনা করতে হলে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত এই দুটি খাতকে মিলিয়ে ধরা উচিত। এই পদ্ধতিতে আমরা দেখতে পাই কেন্দ্র ও রাজ্যের ধারের একটা মোটা অংশই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়ে এসেছে। আর তৃতীয়ত, (এটা অবশ্য বিতর্কিত বিষয়) সমাজসেবা খাতে যে সামান্য কাজ হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় আমাদের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হলে সমাজসেবা খাতে ব্যয় পরিমাণ বরাদ্দ করাও বেশ কঠিন কাজ। কাজেই খাত ও উপখাতে ব্যয়ের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যালোচনা করা ও সেই বাবদ উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখা দুইই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৪-৭৫ সালে সরকারী প্রশাসনিক বিভাগগুলির সবগুলি ভোগ্য ব্যয়ের ২১·৪ শতাংশ ছিল সমাজসেবা খাতে ব্যয়। সমাজসেবা খাতে ব্যয়ের একটা মোটা অংশ আসে হস্তান্তর ও অনুদান হিসেবে। এই হস্তান্তর ও অনুদান ধরে এই খাতের পরিমাণ ছিল প্রশাসনিক ব্যয়ের মোট পরিমাণের ৪৩·২ শতাংশ। সমাজসেবা খাতে সরকারের মোট যা ভোগ্য ব্যয় তার প্রায় অর্ধেকটাই ব্যয় শিক্ষা খাতে, আর স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় এক পঞ্চমাংশ।

সমাজসেবা খাতে বে-সরকারী ব্যয় নির্ধারণ আরও কঠিন কাজ। ২৮ তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে মাসিক মাথা পিছু ব্যয়ের গড় ছিল শহরাঞ্চলে যথাক্রমে ১ টাকা ৩৬ পয়সা ও ১ টাকা ৪৩ পয়সা এবং গ্রামাঞ্চলে ২৬ পয়সা ও ১ টাকা ২ পয়সা। প্রাইভেট চিকিৎসের জন্য মাসিক মাথা পিছু ব্যয়ের গড় ছিল শহরাঞ্চলে ১৩ পয়সা এবং গ্রামাঞ্চলে এক পয়সা। আর ডাক্তার নার্স ও ধাত্রীর জন্য মাসিক মাথা পিছু ব্যয়ের গড় ছিল শহরাঞ্চলে ১৭ পয়সা আর গ্রামাঞ্চলে ১১ পয়সা। গ্রামাঞ্চলে একজন গৃহস্থের মোট ব্যয়ের ১·৯২ শতাংশ ব্যয় হয় ঔষধপত্র এবং ০·৪৯ শতাংশ শিক্ষা খাতে। আর শহরাঞ্চলে এই হার যথাক্রমে ১·৯৪ ও ১·৯২ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে স্বাস্থ্যখাতে সরকারী পর্যায়ে যা ব্যয় হয় তার তিনগুণ বেশী ব্যয় হয় বে-সরকারী খাতে, অন্যদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী স্তরে যা ব্যয় হয় বে-সরকারী স্তরে ব্যয় তার এক তৃতীয়াংশেরও কম। বেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বে-সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের আনুপাতিক হার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে অনেক বেশী। খরচাপ্রতি একটি পরিবারের মাথাপিছু মোট ব্যয়ের ১১ থেকে ২০ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল ঔষধ-পত্র ও শিক্ষা খাতে। কোন কোন রাজ্যে এই হার ছিল ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। যাই হোক শহরাঞ্চলে এই ধরণের ব্যয়ের আনুপাতিক হার মোটামুটি একই ধরণের ছিল। এই আন্তরাজ্য অসমতা সমাজসেবা ব্যয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের সম্পর্কটি তুলে ধরে। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে উন্নত রাজ্যে সমাজসেবা খাতে ব্যয় কিছু বেশী হয়ে থাকে। যাই হোক এর আবার ব্যতিক্রমও আছে, উত্তর পূর্বাঞ্চলে ও কেরালায় এক্ষেত্রে বে-সরকারী ব্যয় বেশী।

শিক্ষা

২৭ তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে দেশের গ্রামাঞ্চলের মোট মানুষের ৯৪·২০ শতাংশেরই কোনরকম দক্ষতা নেই।

মেয়ে পুরুষ ভাগ করলে, মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৯'৭৩ শতাংশ আর পুরুষদের ক্ষেত্রে ৯১'৭৮ শতাংশের কোনরকম ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা বলতে কিন্তু ভুতা সেলাই থেকে আরম্ভ করে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব রকম কাজেরই ক্ষমতার কথা বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে শহরের মানুষের মধ্যে ৮৭'১ শতাংশের কোন রকম ক্ষমতা নেই। মেয়েদের মধ্যে ৯১'০৫ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৮১'৩৮ শতাংশ। এই হিসেবই জানিয়ে দিচ্ছে অবস্থাটা খুব সুবিধের নয়।

সাক্ষরতার অবস্থাটা সকলেরই জানা। লক্ষণের চেয়ে পরিস্থিতি এক্ষেত্রে কিছুটা ভাল। গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ২০ শতাংশের মতো। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত ১০ শতাংশেরও কম, কোথাও কোথাও ৫ শতাংশের কম। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার সমস্যা খুবই তীব্র—বিশেষ করে অন্ধ্র, আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় এবং সামগ্রিকভাবে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে। এই সব অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা তেমন প্রসার লাভ করেনি। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে যে আমরা পৌঁছতে পারিনি তার একটা বড় কারণ হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি নি। তৃতীয় সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মোট জনসংখ্যার ২৪'৪ শতাংশে এক কিলোমিটারের মধ্যে এবং ১৭ শতাংশে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক স্কুল নেই। যে সমস্ত এলাকা তপশিলী সম্প্রদায় ও উপজাতি অধ্যুষিত সেই সব এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সুবিধার অভাব আরও বেশী প্রকট। রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে সম্পদের অভাব ও তাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার উপর দোষ চাপাতে পারে। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে শিক্ষার সুযোগসুবিধা বৈষম্য যতটা প্রকট একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এই বৈষম্য আরও বেশী প্রকট। কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় উপজাতি ও তপশিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে যোগদানের হারের কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তপশিলী সম্প্রদায় ও উপজাতিদের মধ্যে প্রচেষ্টা কিছুটা জোরদার হয়েছে। তবে এখনও অনেকটা এগোতে হবে। ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তপশিলী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ১০'৯ শতাংশ এবং উপজাতীয়দের সংখ্যা ৫'৩ শতাংশ। ১৯৭১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপশিলী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ১৪'৬ শতাংশ আর উপজাতীয়দের সংখ্যা ৬'৯ শতাংশ।

শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে কার্যকারিতা ও ব্যয়ের উপযোগিতা এই প্রশ্ন দুটি থেকে গেলেও মনে হয় লক্ষ্যের যোগান ঠিকমত থাকলে ভবিষ্যতে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হল সেই সংখ্যায় সাক্ষরতার তথ্য প্রতিফলিত হয় না। পড়তে পড়তে যারা পড়া ছেড়ে দেয় তাদের সংখ্যাটা বিরাট আর এদের অধিকাংশই বিস্মৃতীকরণে ফেরত।

এসব সমস্যার সমাধানের জন্য দরকার সম্পদের। তবে সমস্যাটা এতই ব্যাপক যে শুধু সম্পদ ঢুকিয়েই এর সমাধান হবে কিনা তা বলা কঠিন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক, অনমনীয় কাঠামোর আওতা থেকে বের করে এমে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জনগণ ও গৃহস্থালীর চাহিদার মধ্যে একটা সংগতি থাকে। তা ছাড়া প্রত্যেকের জন্য যে কোন বয়সে এবং বছরের যে কোন সময়ে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার পথ খোলা রাখতে হবে। এর অর্থ শিক্ষা পদ্ধতি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হবে এবং তা অঞ্চলের কাজকর্ম ও কর্মসংস্থান প্রভৃতির অঙ্গ হবে। বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রাথমিক শিক্ষা এবং কর্মগত দক্ষতার সঙ্গে কৃষি বিকাশ ও গ্রামীণ উন্নয়নের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। উচ্চ ফলনশীল আবাদ, ব্যাঙ্ক আমানত, সার প্রয়োগ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও লক্ষ্য করা গেছে।

আমাদের শিক্ষাগত সমস্যা দ্বিমুখী। প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাক্ষরতা ও দক্ষতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, চাহিদা অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বেকারদের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলেই এই সমস্যার স্বরূপ ধরা পড়বে। গ্রামাঞ্চলে যারা জমীর সন্ধান করছেন তাদের শতকরা ৭১ জনই হলেন হয় নিরক্ষর না হয় প্রাথমিক স্তরের কম শিক্ষায় শিক্ষিত। বাকীরা প্রাথমিক থেকে আরম্ভ করে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যদিকে নগরাঞ্চলে যারা কাজ খোঁজেন তাদের শতকরা ৩৮ জন হয় নিরক্ষর না হয় প্রাথমিক স্তরেরও কম শিক্ষা পেয়েছেন আর বাকীরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা পেয়েছেন। কাজেই বেকারদের মধ্যে শিক্ষিতদের মধ্যে বেশী। এ থেকে মনে হচ্ছে শিক্ষা লোকেদের কাজে নিয়োগের উপযুক্ত তো করে তোলেই না তার বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পর্কে একটা তীব্র অনিচ্ছাবোধ গড়ে তুলে তাদের আরো কাজের অনুপযুক্ত করে তোলে। যে কোন বেকারই সমাজের অপচয় আর একজন শিক্ষিত বেকার নানা দিক থেকে অপচয়। তাকে শিক্ষিত করে তুলতে যে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় তাও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সংগতি রেখে পেশাগত শিক্ষার প্রসার ও দক্ষতা বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করবার যে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবের কথা তেবেই ভারতে গত কয়েক বছর ধরে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রভর্তি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মূল সমস্যাটা হল শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং অতিরিক্ত ছাত্রভর্তিকে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলা।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষিত বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি শুধুমাত্র নগরাঞ্চলে সীমিত রাখার প্রয়োজন নেই। কৃষি রূপান্তরের গতিবেগ বাড়াতে বিশেষ করে কৃষি সম্প্রসারণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত করতে শিক্ষিত প্রশক্তির একটা বোঝা মংশেরই কাজ চলে পারবে। এক্ষেত্রে কর্তব্য হল যাদের দক্ষতা আছে যে সব এলাকায় এই দক্ষতার প্রয়োজন আছে সেই সব অঞ্চলে তাদের স্থানান্তরিত করা এবং ভবিষ্যতের শিক্ষা ও দক্ষতা সৃষ্টির কর্মসূচী অর্থনৈতিক চাহিদামুখী করে তোলা।

স্বাস্থ্য

ভারতের জনগণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ শিক্ষার সুযোগ সুবিধার চেয়ে স্বাস্থ্যগত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছেন, তবে এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের চাহিদাকে পূরণ করতে পারছে না। স্বাস্থ্য খাতে যে সামান্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এটা তারই পরিণতি। তুলনা করলে দেখা যায় ১৯৭৩-৭৪ সালে শিক্ষা খাতে বে-সরকারী ভোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ যেখানে ৩৫৯ কোটি টাকা সেখানে শিক্ষাখাতে সরকারী ভোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১,৩৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে যেখানে বে-সরকারী ভোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ ৮৪৩ কোটি টাকা, সেখানে সরকারী ভোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ২৮০ কোটি টাকা। তবে একথাও বলা ঠিক হবে না যে, বাজেট ও পরিকল্পনা রচনাকারীরা অন্যদের সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ইচ্ছা করেই স্বাস্থ্যের চেয়ে শিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাহলে কি সমস্যাটা অন্যত্র? প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নির্দিষ্ট বেতনক্রমের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকরা যেখানে গ্রামে যেতে উদ্গ্রীব সেখানে ভরতুকী দেওয়া প্রশিক্ষণ পেয়েও চিকিৎসকরা গ্রামে যেতে ইচ্ছুক নন। শিক্ষা প্রসারে যে 'চাপ' কাজ করছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব তেমনটা নেই। টাকা পাওয়া গেলেও গ্রামাঞ্চলের জন্য স্বাস্থ্য পরিকল্পনা রচনায় সমস্যা অনেক বাধা আসে।

অতীতে সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতালের কাঠামোর ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে রোগ নিরাময় ও নিবারণের ব্যবস্থা করা এবং চিকিৎসক এবং অন্য চিকিৎসক কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানো ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই সব ব্যবস্থা রোগ নিবারণের ক্ষেত্রে অনেকটা সফল হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া, আয়ু বেড়ে যাওয়া, মহামারের মতো রোগগুলির নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলীকরণ নিশ্চয়ই সন্তোষজনক ঘটনা। তবে, আরও কতকগুলি দিক রয়েছে যার উপর জোর দেওয়া উচিত।

আমার বক্তব্য হল গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যখাতে যে সব সুযোগ সুবিধা বরাবর দেওয়া হয়েছে সেগুলির উপর যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। এটা শুধু অতিরিক্ত সম্পদ সংস্থানের প্রশ্ন নয়, এটা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ—প্রাপ্ত সম্পদ আর্থিক ও বাস্তব দিক থেকে কোন খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে তার প্রশ্ন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতার খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তবুও ঐ দুটি খাতে অগ্রগতি তেমন আশানুরূপ নয়। রোগ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের অভিমত সমর্থন করেছে। ওঁরা বলে করেন পানীয় জল সরবরাহ এবং পরিচ্ছন্নতার উন্নতি সাধন করলে গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে। বিশেষজ্ঞরা বলে করেন স্বাস্থ্যখাতে যা বিনিয়োগ করা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে তার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। প্রকৃত সমস্যা হল স্থানীয় পর্যায়ে সস্তা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষার নীতিগুলি পৌঁছে দেওয়া। উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসা কর্মীর উপর নির্ভর করা এবং রোগ নিরাময়ের উপর গুরুত্ব দেবার বর্তমান ব্যবস্থাদি প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবস্থা, জটিল রোগের কেসগুলি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রেরণের সুবিধা এবং রোগ নিবারণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসা খাতে বর্তমানে যা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে তাই পুনর্বণ্টন করে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব। এমন একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হবে যাতে আধা চিকিৎসা কর্মীদের এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপিত হতে পারবে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যের নূতন পরিকল্পনার এই মৌল বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এর সাফল্য নির্ভর করবে সস্তা স্বাস্থ্য কর্মীদের ও আধাচিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণ, জনগণের উৎসাহ ও আগ্রহ, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সস্তা স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে একেবারে নিম্নতর পর্যায়ের স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের উপর।

মূল্য

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে প্রধানতঃ মানবিক মূলধনখাতে বিনিয়োগ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে, যে বিনিয়োগ করা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমসুযোগ সৃষ্টির মার্থে। কিন্তু মূল্য নির্ধারণকে বে-সরকারী ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। একটা পরিষ্কার

দেখে বেখানে যথেষ্ট পরিমাণ খালসমৃদ্ধ পাওয়াও একটা সমস্যা সেখানে গৃহনির্মাণে খুব সকলী না হলে ভরতুকী দেওয়ার কথা ওঠে না।

গৃহনির্মাণ নীতির ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় কথা তা হল বেসরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দান—বিশেষ করে মালিক ও সমবায়ের ক্ষেত্রে। ভূমিহীনদের বাস্তুজমি দেওয়ার কর্মসূচীকে ইতিমধ্যেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পঞ্চমাঞ্চলেও গৃহনির্মাণের জন্য ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ এবং পঞ্চরাজ্যের জন্য যে নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে তার অতিরিক্ত জমি সামাজিক কাজে লাগানো যেতে পারে। এই নীতির নকশা হওয়া উচিত গৃহাদি নির্মাণের কাজে জমির ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া। পঞ্চরাজ্যে জমির পরিমাণ সীমিত। কাজেই বহুতল বাড়ী তৈরীর বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত এবং জমির সর্বাধিক ব্যবহারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার স্বার্থে একটা ভূমি কর ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

আর একটি দিকে কিছু কাজ হলেও আশানুরূপ ক্ষেত্রে এখনও তেমন ফল পাওয়া যায় নি। এটা হ'ল গৃহনির্মাণের ব্যাপারে কম দামী উপকরণের ব্যবহার যাতে গৃহ-নির্মাণের সুবিধাদি দরিদ্র জনগণের কাছেও পৌঁছে যায়। আমরা এমন বাড়ী তৈরী করার কথাও ভেবে থাকতে পারে যেখানে মালিক নূতনত্ব ন্যূনতম কাঠামোর বাড়ী তৈরী করবেন, পরে তার বায় করবার সামর্থ্য বাড়ার সঙ্গে বাড়ীও সম্প্রসারিত হবে। যদিও একথা ঠিক যে কম খরচে গৃহ নির্মাণের সুবিধা থাকলেও গৃহনির্মাণে ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থের যোগান দিতে হবে।

শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টির মতো সমাজ সেবার আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে কিন্তু স্থানাভাবে তা বিশদভাবে আলোচনা করা যাচ্ছে না। যদিও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই বিবেচনাযোগ্য তবে প্রশ্ন হ'ল আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে কি কি সম্ভব তা ঠিক করে নেওয়া। স্বভাবতঃ সেই ব্যবস্থাগুলিই বেছে নিতে হবে যেগুলি দরিদ্রের সবচেয়ে বেশী উপকারে আসে। আমাদের অবস্থায় সেই সব সমাজ সেবা ব্যবস্থা নিতে হবে উন্নয়ন প্রয়াসের উপর যার প্রভাব পড়বে। যে ক্ষেত্রে খরচ বেশী সেখানে বাছাই-এর কাজ ভণাঙ্কণের ভিত্তিতে করতে হবে। যদি কাজগুলি মূলতঃ কল্যাণধর্মী হয় তবে দেখতে হবে ঠিক কাদের কাদের এই কর্মসূচীর আওতায় আনা দরকার, তারপর দেখতে হবে একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাদের সবার কাছে ঐ কাজের ফল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব কিনা। যেখানে তা সম্ভব নয় এবং যদি ঠিকমত বাছাই করা হয় এমন কিছু সুবিধের লোকের জন্য এই কল্যাণ কর্মসূচী নেওয়া হয় তবে তার ফলে হতাশা ও অসন্তোষ বাড়বে।

অনেক সময় এই যুক্তিও দেখানো হয় যে গৃহনির্মাণ বাদ সমাজ সেবা ব্যবস্থা যদি সম্প্রসারিত করা যায় তবে তাতে যান বেড়ে যাওয়ার ফলে অর্থনীতির উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়বে এবং শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রকৃত সমস্যা হ'ল স্থানীয় পর্যায়ে শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার নিরূপণযোগ্য সূচকের সঙ্গে বিনিয়োগ কৌশলের সম্পর্ক আরও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। এই প্রশ্নের সমাধান যুক্ত পর্যায়ের পরিকল্পনায় খুবই সহায়ক হতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে যদি সেবার সুযোগগুলি পৌঁছে দেওয়া যায় তবেই তা খুব কার্যকর হবে। কিন্তু সেই সুযোগগুলি এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে স্থানীয় সমষ্টি গণনের ভিত্তিতেই তা বন্টন করতে পারে। আর কর্মসূচীগুলি এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে সামগ্রিকভাবে জনসমষ্টির এবং পুরস্থানীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কাজেই এইসব কর্মসূচীর ব্যয় বহন ও মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহনির্মাণের মত ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে স্বাধীনতা, সুযোগ, এমনকি জীবনের মতো মৌল সামাজিক মূল্যবোধের সমস্যার যোগ রয়েছে। কাজেই অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন বরাবরা নিয়ম অনুসরণ করা যাবে না। যে তিনটি বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব দিতে চেয়েছি সেগুলি হ'ল—(১) বস্তুর সম্ভব জনগণের চাহিদার সঠিক পরিমাপ করা। (২) সমাজ-সেবা কর্মসূচী থেকে কি পরিমাণ সুফল পাওয়া যেতে পারে তাও বিশদভাবে জেনে নেওয়া এবং (৩) স্থানীয় পর্যায়ে সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে এই ধরনের ব্যয়ের যে সম্পর্ক আছে তার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করা।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল সামগ্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিনিয়োগনীতি রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ও বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক স্তরে সেবামূলক কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা। গত দু' দশক ধরে এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হলেও তা তেমন বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের দেশে রূপায়ণের স্তরে প্রশাসনিক ব্যয়গুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে যা সমষ্টির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যাদির সমাধানে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী।

ধনধান্যে পড়ুন, দেশকে জানুন

গ্রাহকমূল্য ঃ একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা

গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রদের ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়।

এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯-এ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্নান সেরে গা মুছতে মুছতে মণিকা পাশের ডাইনিং ঘরে সুজিতের গলার আওয়াজ পেলো। সুজিত তাহলে নাকি খেতে বাড়ি এসেছে। সকালে বলে গেছিল অফিসে অনেকগুলো ফাইল জমেছে, দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে অফিসের ক্যান্টিনেই যা হোক কিছু খেয়ে নেবে; তাহলে বাড়তি কিছুটা সময় হাতে পাওয়া যাবে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করছিল মণিকা।

অবশ্য সুজিতের গলা শুনে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল না মণিকার। ধীরে সুস্থে চুল আঁচড়ে টিপ পড়লো। তারপর কি ভেবে আবার ফিরে এলো বাথরুমে। বাচ্চাদের কাঁচা আনাকাপড় সাবানজলে চুবোনো ছিল, সেগুলো পরিপাটি করে কাঁচলো। তারপর ছাদে গিয়ে একটি একটি করে দড়িতে টাঙিয়ে দিল। এইসব শেষ করে ডাইনিং রুমে এসে যখন দাঁড়ালো ততক্ষণে সুজিতের খাওয়া শেষ হবে গেছে, অফিসে ফেলার জোগাড় করছে সে। মণিকাকে দেখে হাসলো সুজিত,—"কি খান হ'ল?" মণিকাও হাসিমুখে ঘাড় নাড়লো। —"চিঠি আছে কোনও?" "পীতুদির একটা চিঠি এসেছে আজ।" মণিকার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলো সুজিত। চিঠি পড়া শেষ করে ঘড়ির দিকে চাইলো, —"আচ্ছা, চলি তাহলে। কিরতে একটু দেরী হবে আজও।" উত্তরে মণিকা মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লো আবার।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই সুজিতের স্কুটারের আওয়াজ শোনা গেল এবং ক্রমে সেটার বাঁকে মিলিয়ে গেল সে আওয়াজ। ঝি শান্তি এসে জিজ্ঞেস করলো—"আপনে খানা লাগাই দেবেনাব?" —"হ্যাঁ।" বালকনিতে রোদ্দুরে বসে ধীরে সুস্থে খেলো মণিকা।

বাবলু ও বুনিয়া দুজনেই ঘুমোচ্ছে। সারাবাড়ি নিঝুম। যতক্ষণ জেগে থাকে ওরা বাড়িতে যেন হুলুস্থুল পড়ে যায়। শান্তি পুরোনো ঝি, বাচ্চাদের নোটামুটি সামলে নেয়। কিন্তু বাচ্চাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো ও বাসন মাজানো—এতেই লাঞ্চের ঘন্টা বাজে মণিকার। বাবলুর বয়স দেড়বছর, বুনিয়ার চার বছর। মাত্র আড়াই বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে মণিকার ·····মনে হয় যেন এই সেদিন। অথচ এর মধ্যে কত কিছু বদলে গেছে!

আগে সুজিতের অফিস থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরী হলে অস্থির হয়ে উঠতো মণিকা। মনে আছে বিয়ের পর সুজিত যখন প্রথম টেম্পরারী ডিউটিতে তিন দিনের জন্যে চণ্ডীগড় গেল। তিনটে দিন যেন তিনটে বছর। তৃতীয় দিন বিকেলে ফিরে এলো সে। ঘুমোর সর্দ্দার ঢেকে গেছে। ফুল বাসের কড়া রোদ্দুরে চণ্ডীগড় থেকে ছুটোতে এসেছে। বন্ধুরা বলেছিল অন্তত বিকেল অবধি অপেক্ষা করে যাও, রোদটা একটু পড়ুক। কিন্তু সুজিত থাকেনি। বাড়িতে যে মণিকা একা, বয়েছে তারই পথ চেয়ে ····· । মণিকা অবাক লাগে। একি সেই সুজিত? এখন কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না সে। অফিসের কাজ আর বাড়ির কাজ।

সেদিন পাশের বাড়ির মিসেস আয়েঙ্গার বলছিলেন—"তুমি সত্যিই লাকী মণিকা, কিস্টার মোহের মত হাজবেণ্ড পেয়েছ। তোমাকে কত ফুলপু করেন।" সে কথা সত্যি। বুনিয়া হবার সময় বাড়ি থেকে কেউ আসতে পারেনি। সুজিত মণিকার যা যত্ন করেছে মণিকার মা কাছে থাকলেও তার বেশী কিছুই করতে পারতেন না। শুধু কি মণিকার যত্ন? বাচ্চা ছেলে বাবলুর দেখাশোনার ভারও সুজিতের উপর ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল মণিকা। সেই দামাল ছেলেকে সামলানো সহজ কথা নয়। এখনও মণিকার শরীর খারাপ থাকলে সুজিত হাসিমুখে ওর বোজকার কাজগুলোর অনেকখানিই করে দেয়। "এরকম স্বামী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা" মনে মনে নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে মণিকা। আর প্রাণপণে চেষ্টা করে পাড়ার অন্যান্য "নিগ্লেক্ট" বৌদের মত 'পতিপরায়ণা' হতে।

দ্বিতীয় বাচ্চাটা হবার পর বেশ মোটা হয়ে পড়েছিল মণিকা। ডেলিভারির মাস তিনেক পর থেকেই উঠে পড়ে লেগেছে অতিরিক্ত মেদ কমানোর চেষ্টায়। বাচ্চা দুটোকে সামলাতেই প্রায় সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবু এরই মধ্যে সুযোগ পেলেই নতুন ব্যায়ামের "রেসিপি" নোট করে রাখে। সুজিতের জন্যে টুকিটাকি রান্না করে এক আধদিন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সুজিত। সুজিতের জন্যে পুরোভাব নুনবে একটা—বড়, ভিভাইন, সব মেপে রেখেছে সে। সংসার খরচের টাকা

থেকে দরজা করছে একটা মোটারকম অঙ্ক। ডুবি অনের জন্যে একটা সিল্কীপুরী কার্পেট চাই, আর চাই নতুন এক সেট পর্দা। সুজিতের স্বপ্ন ছ'ল একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি·····।

"ঠিক পথেই চলেছি আমরা"—নিজেকে আশ্বাস দেয় বণিকা। আশে-পাশের সব মাঝারি লোকেদের জীবনযাত্রাই তো এমনি। আসলে পুরোপুরি গিন্নী হ'তে পেরেছে সে এতদিনে। শুধু মনটাকেই রাখে রাখতে পারেনা সব সময়। দুপুর বেলা বাচ্চা দু'টোকে পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন তন্দ্রা নামে চোখে। হঠাৎ মনে হয় যেন কে এসে আলতো করে গালে ঠোঁট ছোঁয়ালো। —"অফিস পালিয়ে এলেছি। ওরা সবাই বিচিং বিচিং' দেখতে গেল। আমি চলে এলাম আমার বউকে দেখতে·····।" চমকে ধড়মড় করে উঠে বসলো বণিকা। কেউ কোথাও নেই, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল সে। বাজে পাঁচটা বাজে। সামনের রাস্তা দিয়ে অগুন্তি গাড়ি চলছে। অফিস থেকে ফিরছে সবাই। বণিকার বাড়িতে কোনও তাড়া নেই। সুজিত বাড়ে সাতটার আগে ফিরবে না। অনেক কাজ জমে গেছে অফিসে।

বণিকা মনে মনে হাসলো। বিশ্রী লেগে গিছি বেচারাকে। আমিও তো সবসময় পেরে উঠি না। ও কাছে নেই বলে এতটুকু খারাপ লাগছে না তো। বরং ভালো লাগছে। তাড়াহুড়ো করে চা করতে হ'বে না, জামা কাপড় বদলাতে হ'বে না। ধীরে সুস্থে খবরের কাগজ পড়তে পারবে সে। পরিপাটি করে চুল বাঁধবে অনেকক্ষণ ধরে। বেছে পছন্দসই শাড়ি পরবে, ম্যাচ করা ব্লাউজ। বড় করে টিপ আঁকবে কপালে। শান্তি বাচ্চাদের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাবে। বণিকাও এক চক্কর ঘুরে আসবে। মনে বাচ্চাদের খেলা দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ফিরে এসে সেরী ম্যাগাজিনের একটা বই টেনে নেবে। এর মধ্যে একসময় সুজিতের ফুটবের আওয়াজ শোনা যাবে। সামনের দরজা খুলে ঘরে আসবে সুজিত। ততক্ষণ বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকবে বণিকা। তারপর বই বন্ধ করে ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলবে,—"এসো। চা দিতে বলি?" পাশের চেয়ারটায় বসে পড়বে সুজিত। ছেলে মেয়ের কুশল প্রশ্ন করবে। দু'টিনাটি নানা কথা বলবে দু'জনে। সন্ধ্যেবেলা হয়তো কেউ বেড়াতে আসবে, কিংবা ওরাই কারও বাড়ি যাবে। রাতি গল্পের ভিতর দিয়ে কেটে যাবে সময়। শান্তি এসে একসময় ধরবে ঝুলে যে ডিনার বেডী। খেয়ে দেয়ে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোতে উল্টোতে ঘুমে চুলে পড়বে দু'চোখ·····।

·····"সত্যি আমি সাক্ষী"—সুজিতের ফুটবটা রাস্তায় যাকে বিদিয়ে গেলে সেইদিকে চেয়ে নিজের মনে বলে বণিকা, "আমি সাক্ষী। আমি সাক্ষী।" যেন রক্ষা কবচের মত এই ক'টা শব্দকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সে। বণিকা কি ভয় পেয়েছে? কিসের ভয় তার, কিসের অভাব? স্বামী, ছেলে, মেয়ে নিয়ে ভরপুর সংসারে কোথায় যেন ছিদ্র হয়ে গেছে। সেই ছিদ্রপথে অতীতের অশরীরী ছায়ারা খোয়া ফেরা করে। জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ফেলে আসা দিনগুলিতে।

"উওম্যান এ্যাণ্ড হোম"-টা টিপয়ের উপর রেখে উঠে পড়ে বণিকা। নাঃ, এভাবে দিবাস্বপ্ন দেখলে চলবে না। মনটা ক্রমশই যেন কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায় বণিকা, কিন্তু অবাধ্য মন শত কাজের মাঝেও ধীরে ধীরে আগল খুলে বেরিয়ে পড়ে, যেরে যায় কোন নিষিদ্ধ আলেয়ার পিছে।

"সিরাজ!" নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকে ওঠে বণিকা। এ কার নাম সে উচ্চারণ করলো! এক যুগ আগে যেচ্ছায় যাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, গত কয়েকবছরের মধ্যে একবারও যার কথা চিন্তা করার অনুমতি সে নিজেকে দেয়নি, তারই স্মৃতি আজ তার অলস দুপুরের মুহূর্তগুলো ছেয়ে ফেলতে চায়। শুধু আজই নয়, কিছুদিন থেকেই সে অনুভব করছে কার ছায়া যেন চুপি চুপি ঘুরে বেড়ায় তার চারিপাশে। রাত্রে যখন সুজিতকে শুভরাত্রি জানিয়ে পাশ ফিরে মাথা পর্যন্ত লেপ টেনে নেয় বণিকা আর দু'চোখের অঝোর ধারায় তার মাথার বালিশ ভিজিয়ে দেয় মনে হয় আলতো করে কে যেন তার মাথায় হাত রাখে, মৃদু কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়, "কাঁদেনা মণি ছিঃ।" মণি! কে যেন ডাকতো তাকে এই নামে। কে জানে কোথায় সে। সে আজও এই পৃথিবীতে আছে কিনা তাও জানে না বণিকা। এতটুকু সন্ধানের চেষ্টাও রাখেনি তারা।

সেদিন সন্ধ্যায় নাইট্‌স্‌ব্রিজের বাস স্টপে বিদায় নিয়েছিল। মনেপ্রাণে যেনে নিতে চেষ্টা করেছে তা বিদায়ের অমোঘ আদেশ বলে। "এ যে হ'তে পারে না সিরাজ, কিছুতেই হ'তে পারে না।" সিরাজের বিনতিভরা চিঠির উত্তরে সেই একই কথা আবার লিখেছে সে। অনুরোধ করেছে আর যেন চিঠি না লিখে তাকে। সিরাজও যেনে নিয়েছে সে অনুরোধ।

জীবনের ধারা তাদের দু'পথে ছুটেছে, কোনও দিনও মিলবে না আর। পাশে পাশে, কাছে কাছে যে ক'টা দিন পেয়েছে তার স্মৃতিটুকুই অক্ষয় হয়ে আছে। কৃপণ যক্ষের মত মনের সিন্দুকে চাবি দিয়ে রেখেছিল বণিকা। ভুলেও কখনো চাবি খোলেনি, পাছে সে স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উত্তাল ঝটিকার তোলে তার জীবনে। আজ এতবছর পরে কেন যে সেই টুকরো টুকরো দিনগুলো এমন সজীব হয়ে উঠেছে ভেবে পায়না বণিকা।—"হয়তো আমারই দোষ। সুজিতের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিই না আমি।" ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে। ও খুব ভালভাবেই

২০ পৃষ্ঠার দেখুন

পরিবার কল্যাণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

গোপালকৃষ্ণ রায়

প্রায় দু' দশকের অধিক কাল ধ'রে যে প্রকল্পটি ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা অর্জন করেছিল—জরুরী অবস্থার ধাড়াধাড়িতে তার অপমৃত্যু ঘটেছে। যে মেয়েটি তিল তিল ক'রে তিলোত্তমা হ'য়ে উঠেছিল—তাকে একটি দুর্বৃত্ত-চর কার্বোলিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়ে কদাকার করে দিয়েছে।

সেই কদাকার মূর্তিটিকে গ্রহণে এখন অনেকেই অনীহা প্রকাশ করছে—সবাই যেন তাকে পর্দার আড়ালে রেখে—নিশ্চিন্ত না হোক স্বস্তি পেতে চায়।

জরুরী অবস্থার কবলমুক্ত থেকে মুক্তি এনে কেন্দ্রে নূতন জনতা সরকার সেই তিলোত্তমাটিকে কসমেটিক সার্জারী ক'রে আবার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হ'য়েছেন। পরিবার পরিকল্পনার রূপান্তর ঘটিয়ে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে জনতার দুয়ারে পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও জনতা সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার তিন মাসের মধ্যেই ব্যাপক পরিবার কল্যাণ প্রকল্প ঘোষণা ক'রেছেন এবং কিছু কাজও হয়ত হয়েছে, কিন্তু এরমধ্যেই যেন কেমন আত্মসন্তুষ্টির ভাব দেখা দিয়েছে। আত্মসন্তুষ্টি যে আত্মঘাতী, আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

পরিকল্পনার বর্ণন যত সুন্দর এবং প্রতিশ্রুতিবহুই হোক, একথা ভুললে চলবে না যে, দেশে প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের জন্ম হ'চ্ছে। ১৯৭৬ সালে দেশের জনসংখ্যা ৬০ কোটির মাত্রা ডিঙিয়ে গেছে। গত ৩০ বছরে বুড়া সংখ্যা বাদ দিলে অন্তত ২৫ কোটি মানুষ সংযোজিত হয়েছে। জনসংখ্যা এই হারে বাড়তে দিলে—কোন মঙ্গলিক পরিকল্পনা কোনদিনই মঙ্গলময় হ'য়ে উঠবে না। উপোবনের সংখন শিক্ষাকে ফিরিয়ে এনে মিশ শতাব্দীর মানুষকে সংযমী ক'রে তোলা একটি দুরূহ সংকল্প মাত্র। আবালের জন্মনিরোধ ও জন্মরাসের প্রয়াস অত্যন্ত বিজ্ঞান-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। অস্ত্রোপচারকে আবশ্যিক না ক'রেও—বিজ্ঞানভিত্তিক আরও অনেক ব্যবস্থা আছে—যা জন্ম-নিরোধে সহায়ক হ'তে পারে।

কসমেটিক সার্জারী ক'রে যে নূতন প্রকল্পটিকে গ্রহণ করা হয়েছে—তাতেও 'ছোট পরিবার'-এর প্রয়োজনকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। জন্মশাসনের জন্য সহবকরের জন্মনিরোধ ব্যবস্থার সন্ধান রাখা হয়েছে এবং জনসাধারণের উপরই তা গ্রহণ ও ব্যবহারের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অস্বীকার করার স্থান নেই—জনতার বিবেকের কাছে এই আবেদন রাজনৈতিক পরিভাষায় গণতান্ত্রিক ও মর্যাদেন ভাষায় প্রশংসনীয়।

জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে পরিবার পরিকল্পনাকে কেতাবে 'কলঙ্কিত' করা হ'য়েছে—জনতা সরকার নয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই কলঙ্ক মোচনের উদ্যোগ নিয়েছেন। কলঙ্কিত অধ্যায় নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। দায়ী উহা জরুরত জুড়ে যে ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি হয়েছে—তা কারো অবিদিত আছে বলে মনে হয় না। একদিকে যেমন বৃদ্ধকে রেহাই দেওয়া হয়নি—অপরদিকে অবিবাহিতদের চিরকালের জন্য পিতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যদিও পশ্চিম-বঙ্গে এই ধরণের অত্যাচারের কাহিনী কম, তবে এখানে নিষ্ঠাচার বিরুদ্ধ অন্যান্য প্রদেশের খবর অনেক-অনেক বেশি।

১৯৭৬-৭৭ সালে এই পরিকল্পনাটিকে বস্তুত পক্ষে লাটে-বাজারে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ব্যাপারটি যে নিতান্তই "ব্যক্তিগত এবং গণগত"—তা কাউকে ভাবতে না দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢালাও আদেশ জারীগত করে অস্ত্রো-পচার (?) করা হয়েছে। কোন কোন ডাক্তার নাকি রাতারাতি বাড় দিয়ে একদিনেই বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নির্বীজ ক'রে দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে, একটা অস্ত্রোপচারের জন্য কতপক্ষে যে সতর্কতা গ্রহণের প্রয়োজন—তাও গ্রহণ করা হয়নি। সব ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখলে—অনাচার ছাড়া একে আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। এই জন্যেই পরিকল্পনাটি কলঙ্কিত হয়েছে। আর তার জন্যেই জনতা সরকার স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছেন—পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে জবরদস্তিকে চিরকালের জন্য বিদায় দেওয়া হল।

১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্বীজকরণ অস্ত্রো-পচারের জন্য খরচ হয়েছে ১৪৯ ছিল টাকা। এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে গত বছরের সরকারী অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, যেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রতি নির্বীজ-করণের খরচ হয়েছে ৫৪ টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে তা বেড়ে হল ৭১ টাকা এবং ৭৬-৭৭ সালে ১৪৯ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালে মোট নির্বীজ ও বন্ধ্যাকরণ হয়েছিল ৫৬,৪১৭, ৭৫-৭৬ সালে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ালো ২,০৬,৪২৮ এবং ৭৬-৭৭ সালে হল ৮,৪২,৫৯১। সমগ্র পরিবার পরিকল্পনার জন্য এই তিনটি আর্থিক বছরে খরচ হল মোট ২,৩০০'৭৫ লক্ষ টাকা। যে চিত্রটি তুলে ধরা হল—তা থেকেই পরিবার পরিকল্পনার ইতি-বৃত্তটি মননশীল মানুষ সহজেই বুঝে উঠতে পারবেন। প্রয়োচার মারক যে ঠ্যাংগাড়ে দল সমগ্র পরিকল্পনাকে জবরদস্তির পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল জনতা সরকার তাকে নির্বাসন দিয়েছেন। জবরদস্তিতে কলঙ্কিত সমগ্র পরিকল্পনাটিকে পুনরায় গণমুখী করার জন্য সরকারী স্তরে থেকে নূতন ক'রে প্রয়াস চালানো হ'চ্ছে। জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে সব দেশেই সব সরকারেরই বেশ কিছু সময় দরকার। সে সময় সরকারকে অবশ্যই দিতে হবে।

নূতন ক'রে আস্থা অর্জন করতে শুধু সরকারী প্রয়াসই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছা-সংগঠন এবং সর্বোপরি পঞ্চায়েতকে এগিয়ে আসতেই হবে। গ্রাম-ভিত্তিক ভারতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা যে কোন প্রকল্প রূপায়ণের পক্ষে বিশেষ কার্যকর ও প্রয়োজন। অতএব সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সক্রিয় ক'রে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। সব প্রচেষ্টা যদি যথাযথভাবে এগিয়ে চলে, তাহলে পরিবার কল্যাণ প্রকল্প ব্যর্থ হতে বাধ্য নিশ্চয়ই থাকবে না।

মানুষের মন যে অনুকূলে নয় তার প্রমাণ এই প্রকল্পের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে এবং সহযোগিতা একটু ভিন্ন ভাবে চললে পরিবার কল্যাণ-প্রকল্প যে একদিন "জন-আন্দোলনে" পরিণত হবে একথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। সরকারী সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে প্রথম ছ'মাসে দেশে প্রায় চার লক্ষাধিক প্রজননক্ষম নর-নারী নির্বীজ বা বন্ধ্যাকরণ স্বেচ্ছায় করিয়েছেন। এ বছরে জানুয়ারীর শেষ দিন পর্যন্ত এই স্বেচ্ছামূলক অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৬·৬ লক্ষে পৌঁছে গেছে। সংখ্যাটি অন্য বছরের তুলনায় কম হলেও হতাশাব্যঞ্জক আদৌ নয়।

আরো দেখা যাচ্ছে, গত বছরের এপ্রিল থেকে প্রথম ছ'মাসে নির্বাচিত ৫০ লক্ষ জন-নিয়োগ কার্যকারকদের মধ্যে ২৬ লক্ষাধিক মানুষ তা বাস্তবায়ন ক'রেছেন। এই বাস্তবায়ন মধ্যেও কোন জবরদস্তি ছিল না।

আমাদের দেশে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেশি। শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। এই দু'দিক বিচার ক'রে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী হলেও পরিবার সীমিত রাখার পক্ষে এগিয়ে এসেছেন এঁদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন। সেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা ৬৫। অশিক্ষিত গ্রামবাসীও যে সীমিত পরিবারের পক্ষপাতী তা নূতন ক'রে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তাদের যা প্রয়োজন তা যোগাবার আজ পর্যন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। যা কিছু করা হয়েছে, সবই যেন শহরের মানুষের জন্য। এইবার প্রথম জনতা সরকার প্রকল্পটিকে গ্রামমুখীন করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যাঁদের উপর রূপায়ণের দায়িত্ব, তাঁরা যদি নিষ্ঠাবান না হন তাহলে এই পরিকল্পনাও অতীতের পথ ধরে অন্তরালে চলে যাবে।

এই রাজ্যের কথাই ধরা যাক। কার্যত পরিবার কল্যাণ প্রকল্পটি এখন মৃতবৎ। এই নামে যে একটি প্রকল্প আছে তা যেন অনেক কষ্ট ক'রে মনে করতে হয়। কর্তৃপক্ষ মহল থেকে বলা হচ্ছে, স্বেচ্ছায় যারা নির্বীজকরণ করতে চান যে কোন অজুহাত দেখিয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা করা হয় না। কেন? তাঁরা কি প্রকল্পটিকে ব্যর্থ ক'রে দিতে চান? আশা করি সরকার এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কিন্তু নসবন্দী প্রকল্পে কি বলা হয়েছে? সরকার চাইছেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে। জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য এই প্রকল্প সম্পর্কে মানুষের মনে যে অবিশ্বাস জন্মেছে তা দূর ক'রে পরিকল্পনাটি প্রকৃত কল্যাণ-মুখী ক'রে তুলতে। 'ছোট পরিবার—সুখী পরিবার' এই বিশ্বাস মানুষের মনে গ'ড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনার গোড়াতেই জবরদস্তিকে বিসর্জন দেবার অঙ্গীকার করেছে।

অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই জনতা সরকার নয়া পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে জনশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়—যেখানে শিক্ষা বেশি সেখানে পরিবার সীমিত রাখার প্রবণতাও বেশী। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং বিদ্যালয়ক্ষেত্রে জনশিক্ষা চালু করার জন্য কিছু ব্যবস্থা উদ্ভাবন ক'রেছে। সাধারণ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জনশিক্ষা চালু করা যায় কিনা, তারও সম্ভাবনা বিবেচনা করা হচ্ছে।

মেয়েদের শিক্ষার প্রসার পরিবার সীমিত রাখার পক্ষে একটি কার্যকর পন্থা। গত একবছরে এরাজ্যে নির্বীজকরণের চেয়ে বন্ধ্যাকরণ বেশী হয়েছে। আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক আর না হোক, মায়েরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে নিজেরাই বন্ধ্যাকরণ করিয়েছেন। বারবার সন্তান ধারণের বিড়ম্বনা থেকে অনেক মা-ই এখন মুক্তি চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের জন্য সহযোগিতা প্রসারিত হয়নি। বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে স্বেচ্ছায় বন্ধ্যাকরণের সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। সরকার এ বিষয়ে ভেবে দেখতে পারেন।

যে অস্ত্রোপচার গোটা পরিবার পরিকল্পনাকে "কলঙ্কিত" ক'রেছে (আমার বিশ্বাস অস্ত্রোপচার ব্যতীত এই জন-বিস্ফোরণ বন্ধ করার বর্তমানে দ্বিতীয় পথ নেই) তাছাড়াও যেসব কন্ট্রেসেপ্টিভ পথ রয়েছে তার ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজন। এই কন্ট্রেসেপ্টিভ ব্যবস্থাগুলিকে দ্রুত জনপ্রিয় ক'রে তোলার জন্য কি কি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যায় সরকারকে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে পথ নির্দেশ করতে হবে। গতানুগতিক পথ ধ'রে চললে কন্ট্রেসেপ্টিভ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় ক'রে তোলা সম্ভব হবে না।

পরিশেষে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিছু করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে কলকাতার আঞ্চলিক আয়ুর্বেদ গবেষণা কেন্দ্র একটি জন্মনিয়োধক বটিকা উদ্ভাবন ক'রেছেন। ষাঁড়ের ক্ষেত্রে তার পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে। আশা করতে ক্ষতি নেই, এই বটিকা সত্যিই একদিন জন্ম নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

পশ্চিম বাংলায় লৌহযুগ

সত্যব্রত রায়

পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে তাদের পরি পরস্থ সব রকম শিলাস্তর পশ্চিম বাংলায় আছে। তাদের বৃহৎ অংশ মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকলেও ড্রিলিং করে তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সব রকম শিলাস্তর যেখানে আছে, সেখানে সব রকম খনিজ সম্পদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা। কাজেই সম্ভাব্য সৃষ্টিপাত করতে হবে বিভিন্ন যুগের শিলাস্তরের মধ্যে—অর্থাৎ বিভিন্ন বয়সের শৈলে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার আয়োজন করতে হবে।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা শুরু করার আগে কোন্ কোন্ খনিজের সম্ভাবনা আছে তা জানা দরকার। প্রথমে শিলাগঠনের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার স্তরের দিকে নজর দেওয়া যাক। নিম্নতন শিলাস্তর নামে কিসাইট, মাইকা-সিস্ট, কোয়ার্টজাইট প্রভৃতি পরিবর্তিত metamorphic) শিলা এবং তাদের সঙ্গে সর্পেন্টাইন গ্রানিট ও অন্যান্য আগ্নেয় শিলা, যাদের আমরা মূল আগ্নেয় শিলা বলে জানি। মূল আগ্নেয় শিলা বিভিন্ন রকম ধাতুর আকর। তাদের মধ্যে আছে টাংস্টেন (tungsten), তামা, সীসা-দস্তা, মোলাবডেনা, ম্যাগনেসাইট, লোহা প্রভৃতি। পরিবর্তিত শিলাস্তরগুলির সঙ্গে যেখানে যেখানে আগ্নেয় শিলার সংযোগ ঘটেছে, সেখানে সেখানে দেখা দিয়েছে ধাতুর সমাবেশ।

এই সব ধাতুর মধ্যে সবার আগে যে ধাতুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল লোহা।

লোহার কঠিন ঘুম ভারতবাসীরা সভ্যতার উষালগ্নে ভাঙিয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের মতো পশ্চিম বাংলার মানুষরাও লৌহযুগের সূচনাতেই লোহাকে আয়ত্ত করেছিল, লোহাযুক্ত পাথর থেকে নিষ্কাশন করেছিল লোহা এবং সেই লোহা থেকে নির্মাণ করেছিল যন্ত্রপাতির ফলা, অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার।

অথচ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে যে পশ্চিম বাংলার কোথাও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোহার আকর নেই। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গোয়া প্রভৃতি রাজ্যে মজুত আছে উৎকৃষ্ট মানের লৌহখনির ভাণ্ডার যার পাশে দাঁড়াতেই পারে না এ রাজ্যের লোহার অঙ্কটা, আকারে প্রকারে তাকে অকিঞ্চিৎকর করে দিয়েছে কয়েকটি নীচু পাহাড়। এই পাহাড়ের প্যাকেট পাথর ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের মাথায় ম্যাগনেটাইট-এ (laterite) রূপ নষ্ট করেছিল। এগুলিতেই ম্যাগনেটাইট-এর মধ্যে লোহার সমাবেশ (concentration) ঘটে থাকে এবং তার মধ্যে অন্তত একটা পঞ্চমাংশ লোহা থাকে। বীরভূম জেলার এই ম্যাগনেটাইটের স্তরের মধ্যে সামান্য সামান্য লোহার পরিমাণ থেকে গিয়ে শতকরা চল্লিশ থেকে উনষাট পর্যন্ত হয়েছে। এই শতকরা চল্লিশের অধিক পরিমাণের লৌহযুক্ত ম্যাগনেটাইট থেকে স্থানীয় কামাররা সুদূর অতীত থেকে লোহা নিষ্কাশন করে আসছে।

ভিগোলভিকিনার মতো অন্ধ ইতিহাস প্রবণ ভিবেইর উমাশ ভট্টাচার্য বীরভূম জেলায় এই সব লৌহ নিষ্কাশনপর্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তাঁর রিপোর্টে জানা যায় যে উনবিংশতি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাঁশিয়া, নারায়ণপুর, দেওচা, ডুমরা, গোপালপুর, মল্লারপুর প্রভৃতি গ্রামের লৌহচুল্লীতে বছরে অন্তত একশ আড়াই মণের উপর লোহা নিষ্কাশন করা হত। এই ব্যাপক লৌহ নিষ্কাশনপর্ব পরীক্ষা করতে করতে তিনি লৌহযুক্ত ম্যাগনেটাইট-এর স্থানীয় ভাণ্ডারের দিকে নজর দিয়েছিলেন। বীরভূম জেলার তারুরা, গোপালপুর–দেওচা, সিপাহাড়ি, দুধিয়া, কান্দা ও আরও কয়েকটি অঞ্চলে লৌহযুক্ত ম্যাগনেটাইট-এর বিপুল সঞ্চয়ের সন্ধান পান তিনি এবং তাঁরই সুপারিশক্রমে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলায় লৌহস্তম্ভ নামাঙ্কিত "বীরভূম আয়রন ওয়ার্কস" নামক লোহা নিষ্কাশনের কারখানা গড়ে ওঠে। কারখানার চুল্লীর বাইরে এখনো বড়ো আকারের লোহা নিষ্কাশনের আয়োজন এই প্রথম হল এবং ভারতে প্রথম লোহার কারখানা রূপে মর্যাদা পেল লৌহস্তম্ভ নামাঙ্কিত এই কারখানা।

লৌহস্তম্ভ মার্কার্তের লোহার কারখানার জন্য উপযোক্ত প্রায়ত্নলোর কাছাকাছি

ম্যাগনেটাইট খনিজের ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সব খনির কিছু কিছু চিহ্ন আজও দেখা যায়। লোহাযুক্ত ম্যাগনেটাইট ছাড়া আর এক ধরণের পাথর থেকেও ঐ কারখানায় লোহা নিষ্কাশন করা হত। তা হল হেমাটাইটযুক্ত (hematite) রেডে পাথর। হেমাটাইট হল লোহাযুক্ত খনিজদের মধ্যে সর্বপ্রধান, যার বিপুল ভাণ্ডার পরবর্তী কালে বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর এক ধরণের লোহাযুক্ত খনিজও মাঝে মাঝে ঐ কারখানায় ব্যবহার করা হয়েছে। তা হল ম্যাগনেটাইট (magnetite)। নামগুলির গ্রামের কাছে আছে এই ম্যাগনেটাইট-এর সন্ধান।

মোহরম রাজারের লোহার কারখানা চলেছিল প্রায় কুড়ি বছর। তারপর কুলটিতে গ'ড়ে তোলা হল দুটি ছোট লোহা নিষ্কাশনের চুল্লী। এই চুল্লী দুটিকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠল "বরাকর আয়রন ওয়ার্কস্"। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বরাকর আয়রন ওয়ার্কস্ রূপান্তরিত হল "বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানি"তে। ছোট চুল্লীকে ভেঙে গ'ড়ে তোলা হল কয়েকটি মাঝারি আকারের ব্লাস্ট ফারনেস (Blast Furnace), যাতে দৈনিক পাঁচশ টন ক'রে লোহা নিষ্কাশন করা যেতে পারে। মোহরম রাজারের কারখানা বন্ধ ক'রে দিয়ে কুলটিতে লোহা নিষ্কাশনের বৃহৎ পর্ব গ'ড়ে তোলার মূলে ছিল স্থানীয় আকরিক লোহার ভাণ্ডার আবিষ্কার।

সকলেই জানেন যে কুলটি রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। কয়লার স্তরের সঙ্গে লোহা পাওয়া না গেলেও কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে লোহার আকর সঞ্চিত আছে। কয়লার স্তরের তলায় বিরাজ করছে লোহাযুক্ত কাদা পাথরের (Ironstone shale) প্রায় সাড়ে তিনশো বিচার পুরু স্তর। ভূতাত্ত্বিকদের হিসাবে রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের প্রায় একশো বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিরাজ করছে এই লোহাসমৃদ্ধ কাদা পাথর। মৃত্তিকাস্তরী হলেও এর অধিকাংশ হয়েছে মাটির অনেক নীচে, খনিবিদদের নাগালের বাইরে। লোহাযুক্ত কাদাপাথরের মধ্যে লোহা রয়েছে সাইডারাইট (siderite) নামক খনিজের রূপে। ভূতাত্ত্বিকরা সমীক্ষা চালিয়ে সমগ্র রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে প্রায় তিনশো কোটি টন লোহার আকর-এর হদিশ পেয়েছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পর অবধি রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের লোহার আকরের প্রয়োজন ফুরায়, কারণ তখন সিংভূম ও কেওঞ্জর জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে উচ্চমানের লোহার আকরের বিপুল ভাণ্ডার। শতকরা ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ভাগ লোহাযুক্ত হেমাটাইট-এর পাহাড় কেটে চাটানগরের ইস্পাতের কারখানাকে পুষ্ট করার আয়োজন তখন পুরোমাত্রায় হয়েছে। কাজেই কুলটিও হাত বাড়ায় ঐ অপরিমেয় লৌহভাণ্ডারের দিকে। কুলটির পর বার্নপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, সেখানেও এই লোহার আকরই ব্যবহৃত হতে থাকে। অতএব রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের লোহার আকর অনাদরে অবহেলায় মাটির তলাতেই চাপা পড়ে থাকে। তার কথা ভুলে বসে আছে স্থানীয় লোকেরা।

বীরভূম জেলা ও রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র ছাড়া আরও কয়েকটি অঞ্চল থেকে এসেছে লোহার খবর। ওরা হল পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট-এর খনিসমূহ। পুরুলিয়া জেলার ডামোখুন, ঘন্টিচ, আসান-পানি, বামুনডিহি, সুপুর, খাঁদরা, বড়জোরা, পাকেৎ পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল এবং বাঁকুড়া জেলার বিহারীনাথ পাহাড়, পোড়াপাহাড়, কুচাইপাল, সালতোড়া প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাট অগণ্য আকরিক লোহার ভাণ্ডার আছে। লোহার পরিমাণ অনেক মধ্যে শতকরা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। কাজেই তাদের দিকে আধুনিক ধাতুবিদদের নজর পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের আশেপাশে অথবা প্রাচীন কালের ধাতু নিষ্কাশনের চিহ্ন আছে। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে পর্যন্ত স্থানীয় কারিগরা যে তাদের চুল্লীতে এই সব লোহার আকর ব্যবহার করত তার প্রমাণ দেওয়া যায়।

পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন আকরিক লোহার ভাণ্ডারের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এ পর্যন্ত শুধু নিম্নতর মানের লোহার আকরের হদিশ পেয়েছি। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা জুড়ে বিরাজ করছে তারা। উৎকৃষ্ট মানের লোহার আকর-এর অস্তিত্ব পশ্চিম বাংলায় অসম্ভব বলেই জানতাম আমরা। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে দার্জিলিং জেলার নিম্নাঞ্চলের অন্তত সরলঝোরা গ্রামে। এখানে হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট-এর সমন্বয়ে শতকরা ৫৯ থেকে ৭১ ভাগ লোহাযুক্ত আকরিক লোহার ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে।

সরলঝোরা উত্তর বাংলার আকরিক লোহার ভাণ্ডারের একমাত্র সম্বল নয়, দার্জিলিং জেলার লোহাগড় ও জলপাইগুড়ি জেলার বক্সাদুয়ারে নিম্নমানের আকরিক লোহার ভাণ্ডার আছে। তাদের মধ্যে লোহার পরিমাণ শতকরা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ।

বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও দার্জিলিং জেলায় এত লোহা, কিন্তু আধুনিক ইস্পাত বা লোহার কারখানায় তার ব্যবহার কী কোনক্রমেই সম্ভব নয়? দুর্গাপুর, বার্নপুর ও কুলটির লোহা ও ইস্পাতের কারখানা এমনিভাবে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট মানের লোহার আকর ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে ছোটখাট লোহা বা ইস্পাত প্রকল্পে এই সব নিম্ন মানের লোহার ভাণ্ডারকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সম্প্রতি প্রাযুক্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের কথা আমরা ভাবতে শুরু করেছি। অনায়াসে আমরা আকরিক লোহার ভাণ্ডারের কাছাকাছি ছোটখাট লোহার কারখানা গ'ড়ে তোলার কথা চিন্তা করতে পারি।

ডিনটি বড়ো লোহা ও ইস্পাতের কারখানা এ রাজ্যের মধ্যে থাকলেও এখানকার লৌহ শিল্পের সত্যিকারের অগ্রগতি ঘটবে ক্ষুদ্র লৌহ-প্রকল্পের মধ্য দিয়ে—যা স্থানীয় আকরিক লোহার ভাণ্ডারকে ভিত্তি করে গ'ড়ে উঠবে।

সংবাদ

জনতা হোটেল

গত ৪ মে নয়াদিল্লীতে দেশের প্রথম জনতা হোটেল 'অশোকা যাত্রী নিবাস'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই হোটেল তৈরীর উদ্দেশ্য ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পর্যটন ও অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম কৌশিক বলেন যে রবা এবং নিরুআয়ের দেশী ও বিদেশীরা যাতে সীমিত খরচে পর্যটনের সুযোগ সুবিধা পান তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। ১২৫০ শয্যাবিশিষ্ট এই অশোকা যাত্রীনিবাসের জন্য মোট খরচ হবে ৩ কোটি টাকা। এই নিবাসের নির্মাণকার্য শেষ হলে ২০ তলাবিশিষ্ট এই ভবনটি হবে রাজধানীর অন্যতম উঁচু অট্টালিকা।

১৯৭৮-৮৩ সালের পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে দেশের অপর তিনটি প্রধান শহর বোম্বাই, কলকাতা এবং মাদ্রাজে জনতা হোটেল তৈরী করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আন্দামানে তেল অথবা গ্যাসের সন্ধান

তেল অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে আন্দামানে খননকার্য চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গত ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫২৪ মিটার পর্যন্ত কূপ খনন করা হয়েছে। ৫৫০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করার চেষ্টা চালানোর কথা। দুটি স্থানে ১২৩৮ ও ২৪৮৩ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খননকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন মন্ত্রী শ্রী এইচ. এন. বহুগুণা সম্প্রতি লোকসভায় একথা জানান। তিনি বলেন খননকার্য এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অধিকতর গভীরে তেল কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যাবে কিনা তা আগে থেকে সঠিক বলা যায় না।

বয়স্ক শিক্ষায় জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ কর্মসূচী

জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন. এস. এস.) বয়স্ক শিক্ষার জন্য ব্যাপক আকারে একটি কর্মসূচী চালু করছে। এন. এস. এস.-এর প্রত্যেকটি সংস্থা অন্তত প্রায় ৪ জন। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সম্প্রতি এন. এস. এস.-এর কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র বলেছেন যে আগামী পাঁচ বছরে ২ কোটি প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা দেবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। মন্ত্রীমহোদয় বলেন যে এই বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্য শুধু সাক্ষরতাই নয় নব নব সাক্ষরদের স্থায়িত্বের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য করা।

এক বছরে দেড় কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী আটক

গত ৩১ মার্চ যে বছর শেষ হলো সেই বছরে কলকাতায় শুল্ক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বেআইনী সামগ্রী আটক করেছে। এর মধ্যে সোনা ২৩ লক্ষ টাকার, কাপড়-চোপড় ১৫ লক্ষ টাকার এবং বাকী বিভিন্ন ধরণের সামগ্রী। বড় ধরণের আটক করা হয় ১৯৭৭ সালের ১৫ জুন এলাহাবাদ ব্যাংকের পার্ক ষ্ট্রীট শাখার দুটি লকার থেকে। এর একটি থেকে ৫৮৩৩ গ্রাম ওজনের সোনার বিস্কুট, অপরটি থেকে ৪৬৬৪ গ্রামের সোনা ও ৬৮২৬ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার এবং ৫ লক্ষ টাকার ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া যায়। এই এক ঘটনা থেকে আটকের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। গত ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতা বন্দর এলাকায় হংকং থেকে আসা একটি মাল তল্লাসী করে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার হাতির দাঁত এবং সেই ধরণের অন্যান্য সামগ্রী আটক করা হয়। এই বছরে চারজন বিদেশী নাগরিকসহ মোট ২৪ জনকে আটক করা হয়।

তপশীলী জাতি ও উপজাতী ছাত্রদের জন্য সাহায্য প্রকল্প

১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য মাধ্যমিক স্কুলের তপশীলী সম্প্রদায় ও তপশীলী উপজাতির ছেলেমেয়েদের বেতন মাফ সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার মঞ্জুর করেছেন ১৭,৫০,০০০ টাকা। ১১,৬৪,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

তপশীলী সম্প্রদায়ের মাধ্যমিক স্কুলের যে সকল ছাত্রছাত্রী ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করছে তাদেরকে ছাত্রাবাসে থাকার খরচ বাবদ সাহায্য হিসেবে ১৯৭৮ সালে রাজ্য সরকার আরো ১৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

তামার সন্ধান

কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকাবিদা মুক্তা সম্প্রতি লোকসভায় জানান যে মধ্য প্রদেশের বাঘোরাটি জেলায় মাখনপুর অঞ্চলে প্রচুর তামার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ঐ অঞ্চলে মোট ৬ কোটি ৫ লক্ষ টন আকর আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাখনপুরে তামা তোলার একটি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৩ লক্ষ টন পরিশোধিত তামা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান হিন্দুস্থান কপার লিমিটেড ইতিমধ্যেই কাজে হাত দিয়েছেন।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের যোগাযোগের জন্য আন্দামান ও নিকোবর প্রশাসন ৩টি জাহাজ সংগ্রহ করার প্রস্তাব করেছে। ৫০ টন মাল এবং ১৫০ জন যাত্রী বহন করতে পারে এমন দুটি জাহাজ নানকৌরিতে থাকবে এবং নানকৌরির দ্বীপপুঞ্জ সমূহের মধ্যে চলাচল করবে। লিটল আন্দামান দ্বীপের প্রয়োজন মেটাতে ২৫০ জন যাত্রী এবং ১৫০ টন মাল পরিবহণক্ষম একটি জাহাজ পোর্ট ব্লেয়ারে থাকবে। উত্তর এবং মধ্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে চলাচলের জন্য আর একটি জাহাজ থাকবে বাধ্যবন্দরে। এতে ৫০ টন মাল এবং ১৫০ জন যাত্রী চলাচল করতে পারবে।

খেত খামার

সাগরদ্বীপের তরমুজ

আজী নুরবিমল আরেফিন

চারিদিকে ধানক্ষেত, খাউ, বন-কাউ, হেতাল, কৃপার ইত্যাদি অসংখ্য গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আর নদীপ্রধান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ মানচিত্রের সাগরদ্বীপ পর্যটনের মানচিত্রে কেন্দ্র ক'রে বিংশশতাব্দীর পুণ্যভূমি সাগরদ্বীপকে শুধুমাত্র তীর্থকেন্দ্র হিসেবে ধরা করার দিন আর নেই। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বহুমুখী প্রচেষ্টার সার্বিক রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সাগরদ্বীপের মানুষের জীবন ধারণের মান এবং চিন্তা-ভাবনার পরিধি যেভাবে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে, তা দেখে এখন সহজেই স্বর্ণ-সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য সাগরে স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। আর এই স্বর্ণ সম্ভাবনার এক বিরাট অংশ যে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তা বলাই বাহুল্য।

ধান ছাড়াও সাগরদ্বীপের ব্যাপক চাষবাসের মধ্যে তরমুজ অন্যতম। তরমুজের চাষে সাগরের চাষীরা পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসন দখল করে ইতিমধ্যেই সুবিখ্যাত। কম করেও গত দশ বছর যাবৎ সাগরদ্বীপে তরমুজের চাষ হচ্ছে। আমন ধান ওঠার পর অবহেলায় পড়ে থাকা জমিতে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সাগরের চাষীরা পাথরের মতো শক্ত জমিতে এখন গ্রীষ্মের তরতাজা এই ফল উৎপাদন করে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু এই চাষের ব্যাপারে চাষীদের সামনে সমস্যারও অন্ত নেই। দেশের দক্ষিণান্ত থেকে সময়-মতো ভালো জাতের নির্ভেজাল বীজ সংগ্রহের সমস্যাটি বারাবর অসুবিধার সৃষ্টি করে। স্থানীয় বীজ সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করার সুযোগ থাকলেও, তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম এবং ভেজাল বীজের সমস্যা তো আছেই। এজন্যে সরকারের কৃষি দপ্তর যদি জাতীয় বীজ নিগমের বাজারে সময়মতো উপযুক্ত পরিমাণে বীজ সরবরাহের দায়িত্ব নিতে সাগরদ্বীপের চাষীদের পাশে আর একটু সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন তাহলে চাষীভাইরা খুবই উপকৃত হবেন। ভালো জাতের বীজ সংগ্রহ করার সমস্যা ছাড়াও, সময়মতো উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করা সাগরদ্বীপের মতো আপাতবিচ্ছিন্ন এলাকার সাধারণ চাষীদের পক্ষে একান্তভাবেই অসম্ভব। দ্বীপের চারিদিকে নদী-নালার নোনা জল ঢেউয়ে থাকায়, গভীর-অগভীর নলকূপের ব্যবস্থাবিহীন এই এলাকার কৃষিকার্যে ব্যবহারের মতো উপযুক্ত পরিমাণ জলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সেচ-সমস্যার হাত থেকে সাগরদ্বীপের চাষীদের রক্ষা করার জন্যে তুলা-চাষ প্রকল্পের মতো, তরমুজ চাষের জন্যেও চাষীরা যাতে বড়-বড় পুকুর খনন করতে পারেন, সেজন্যে বিশেষ অনুদান ভিত্তিতে সরকারী সেচ-প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত বলে ওখানকার কয়েকজন চাষী আমাকে জানালেন।

বর্তমান বছরে সাগরদ্বীপের নব-হরিপুরের বিশিষ্ট তরমুজ-চাষী মহেন্দ্রলাল দাস, কমলপুরের বরেন বাগদী এবং উত্তর চাঁদাখালিপুরের ক্ষুদিরাম শাসমল তরমুজ চাষ করে অন্যান্য বছরের মতো লাভবান হয়েছেন। এছাড়াও এবছর তরমুজ চাষে আর যেসব চাষী বিশেষভাবে সফল হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হরিণবাড়ির সুধীর চন্দ্র মণ্ডল, ধান সাহেব আবাদের নরেন কুমার ও শঙ্কর দাস, বনসাগরীপের জ্যোতি বেরা, আশ্বিনী পাত্র ও রজনী দিগার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারী কার্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অধীর চন্দ্র দাস জানালেন, এবছরেও ব্লক বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের কিছুটা জমিতে তরমুজের চাষ করা হয়েছিল এবং সেখানে উৎপাদিত তরমুজ বিক্রী করে সরকার বেশ কিছুটা লাভ পেয়েছেন।

সাধারণতঃ একর প্রতি তরমুজের ফলন খাই-খরচ কুইন্টাল হলেও, ভালো-ভাবে যত্ন নিতে পারলে এর ফলন নব্বই থেকে একশ' কুইন্টাল পর্যন্ত হতে পারে। তবে, জমির উর্বরতা এবং অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ থাকলে তরমুজের ফলন একরপ্রতি আরও বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। তরমুজের গড়পড়তা ওজন পাঁচ থেকে আট কেজি পর্যন্ত হলেও, ষোল আঠারো কেজি ওজনের তরমুজও এবার সাগরদ্বীপ থেকে নৌকাযোগে কাকদ্বীপ এবং সেখান থেকে নদীবোটাই হয়ে বিষ্ণুপুর-আমতলা ঘাট ঘুরে কলকাতা ফলপট্টিতে এসে পৌঁছেছে। সাগরদ্বীপ থেকে সরাসরি কলকাতার বাজারে এনে বিক্রি করতে পারলে চাষীরা যে দাম পেতেন, পরিবহণ সমস্যার জন্যে তাঁরা তাঁদের উৎপন্ন ফলের বিক্রি করে তেমন আশানুরূপ দাম না পেলেও, একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, সব তরমুজ চাষীই কিছু অধিক লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

নানারকম অসুবিধা এবং অব্যবস্থার জন্যে লাভের পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও একর প্রতি প্রায় সত্তের' একর জমিতে উৎপন্ন তরমুজ বিক্রি ক'রে সাগরদ্বীপের চাষীরা আনুমানিক ষাট-পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা আয় করেছেন। গ্রীষ্মের চাষ হিসেবে তরমুজের চাষ যে অথেই সহায়ক এবং অর্থকরী, তা এই আয়ের হিসেব থেকে মোটামুটি অনুমান করে নেওয়া যায়। ভবিষ্যতে জেলা কৃষি দপ্তর তথা রাজ্য সরকার যদি এই বিশেষ লাভজনক চাষে একটু সক্রিয় সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, তাহলে সাগরদ্বীপের তরমুজ চাষীরা প্রাণভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবেন—এবিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই।

শিল্প সংস্কৃতি

জ্যাকসন নম্বর আনচার্টে ট্রাফের (রাজমোহন সরণী) ইটওঠা চত্বর পেরিয়ে লোকা গেল বাড়িতে। পাশের সামনে তখন বনেদী বাড়ির কাঠের সিঁড়ি। পাশে অবশ্য ঝকঝকে সেলফুডলো পুলিশরা নিয়েছে।

প্রখমে খোলা। তারপর তিনতলায় উঠে খোলা দরজায় হাত ঠেকাবার আগেই সামনে হাজির হলেন শতকরা নিরানব্বইটি পাকা চুল মাথায় নিয়ে এক মধ্যবয়সী মহিলা। চোখে মুখে খুশির জোয়ার উপচে পড়ছে।

নিজের পরিচয় দিয়ে বাড়ির কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন করতেই বললেন 'বোস, ডেকে দিচ্ছি।' ভেতরে চলে গেলেন, বেশ জোরেই আমার পরিচয় দিয়ে কর্তাকে বললেন—'ও বসে আছে তুমি যাও।'

আমি তৎক্ষণে গভীর গদির সোফায় নিজেকে অর্ধেক ডুবিয়ে দিয়েছি। দেয়ালের মালিনো খুঁজতে চেষ্টা করছি নীতিন বসুর পরিচয়। বাঁ দেয়ালে একটি মাঝারি সাইজের ছবিতে হঠাৎ তাঁকে দেখলাম, ঠিক চিনতে পারলাম না। পূর্বে কখনও নীতিন বসুকে আমি দেখিনি।

দেখেছি প্রেসিডেন্ট, দেখেছি নৌকা-ডুবি, দেখেছি গঙ্গাযমুনা, কিন্তু স্রষ্টা ছিলেন দৃষ্টির বাইরে। অন্যান্য ফ্রেমে তাঁকে খোঁজবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ এসে ঢুকলেন তিনি। ধোলা পাজামা আর গেঞ্জি গায়ে, চোখে মোটা পাওয়ারের চশমা। বললেন—'শুতে যাবতো তাই এই পোষাক, কোন অসুবিধে নেই তো?'

অসুবিধে আর কি! আমার কাজতো প্রশ্ন ছোঁড়া। উনি খাটের ওপর বসলেন তখন। পাশে এসে বসলেন সেই মধ্যবয়সী মহিলাও। বুঝলাম উনিই বিমল বসু, নীতিন বসুর জীবন সঙ্গিনী ও সাথী।

৭ এপ্রিল রাত্রে রেডিও সংবাদে যখন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের খবরটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জানতে, পুরস্কৃত এই নিরহঙ্কার মহাপ্রাণ বৃদ্ধ লোকটি দুপাপুরে তখন মেয়ের বাড়িতে বিছানার চা চড়িয়েছেন প্রতিবেশীরা হয়ত বাড়ি ঢুকে অভিনন্দন জানায় তাঁকে, কেউ কেউ বুঝে নিই দিয়ে যেন। বুদ্ধতো স্তব্ধাক। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন না তিনি।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন খবরটা ছুঁড়ে দিল "দাদা আপনি ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন। দশ হাজার টাকা আর সোনার পদ্মফুল দেবে আপনাকে রাষ্ট্রপতি।"

অবিশ্বাসের ঘরটা পেরিয়ে বিশ্বাসের ঘরে ঢুকতে তাঁর একটু সময় লাগল, কিন্তু তারপর আনন্দে গাল ভিজে যাবার পালা। ভাবতে লাগলেন এতদিনে তাঁর পরিশ্রম বুঝি সত্যিই সার্থক হল। দেরী হয়েছে, কিন্তু তাতে কি? সরকার তাঁকে স্বীকৃতিতো দিয়েছেন। তাঁর কাজকে মনে রেখেছে সকলে।

নীতিন বসু অবশ্য কোনদিনই পুরস্কার বা অর্থকরী লাভের আশা করেননি। নিজের মনে আর বুকে যে সৃষ্টির বেদনা তিল তিল করে কাঁপতে তাকেই তাগিদে ছবি করে গেছেন। ক্যামেরার সামনে বসির অনুষ্ঠানটি যদিও বাণী বসেন্দ্র প্রসাদ সিংহর কাছেই হয়েছে, কিন্তু সৃষ্টির মহলা না দিলে পরিচালক হতে পারতেন না তিনি। ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে কাটত চিনটা রাত।

তাতো কাটেনি।

নীতিন বসুকে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার

নির্মল বসু

পরিচালক হলেন তিনি একদিন।

সেই সুদূর অতীতের পাতালে ডুব দিতে যেন তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। খুসর স্মৃতি থেকে অনেক ঘটনাই ঝলসে দিচ্ছিলেন স্ত্রী।

নির্বাক ছবি 'দেবদাস' (১৯২৭) এর চিত্রগ্রহণ দিয়ে কিনু লাইনের কাজ শুরু। তারপর পি. এন. রায়ের সঙ্গে গেলেন ইস্টার্ন টলিফোন কোম্পানি-এ। তৈরী হল 'চোরকাঁটা', 'চাষার মেয়ে'। এরপর সরাসরি যোগাযোগ বীরেন সরকারের সঙ্গে। নিউ থিয়েটার্সের প্রায় অন্তরঙ্গ থেকেই নীতিন বসু এই প্রতিষ্ঠানের

রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডী শ্রীনীতিন বসুকে ১৯৭৭ সালের দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার প্রদান করছেন

অনাতম কর্ণধার। একবনে চলি ঘরে গেছেন।

ওঁর কথাতেই বলি—"বীরেন বাবু কোনদিনই ছবি তৈরীর ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতেন না। ছবি করার দায়িত্বটা আমাদের ক'জনের ওপর। উনি ব্যস্ত থাকতেন ছবির ব্যবসা নিয়ে। কবে কোন্ হলে কোথায় কোন্ ছবি রিলিজ হবে তাই থাকত তাঁর মাথায়। ইডিও-তে এসে বলতেন 'অমুক তারিখে অমুক ছবি রেডি থাকা চাই, রিলিজ আছে।' পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারতুম।....."

তবু কিন্তু একদিন তাঁকে ছাড়তে হল এন.টি।

—কেন?

উত্তর দিতে গলা ভারি হয়ে এল নীতিন বসুর। বিয়াল্লিশ বছরের বৃদ্ধ তরুণ কোনমতে নিজেকে সামলে নিলেন। শুধু বললেন 'ছোট একটা ভুল বোঝাবুঝি। .....সেসব কথা বলে কি আর লাভ? আমার এই বাংলা মাকে ছেড়ে গিয়ে যে কি ভুল করেছিলাম!' আর সামলাতে পারলেন না। রুমালের আড়ালে চোখ মুছলেন শিশুর মত। পাশে বসা স্ত্রী সান্ত্বনা দেবার ভাষা পাচ্ছেন না। আমিও নীরব।

একটু বাদে চশমার কাঁচ মুছে বললেন—'বম্বের পরিবেশে আমার কোনদিনই তেমন ভালো লাগেনি।'

মাঝে মাঝে তাই কলকাতায় এসেছেন। ছবিও করেছেন দু-একটি, কিন্তু আশা মেটেনি। ১৯৫৩-র শেষ করলেন 'যোগাযোগ'। দারুণ চলেছিল ছবিটা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আরও আরও ছবি করার সুযোগ দিয়েও আটকালো না নীতিন-বাবুকে। আবার ফিরে গেছেন বম্বে। সেখানেই কেটেছে তাঁর পঁচিশটা বছর।

ক্যামেরার কাজের মধ্যে পরিচালনার যখন হাত দিলেন নীতিন বসু, তখন সেই তরুণের চিত্রায় প্রতিভাদীপ্ত ভাববাদীর চোখার বইছে। সামাজিক চিত্রায় করল তিনিই তৈরী হয়েছিল 'প্রেসিডেন্ট' (হিন্দি), 'দেশের মাটি'।

"প্রেসিডেন্ট ছবিতেই আমি প্রথম বলেছিলাম রাজনীতি ও সমাজনীতিতে প্রমিক শ্রেণীর দক্ষিণ অংশগ্রহণ ছাড়া কোন উন্নতি সম্ভব নয়। 'দেশের মাটি' ছবিতেও আমিই প্রথম বলেছিলাম সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ চাষীদের উন্নতি হয় না।" বললেন নীতিন বসু।

নিজের ঢাক নিজে পেটানোর জন্য নয়, ছবি দিয়ে সামাজিক পট পরিবর্তনের কথা যে তিনিই প্রথম চিন্তা করেছিলেন এসত্য আজ প্রমাণিত। এই ধরণের ছবি করার জন্য সেসময় তাঁকে পরোক্ষভাবে কম কটূক্তিও শুনতে হয়নি। বিদেশের আমন্ত্রণে যেতে পারেননি তিনি, তৎকালীন সরকারের অনুমতি মেলেনি।

এখানে যেমন নিউ থিয়েটার্সের কৃতিত্বের অন্যতম অংশীদার ছিলেন বম্বেতেও তিনি কম লোককে গড়ে-পিটে নেননি। বিমল রায়, হাবু কর্মকার, মোকন গাঙগুপ্ত, মুকুল বসু (ওঁর ভাই) সকলেই নীতিন বসুর ছাত্রের মত। কিন্তু মিডিয়মটিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন প্রাণের চাইতে বেশী। কিন্তু তিনিই আজ দূরে সরে।

বম্বেতে ১৯৬৩ সালে শেষ ছবি করেছেন 'ডিবিশ'। এখনও মুক্তি পায়নি। সাদাকালো ফিল্মের তোলা এই ছবির শিল্পী তালিকায় আছেন অশোক কুমার, ভগ মুখার্জি, নন্দা, লীলা নাইডু। কারণ সম্ভবত রঙিন ফিল্মের তোলা নয় বলে। এখনও ছবিটা মুক্তি পেতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় নীতিন বাবু বললেন —"না হবার কোন কারণ নেই। আজকের দিনেও ঐ ছবির বক্তব্য ভালিড্।" কিন্তু মুক্তি পাবে কি?

বাংলা ছবি নির্মিত দেখা হয়নি তাঁর বহুকাল। বম্বেতে থাকাকালীন তো নয়ই, এখানেও হচ্ছে না। তাইপো মানিকের (সত্যজিৎ রায়) ছবি অবশ্য তিনি মিস্ করেন না।

আজকের বাংলা ছবি সম্পর্কে কোন মন্তব্য তাই তিনি অপারগ। এটুকু বললেন—"শুনতে পাই বাংলা ছবি নাকি আজকাল আর তেমন ভালো হচ্ছে না।"

কারণটা কি জানতে চাইলে তিনি বললেন—"ছবির লাকদা কোথায় জানো? এক কথায় এস্-টি-টি।"

বুঝতে পারলাম না—'এস্-টি-টি' শব্দের অর্থটা।

মুচকি হেসে বললেন—"এস্ মানে স্টোরি, অর্থাৎ ভালো গল্প চাই, টি মানে ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ গল্পবলার ঢংটা সুন্দর হওয়া দরকার, আবার টি-র অর্থ দল টেকনিক, মানে কুশলী গ্রহণের কায়দা। এই তিনটে কাজ ভালভাবে করতে পারলে ছবি দর্শকের ভাল লাগবে না মানে? লাগতে বাধ্য।" গলায় দৃঢ়প্রত্যয়ের আভাস।

বললাম—"তাহলে নিজেই ছবি করুন না।"

চোখগুলো অমনি যেন জ্বলে উঠল বৃদ্ধের। উপরে ওঠা আস্তরের বাধা ঝাটকে বললেন—"সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করব। বাংলায় বহুদিন ছবি করিনি। এই পুরস্কার পাবার পর ছবি করার ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে।"

গল্প ঠিক করেছেন?

—অনেক গল্পই আমার জানা আছে। নেই শুধু প্রোডিউসার। প্রোডিউসার পেলেই ছবি করতে রাজি।

বয়সের কথা ভেবে বললাম—"এই বয়সে....." কথা শেষ করার আগেই নীতিন বাবু বুক বিশ্বাস নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"কেন পারবো না। নিশ্চয়ই পারব।" আশায় উদ্ভাসিত তিনি।

দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার জয়ীর প্রতি অধিকতর সম্মান জানানো হবে যদি তাঁকে সত্যিই আজ আবার ক্যামেরার পেছনে দাঁড় করাতে পারি আমরা।

কিন্তু পারব কি?

গ্রন্থ আলোচনা

এখন মোরানা ছেড়ে। প্রতিভা ঘোষ। শতরূপা গ্রন্থমালা। আশ্বিন। ১৫ টাকা।

সমবেত কণ্ঠস্বর। সপ্তদশতম বিন্যাস সম্পাদিত (কণ্ঠস্বর, আইডিয়াল বুক এক্সচেঞ্জ, ১১২২, বৈদ্যের বেল, কোলকাতা-৭০০০০৯)। তিন টাকা।

'এখন মোরানা ছেড়ে' প্রতিভা ঘোষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ঘুমন্ত মন্ত্রে' একই প্রকাশক ১৩৯ আশ্বিন, ১৩৮২ সালে প্রথম প্রকাশ করেন। তিন বছরের কিছু পরে এই দ্বিতীয় সংকলনের প্রকাশে তাঁর কাব্য-মানসের সঙ্গতিরক্ষায় চিহ্ন থাকলেও মান-সিকতার পুর একটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থের 'বিস্মৃতির সুর', "অনেক দূরে তোমার মুখ দেখি না' সকালবেলার নরম শিশিরের টুপটাপ শব্দ,/ বিকেলবেলার বাগানে চাঁপা ফুলের পাপড়ি ঝরান,/ আকাশে উজ্জ্বল দূরের তারা/ আর সোনালী পাড় দেওয়া মেঘ দেখতে দেখতে/ পাশাপাশি তোমার মুখ আর দেখি না।" অতি সহজেই তাঁর দ্বিতীয় সংকলনের "একটি একটি করে পদ্মের পাপড়ি ঝরিয়ে প্রত্যেকদিন তোমার পায়ের কাছে রেখে যাই/ তুমি স্নিগ্ধ মুখে চোখ তুলে চেয়ে দেখ।—শুধু সেটুকু পাবার নিয়ে ফিরে আসি প্রত্যেকবার" পাশাপাশি স্থান পেতে পারে। সংবেদনশীলতার ক্রমগত পরিবর্তন সহজে চোখে পড়ে না; নতুন সংকলনে নতুন কথা বলার জন্য কবিদের অপেক্ষা করতে হয়। প্রথম গ্রন্থে শ্রীমতী ঘোষ যে ব্যক্তিজীবনের মিথ্যা আবর্তনের কথা বলতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় সংকলনের চল্লিশটি কবিতার মধ্যেও সেই নিরাশ্রয় আর জৈবনিক চিন্তা-ভাবনার আবর্ত প্রসারিত হয়েছে: "উজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় দেখেছিলাম,/ হঠাৎ চমকে ফেরে দেখলাম,— আমার পরীর দিকে অবিশ্বাসের বেদনা নাড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর সোনালি পুরুষ ও নারীদের নিয়ে চলা এটি কবিতা। এগুলিতে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ভাষা কিছুটা অন্তর্মুখীনতা ও তন্ময়তা (objectivity) লাভ করেছে। যেমন 'হোপলী' কবিতার শুরু "তোমরা কেউই কেউই মনে নাও... অথচ প্রত্যেকেই বিরাট পুরুষ যে কোন একজনকে নিয়ে বলা যেতে পারে অন্য কোন সাধারণ।"

শ্রীমতী ঘোষের নতুন সংকলনে আবেগ, চিন্তা বা চিত্রকল্পের কোন বিশেষ নতুনত্ব না থাকলেও বক্তব্যে স্বীকৃতা এসেছে নিঃসন্দিগ্ধভাবে। প্রায় সবকটি কবিতাই প্রথম সংকলনের কবিতার চেয়ে দৃঢ়—এতে আপাতিকের মায়াকুয়াশা এসেছে; এসেছে বক্তব্যে জোরালো ভাব। 'অপরাহ্ণে' কবিতায় অপরিণত যৌবনকে চিরাচরিত উপমা নদীর দৃশ্যে তুলনা করলেও আবেগে এসেছে স্থিরতা। "আরও কিছুকাল ঘরে' পলাতক যৌবনকে ঘরে রেখে আমিও কি জীবন চেয়েছি?/ অবাধ্য যৌবনে মত নয়জানু—/ নির্দয় সময়তবু সে প্রার্থনা রাখেনি।// এখন বেলার পানা বাতাসে আলপথ ধরে, নদীর মরণ হাতে ছিটে ছিটে পড়ি;/ ছুটে ওঠে বিস্ত বাতাস।" শ্রীমতী ঘোষ আধুনিক বাংলা কবিতার সাধারণ বাহিক লক্ষণগুলি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনিও হতাশা, বিষাদ, রোমান্টিক পক্ষপাতদুষ্টি নিয়ে অবিষ্টতা প্রভৃতি নিয়ে বিচিত্রভাবে স্রোতে ভাসছেন। এর মধ্যেও প্রকৃতি চেতনা উঁকি মারে, গানে সুরে ফিরে আসার মত। "সোনালী রোদের সিঁড়ি খুলো ভেঙে থাকে—বিশাল ডানার রোদ মেখে/ শ্বেতপক্ষ পাখি উড়ে যায়,/ বহুদূরে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে মিলায়/ বেলা-টীরের মেঠোসুরের ধ্বনি।" প্রথম গ্রন্থের মত দ্বিতীয় সংকলনেও পাঠক বিরক্ষণ করে, এতে মনোযোগী হলে পাঠকদের চিত্তহরণে তা সহায়ক হবে।

*

আধুনিক বাংলা কবিতা বেশ কয়েকজন মিলে একটা সম্মিলনে, প্রেমে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের ভাষা ও ভাব আর বাজারে কাটতে না, তাঁদের বিরুদ্ধে সাঁতারুদের তেমন ঘোষণা করার মত জোর প্রতিভাও হয়তো চোখে পড়ছে না অথচ অসংখ্য সংবেদনশীল চিত্ত অন্তরে ভাবে কিছু একটা বলতে চাইছেন, যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মোর পর্বতের মত 'বলিতে না পারে সেই কবি।'

শ্রীমতী ভারতমা বিশ্বাস এরকম চল্লিশটি কবির অন্তত কণ্ঠস্বরকে ঐকতানে মেলবার চেষ্টা করেছেন তাঁর এই ছোট সংকলনে। বলবার ভঙ্গিতে ছাড়াও প্রকৃতির বন্দনা ও শৈলীর কোন ঐক্য নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার সাধারণ বাহিক লক্ষণ অনেক কবিতাতেই আছে, যেমন পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে হতাশা, নিউরোটিক কাব্যভাষা, বিমূর্ততা ও বাগ্মী পরিবাদ। প্রায় প্রত্যেক কবিতার নীচে বচনের প্রেরণা ও কবির জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা আছে,—যা 'ভিন্ন রুচি' মানুষের উৎসবকে মনে করিয়ে দেয়। কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিক নিয়েও অনেকজনকে বাগানো পরীক্ষা আছে —কোনটার পেছনে তেমন যুক্তি নাই। যেমন: অনুপমা কে?// ভালোবাসা = শব্দ / দীপ্ত / মহীরুহ অনুপমা = প্রতীক / অনুপমা সৌন্দর্য আলো ইত্যাদি।

এরকম বেশ কিছু ছেলেমানুষি ও পাগলামির মধ্যেও সত্যিকারের কবি কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অনেকটা সমর সেনী কায়দায়, যেমন, "তোমাকে দেখে আমার মনে হল / মুমূর্ষু পথচারী। বেকারের দীর্ঘশ্বাস। / দেহের ভিতরে

সাজিয়ে ওঠা আনন্দ। পাঁচটাকা মহাজনী ভাতা বুঝি। আর অনেকদিন উপবাসী মানুষের / পরম তৃপ্তের নিঃশ্বাস।" (বরদাপ্রসাদ দেব) অথবা, অভিজাতদের বা ঐশ্বর্যের ভাব ও চিত্র: "সত্যের মুখোমুখি দেখি / বাচমুদ্রে। কাজরে থাকে দেয়াল ঘড়ি। / সত্যের চোখে চোখ রাখি / চাকার সিঁড়ি খুলতে থাকে / শূন্যের উদ্যানে।" (অনিদ্রাত চক্রবর্তী)। কিংবা ইষৎ দার্শনিকতা দুই চিত্র: "অতিত মানুষ পাখী, অতিপর প্রকাশবিকাশ / যে যার মতই ঘুরে আসুনারে / আসিবে পাখী ও বসিবে মাকাকাশ কাঁধে। প্রার্থনার স্বপ্ন দেখে ষোলকলা সুখের ত্রিকাল" (অমলা কুমার চক্রবর্তী)।

শ্রীমতী ঘোষের সংকলনের মত শ্রীসতীরঞ্জন বিশ্বাসের সংকলনের ত্রুটি হোল এতে অনেক নিতান্ত সাধারণ রচনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আর এটির বহু গুণ হোল, ব্যক্তিগত চেতনার প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য। কারুর সঙ্গেই কোনো অনুকরণ পূজা নেই। ভালো কবিতা প্রত্যহ লেখা যায় না, অনেক সময় কয়েক বছর নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে হয়। সেই প্রতিশ্রুতির আছে দুয়েকটি কবিতায়। যেমন, "বেচাকেনার হাটে / আমরা শুধু কিনি। / মরা বেচে তারা / কেউ কবি, কেউ চাষীরে। / কিন্তু কেউ কেউ ফুলের বিলাসী। / তাদের পায়ের কাছেই / নতজানু হয়ে থাকেন ঈশ্বর।" (অমরেন্দ্র সান্যাল) অথবা ছন্দের চাতুর্যে মনোরম: বুকের মাঝে জড়িয়ে ওঠে লতা, বুক থেকে ঐ ঘুমের / কালোজলে। বুকের মাঝে কাঁপায় কত ব্যথা, বুকের থেকে তাকাও / কৌতূহলে। / তবু তোমায় গোপন কথা বলো, আকাশ দেখো কাজল / কালো ছায়া / কাঁপায় যত মনের ব্যথা চোখে, মনায় রেখে রহস্য / নীল মায়া।" (সোমনাথ মুখোপাধ্যায়)।

কল্পনা রায়

জানা অজানা

১। প্রশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সবচেয়ের সীমানা চিহ্ন কি?

২। পৃথিবীর সর্বপ্রথম রেডিও ষ্টেট চালিয়েন কে ছিলেন?

৩। গোখুরা সাপ অন্যান্য সাপের মতই বধির। তবে তারা

উত্তর

। ২২ ছুটে ঘুরাঘুরির ঘুর ঘোরে
২৭২৫ ইয়োজিন সন্ধ্যে । ৪

। সোমেন মুখে মাই চোখে
ঘোড়ে সেন মাথায় ছড়ে ঘুরে
মন্ত্র মাথে মাথায় ঘুরে
। মাথায় মুখে মাই চোখে মাথায়

সাপুড়ের বাঁশির সুরের সঙ্গে সঙ্গে শরীর দোলায় কেন?

৪। পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক শক্তি চালিত বাণিজ্য জাহাজের নাম কি এবং সেই জাহাজ কোন দেশে তৈরী হয়েছিল?

মাথে ঘোরে । ৩ মাথ ঘোরে
মাথে মাথে ঘুরে ঘোরে মাথায় । ৫
। মাথায়ঘুরে
ঘোরায়ঘুরে মাথে ঘুরে ঘোরায় ঘুরে
মাথায় ঘুরে ঘোরে ঘোরে মাথায়
মাথে ২২ মাথে । মাথায়ঘুরে ঘোরে । ১
। মুখে মাথায়ঘুরে ও ঘোরে মাথায়ঘুরে । ৫

কাঁচের দেয়াল

১৩ পৃষ্ঠার পরোপর

জানে যে ও যতটুকু মনোযোগ দেয় তাই সুস্মিতের কাছে যথেষ্টের থেকেও অনেক বেশী। বরং মনোযোগ আর একটু কমলেই খুশী হ'বে সুস্মিত। অনেক বেশী নির্ঝঞ্ঝাট হ'বে।

·····গিঁড়িতে সুস্মিতের পায়ের শব্দ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে দিল বণিকা। —"এত দেরী যে?" সুস্মিত অবাক স্থির চোখে দেখলো ওকে। নির্লিপ্ত গলায় বললো "কাজ ছিল।" চিঃ, চিঃ, মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয় বণিকা। আবার সেই ভুলই করলো সে! কি প্রয়োজন তার এত ব্যস্ত হ'বার, এত ব্যাকুল হয়ে পথ চাওয়ার। রোজকার অত্যন্ত স্বাভাবিক ভূমিকায় ফিরে এলো বণিকা। শান্তিকে চা আনতে বললো। কাপে চা ঢেলে চামচ দিয়ে চিনি গুলে এগিয়ে দিল কাপটা। "আজ কোনও চিঠি নেই। এম. ই. এস. থেকে লোক এসেছিল·····।" জিগ্যেস সুস্মিত মার্কুলাবটা পড়ছে তখন। বণিকার অবাধ্য চোখদু'টো দেখেনি সে। দেখলেই বা কি হত? এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতে তারপর সহজ গলায় বলতো, "ছেলে-মেয়ে খুব জ্বালাতন করেছে বুঝি? বেশ টায়ার্ড দেখাচ্ছে তোমায়।"

তৎপরতায় বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো বণিকা। কল খুলে তার সারা দেহ ঝেঁপে ঝেঁপে উঠছে। আয়নায় অশ্রুমুখী প্রতিচ্ছবির দিকে চেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে সে। যেন বন্ধ ঘরের নিভৃতে সে ও তার আত্মা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় না।

·····খুদা হাফিজ—ভগবান তোমার সাথে থাকুন, রক্ষা করুন তোমায় সকল অমঙ্গল হতে। সুখে ভরপুর, ঐশ্বর্যে ভরা হোক তোমার জীবন। যেখানে, যত দূরেই থাকো আমার শুভ কামনা চিরদিন ঘিরে থাকবে তোমায়·····।" দিবাকের শেষ চিঠিখানা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এতগুলো বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে·····। "তাই হ'বে সিরাজ।" ম্লান হেসে চোখের জল মুছলো বণিকা। পাশের ঘরে এসে মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিলো। ওয়ার্ডরোব খুলে কোটটা বার করে পরে নিয়ে সুস্মিতের সামনে এসে দাঁড়ালো—"চলো একটু ঘুরে আসি কোথাও।" ম্যাগাজিনটা টিপয়ের উপর রেখে উঠে দাঁড়ালো সুস্মিত—"বেশ তো, চলো।"

প্রাঙ্গণ

বেটন কাপ মোহনবাগানের ঃ হকির ক্লান্ত ঘরণ্ডম শেষ

কলকাতার আরো একটি দীর্ঘ ও বিবর্ণ হকি বরণ্ডম শেষ হল বেটন কাপের সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতা ময়দানে আজ হকি খেলার যা অবস্থা তা দেখে কে বলবে যে একদিন ভারতীয় হকির বরবরা বলতে এই কলকাতার মাঠগুলোকেই বোঝাতো। এখানে খেলে গেছেন ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, কে. ডি. সিং বাবুর মত গরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীরা। আগে ভারতীয় হকি দল গড়তে হলে সবার আগে চিন্তা করতে হত কলকাতার খেলোয়াড়দের কথা। ভারতীয় দলে ঢুকতে হলে কলকাতার খেলোয়াড়দের তো সেকালে খেলতেই।

আর আজ! এখনকার হকি বরণ্ডম ক্লান্তিকর কাঁটা নয়। না আছে উত্তেজনা, না আছে উদ্দীপনা, না আছে উৎসাহের ছিটেফোঁটাও। লীগের খেলা হয়—খেলতে হয় তাই খেলা গোছের খেলা খেলে চলেছেন। তারই মধ্যে একদিন দেখা গেল একটা দল (অবশ্যই মোহনবাগান, কারণ ওদের অন্য দল) লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার পয়েন্ট সংগ্রহ করে ফেলেছে। তারপর শুরু হয় বেটন কাপের খেলা।

চুরাশি বছরের পুরোনো ভারতের সব থেকে ঐতিহ্যশালী এই প্রতিযোগিতা। কিন্তু এখানে খেলতে আসতে বাইরের দলগুলোর তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। অনেক সাধা সাধনার পর কেউ আসে, কেউ আসে না। তাতা হাটে শুরু হয় বেটন। সেমিফাইনাল—ফাইনালে কলকাতার মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল উঠলে একটু ভিড় হয় তা না হলে ফাঁকা মাঠে খেলা হয়। হয়তো এমন দুটি দল ফাইনালে খেলে যে দলে আট দশ জন ভারতীয় দলের খেলোয়াড় আছেন। তবু তাঁরা কলকাতার দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেন না।

অথচ কলকাতার মানুষ যে ভালো হকি খেলা দেখতে ভালোবাসেন না একথাও অস্বীকার করা যাবে না। এই তো কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিল হিকেকোর্স হকি ক্লাব। অস্ট্রেলিয়ার 'ওয়ার্ল্ড কাপ' দলের অধিনায়ক রিচার্ড চার্লসওয়ার্থই ছিলেন সেই দলের নেতা। সেই খেলা দেখতে তো সিঁড়ি ভিড় হয়েছিল। আর এবার যদি পাকিস্তান হকি দল কলকাতায় খেলতে আসতো তাহলে হয়তো ইডেন উদ্যানেও কুলোতো না। আসলে কলকাতা অর্থাৎ বাংলা হকি সংস্থার তৎপরতার অভাবের জন্যই আজ হকি খেলার এই দীর্ঘ, বিবর্ণ দশা। দর্শকদের আকর্ষণ করার জন্যে বি. এইচ. কিছুই করেন না। তাঁরা যা করেন তা হল কোন রকমে প্রতিযোগিতাগুলো শেষ করা। ঠিক যেমনটি হয়েছে এবারের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায়।

কলকাতার মোহনবাগান এবারও বেটন কাপ জিতেছে। পুরনিয়মে ফাইনালের পরের দিনে খেলার কোন মীমাংসা হয় নি। দ্বিতীয় দিন খেলা আরম্ভ হবার মিনিট পনেরোর মধ্যে গোল করে মোহনবাগান বিজয়ী বি. আর. পি. গ্রুপের বিরুদ্ধে জিতে যায়। খেলার একমাত্র গোলটী করেন ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী।

মোহনবাগান এ পর্যন্ত পনেরো বার ফাইনালে উঠেছে তার মধ্যে জিতেছে ১১৫২, ৫৮, ৬০, ৬৪ (ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্ম), ৬৫ (কাইনসের সঙ্গে যুগ্ম), ৬৮, ৬৯ (কোর অফ সিগনালসের সঙ্গে যুগ্ম), ৭১ (বি. এস. এফের সঙ্গে যুগ্ম), ৭৩ (আই. এইচ. এল ডাই ব্রুকের সঙ্গে যুগ্ম), ৭৪, ৭৫, ৭৭ ও ৭৮ সালে। মোহনবাগান হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ও বেটন কাপ জিতেছে একই সঙ্গে ১১৫২, ৫৮, ৬০, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৭ ও ৭৮ সালে।

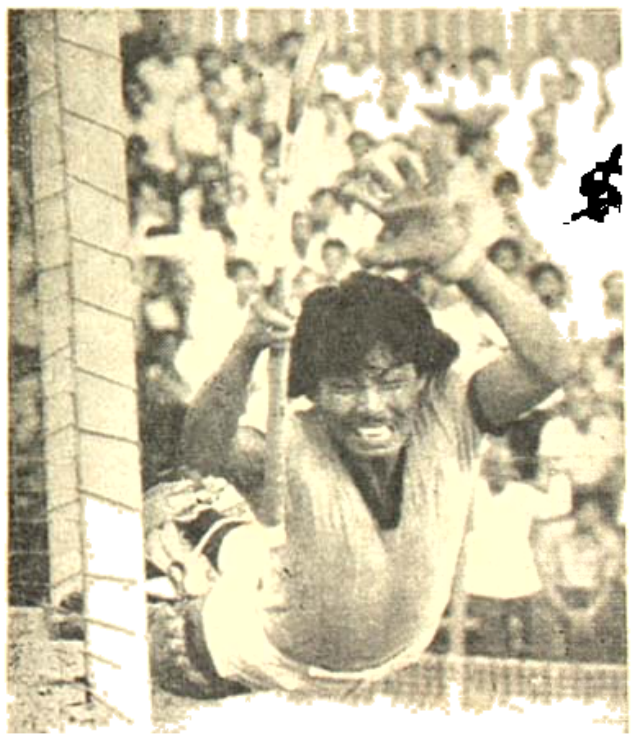

বেটন কাপের ফাইনালে সি. আর. পি. এফ-এর গোল-কিপার দেখর ডকং এত সুন্দর ডাইভ দিয়েও মোহন-বাগানের গোল আটকাতে পারলেন না

DHANADHANYE
Price 50 Paise

YOJANA
(Bengali)

Regd. No. wb/cc-315
June 1—15, 1978

এবারের বেটন কাপের ফাইনাল খেলা খুব একটা জমে নি। মিঠি সি. আর. পি. এক নোটামুটি শক্তিশালী দল। তবে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের কাছে কিছু নয়। সেমিফাইনালের দু পর্বের খেলায় সেই এয়ার লাইনস দলকে হারিয়ে যখন মোহনবাগান ফাইনালে উঠেছিল তখনই বোঝা গিয়েছিল, এবারও মোহনবাগানই বেটন কাপ জিতবে। ফাইনালের প্রথম দিন মিঠি দল মোহনবাগানকে গোল করতে দেয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন তারা রাখে পানি পায় নি। দু তিনটে গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করার পর ইস্টবেঙ্গল গোলের গোলে মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত বেটন কাপ ধরে তুললো।

খেলার শেষে রাজ্যপাল শ্রী ত্রিভুবন নারায়ণ সিং দুদলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ফাইনাল খেলার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন সি. আর. পি. এফ. দলের সর্দার সিং।

বি. এইচ. এ-র বেশীর ভাগ কর্তারা সাধারণত ইংরেজীতেই বক্তব্য রেখে থাকেন। কিন্তু রাজ্যপাল টি. এন. সিং বেশির ভাগটাই বাংলাতেই তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন।

ভারতীয় ফুটবলে বাংলা তথা কলকাতাই যে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ আরো একবার পাওয়া গেল কোয়েম্বাটুরে গত সমাপ্ত দ্বিতীয় ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ফেডারেশন কাপ হল ভারতের সামনের সারির ক্লাবগুলোর প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় এবার যুগ্ম বিজয়ী হয়েছে কলকাতার দুই প্রধান—মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল।

ফাইনাল খেলা হয়েছে দুদিন। দুদিনের একশ আশি মিনিটের তীব্র প্রতিযোগিতার পরও কোন দলই গোলের মুখ দেখতে পায় নি। তাই ১৯৭৮ সালে দুই প্রধানের প্রথম সাক্ষাৎকারের ফলাফল শূন্য। নীচে আর পাঁচের লড়াই দামনে। কলকাতা তথা বাংলা ফেডারেশন ফুটবল উদ্যোক্তারা এখন সেদিকে চোখ রেখে দিন গুনছেন।

বাংলাই শ্রেষ্ঠ ঃ ফেডারেশন কাপ কলকাতায়

ও কথা থাক. ফেডারেশন কাপের কথাতেই আসা যাক। সারা ভারতের নামকরা কুড়িটি দল এবারের অর্থাৎ দ্বিতীয় ফেডারেশন কাপে খেলা দিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল কাপোয়ারার কে. সি. টি., বাঙ্গালোরের আই. টি. আই., কেরলের প্রিমিয়ার টায়ার্স, বোম্বাইয়ের মফৎলাল, কলকাতার মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মোহমেডান স্পোর্টিং প্রভৃতির মত সব নামী ক্লাবগুলো। শুধু নামী বললে বোধহয় বোঝা যাবে না। আরো একটু স্পষ্ট করে বলার দরকার। কে. সি. টি. বলতে পুরো পাকাস দলটাকেই বোঝায়। হরজিন্দার, ইলায়, সুখবিন্দার, ভরদেব, পাথরাজ থেকে আরম্ভ করে সকলেই আছেন ঐ দলে। আবার প্রিমিয়ার টায়ার্স দলে আছেন কেরলের বেশীর ভাগ খেলোয়াড়রা।

তাই ফেডারেশন কাপ বেশ বড় দরের প্রতিযোগিতা। আসতে বছর এই প্রতিযোগিতার আসর কলকাতায় বসার কথা। কলকাতার দর্শকরা তখন এবারের জাতীয় ফুটবলের পর আবার একটা ভালো ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে পাবেন।

এবারের ফেডারেশন কাপের পরিচালন ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। রেফারিংও আশানুরূপ হয় নি। কোয়েম্বাটুর একটি শান্তিপ্রিয় শহর। সিনেমা নগরীও বলা যায়। তিনদিন ছাড়া বেশী বাইরের রেফারীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখে নিয়ে যাওয়া হত না। তাই বেশীর ভাগ খেলাই পরিচালনা করেছেন স্থানীয় রেফারীরা। তাঁরা খেলার সঙ্গে পুরো

দিতে পারেন নি। বরং বলা যায় বার বার খেলোয়াড়দের হলুদ কার্ড দেখিয়ে তাঁদের খেলার গতি রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফাইনাল খেলার দুদিনই রেফারীদের এই আচরণের শিকার হয়েছেন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা।

প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেছিল কলকাতার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল (দু বিভাগ বিজয়ী দলে), কাপোয়ারার কে. সি. টি. ও বাঙ্গালোরের আই. টি. আই.। আই. টি. আই. গত বছর মোহনবাগানকে হারিয়ে প্রথম বছরের ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিল। সেই আই. টি. আই.কে সেমিফাইনালে খেলতে হল মোহনবাগানের সঙ্গে আর ইস্টবেঙ্গল খেলল কে. সি. টি.র বিরুদ্ধে। মোহনবাগান প্রথম পর্বে দু গোলে হারালো আই. টি. আই. কে। দ্বিতীয় দিন জিততে পারে নি তবে গোল দু গোলে। শেষ পর্যন্ত তাই বেকারের মাঠেন ভেদ প্রথায় তারা আই. টি. আই. কে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। আর ইস্টবেঙ্গল প্রথম দিন এক গোলে ও দ্বিতীয় দিন দু গোলে কে. সি. টি.কে হারিয়েছিল। ফাইনাল খেলার দুদিনের ১৮০ মিনিটে কি মোহনবাগান কি ইস্টবেঙ্গল কেউই পারে নি গোল করতে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. জি. রামকৃষ্ণন।
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্রাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

পঞ্চাশ পয়সা

১৬ ৩০ জুন ১৯৭৮

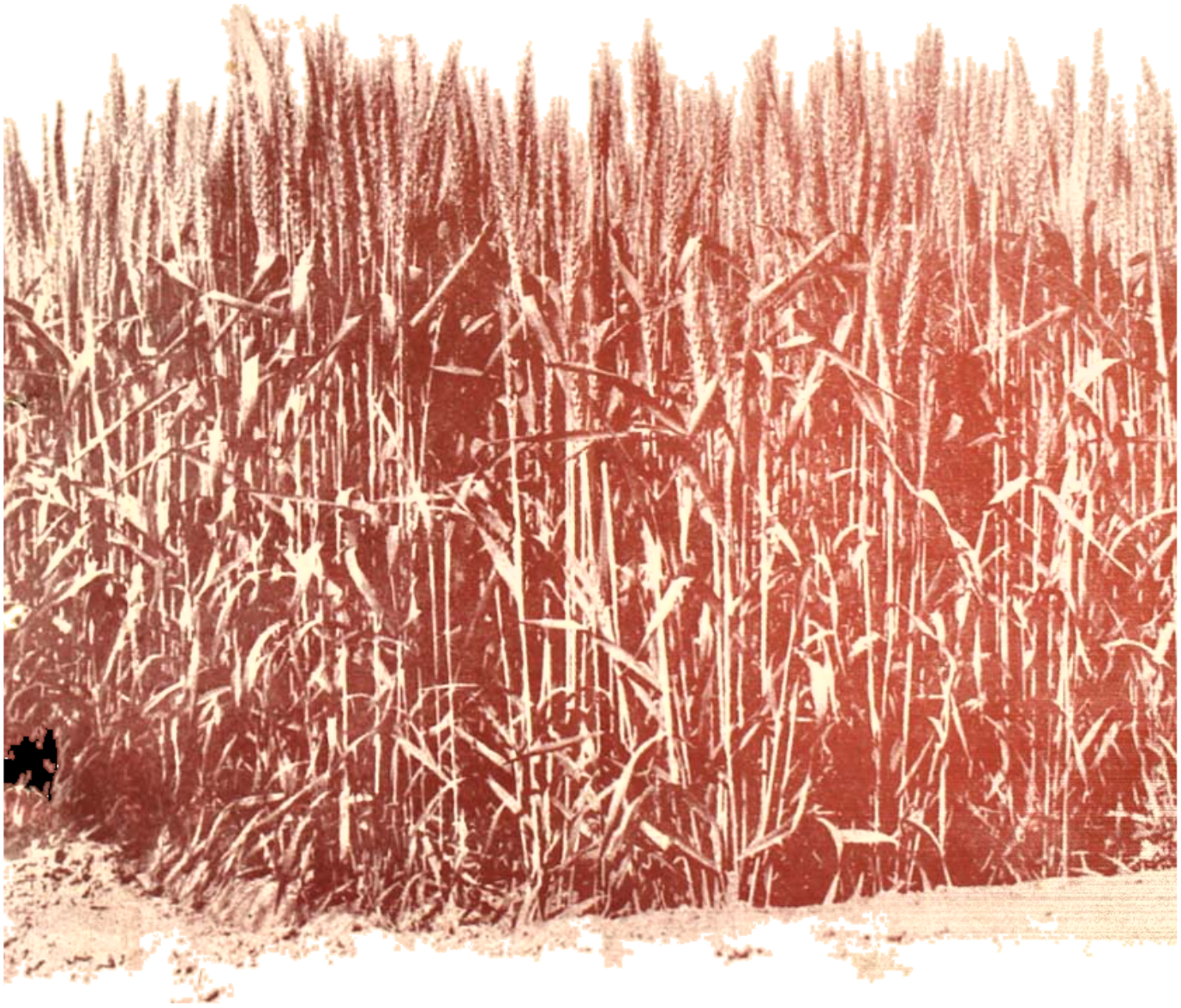

চিঠি

মহাশয়,

নিয়মিত দেখি বনবাসে লেখা গোপন করা হয়ে। আসলে 'বনবাসো' আমি প্রথমেই দেখি। বিগত কয়েকটি সংখ্যার পাতা একঘেয়ে অসহ্যতার ঘোর রাখতে রাখতে কেমন যেন ঝিমিয়ে আসছিলুম। হঠাৎ, এক অনক চৈত্রী সন্ধ্যার সন্ধ্যা হাওয়ার মতন '১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৭৮' বনবাসো হাতে এসে পৌঁছলো। কিন্তু নতুন অসহ্যতা এবং কিছু লাল অসহ্যার দিয়ে নিজেকে অলঙ্কৃত করেছে দেখে মনটা হঠাৎ খুব খুশী হোল।

সম্পাদক 'শিল্প সংস্কৃতি'কে ভালো রাখছো। 'সংবাদ', 'জানা অজানা' ইত্যাদি পত্রিকার চলক বাড়িয়েছে। আজকের পটভূমিতে শান্তিকুমার মিত্রের 'গ্রামোন্নয়নে সমবায়' এ সংখ্যার একটি দামী প্রবন্ধ। গ্রামকে মনের মত করে গড়ে তুলবার জন্যে তাঁর সরল মন যে পথের উপর জোর দিয়েছে—তা যাঁদের জন্যে দেওয়া তাঁদের মন কাঁড়বে একদিন খুশীর কলক দিন আসবে। 'নতুন শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ' এ সংখ্যার আরো একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। সমর কুমার বসুর 'অগ্রেম' আর একটু পরীক্ষা-মূলক হলে ভালো হতো। বীরেন সাহার 'খবর পাতা নতুন পাতা', পবিত্র চৌধিকের 'চৈত্রের গাজন' ভালো লাগলো। তবে 'চৈত্রের গাজন' লেখাটি পুরুত বেলিনী-পুরের লাবারণ গড় খালাধ লেখা গাজনের বর্ণনা না হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের গাজনের উপর হলেই ভালো হতো। আলো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চৈত্রী গাজনকে উপলক্ষ করে এক ধরণের সন্ন্যাসীর নাচগানের প্রচলন আছে। এই নাচ গানে এক জনকে হর আরেক জনকে পার্বতী সাজিয়ে নেওয়া হয়। ঢাক, ঢোল, কাঁসী সহযোগে পুজোর ১৫।১৩ দিন আগে থেকেই পুজো কর্তৃপক্ষ বিচিত্র সুর এবং বিচিত্র ছন্দে এই নাচগান চৈত্রের ষাঁড়াই গুপুরেও গ্রামবাসীদের এক অঙ্গন থেকে অন্য অঙ্গনে পরিবেশন করে থাকে। গানগুলি হর সাধারণত হরপার্বতীকে নিয়ে। সকলে সমবেত কণ্ঠে গান ধরবার আগে যে ছড়া কেটে দেয় এবং মূল পুজোর আগেও যে মন্ত্রের মত এক ধরণের হরপার্বতীর ছড়া কাটে তাকে বলা হয় বাংলার। পবিত্র দেবী কিন্তু এসব কথা একটুও লেখেন নি।

আশুতোষ বিশ্বাস
গোবরডাঙা, ২৪-পরগণা

আগামী সংখ্যায়

জাতীয় বেতন নীতির সম্ভাব্য সমাধান
আলোচনা করেছেন
অধ্যাপক বীরেন ভট্টাচার্য

বহতা যোজনার প্রকৃতি ও কার্যকারিতা
লিখছেন
যোজনা কমিশনের সহ-সভাপতি
ডঃ ডি. টি. লাকড়াওয়ালার নিবন্ধ

চুরুলিয়ায় নজরুল মেলা
বিশেষ রাজ্যের প্রতিবেদন

অসহায় নারীদের সমস্যা
বিশ্লেষণ করেছেন **মেনা চৌধুরী**

নয়ন ফেরেনি (গল্প)
বরুণ মণ্ডল

প্রতিবন্ধীদের তালিকায়
নতুন নাম স্প্যাসটিক
লিখেছেন **ক্ষমা মুখোপাধ্যায়**

এছাড়া, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, গ্রাম বাংলার কথকতা, খেত খামার, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি নিয়মিত বিভাগ।

'বনবাসো' ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'বনবাসো'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্যের হার ঃ
একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা বনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ২০% কমিশন দেওয়া হয়। গ্রাহকরা ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ডিভিশন। কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে ২০% ছাড় পাবেন। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাবলিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্যালয় ও গ্রাহকমূল্য এবং বিজ্ঞাপন পাঠাবার ঠিকানা :
বনবাসো, পাবলিকেশন্স ডিভিশন,
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
শিশিরকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
অগ্রণী পাক্ষিক

১—১৫ আষাঢ় ১৩৮৫
১৬—৩০ জুন ১৯৭৮
নবম বর্ষ ঃ চতুর্বিংশ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
ডঃ অবধনাথ দত্ত ২

ভারতীয় রেলপথের ১২৫ বছর—প্রগতির খতিয়ান
বিশেষ প্রতিনিধি ৪

রাজধানীর বসন্ত মেলায় ভাঁতের বাহার
দেবব্রত সরকার ৫

ভ্যাগ
উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৭

সংবাদ ১০

আকাশবাণীর পঞ্চাশ বছর
বি. ভি. কেসকার ১১

বেতন ও মাইনিমিজা
স্নেহময় সিংহরায় ১৩

মুখোমুখি
ডঃ বিজয় সেন ১৫

খেত খামার
বিমল বসু ১৭

জানা অজানা ১৯

গ্রন্থ আলোচনা
অমর দাশ ২০

গ্রাম বাংলার কারুকলা
অধীর বিশ্বাস ২১

প্রাঙ্গণ
কেশবলাল দাশ ২২

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

বিনিয়োগ অগ্রাধিকারের পুনর্বিন্যাস করে ১৯৭৮-৮৩ সালের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সার্বিক প্রয়োজনে ও বিপুল কর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিরও যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে তা অনস্বীকার্য। দুর্বল শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের যেখানে বাস এবং যে পেশার উপর এরা নির্ভরশীল সেই গ্রাম এবং কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পকে স্বভাবতই পরিকল্পনায় সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ গঠনমূলক কাজে নৌন সুযোগ-সুবিধা তৈরীর জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দ অর্থ বিনিয়োজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের আর্থিক সাহায্যের সার্বিক চাহিদা বেড়ে যাবে এবং ব্যাঙ্কগুলিকে।

ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তাদের বাঞ্ছিত ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমেই প্রয়োজন দর্বত্র ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার। ১৯৭৬ সাল অবধি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির শাখা সম্প্রসারণে সমস্ত অঞ্চলের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলে মাত্র বছরে ১৫,০০০ ব্যাঙ্ক-শাখা স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের শেষে ৭০০ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক ছিল যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কোন শাখাই ছিল না। পরবর্তী এক বছরে ৩২০ ব্লকে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে। বাকী ব্লকগুলিতে আগামী দু' তিন মাসের মধ্যেই শাখা খোলা হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

ব্যাঙ্কের শাখা সম্প্রসারণ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ঋণদান নীতির পুনর্বিন্যাস যাতে দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা ঋণের সুবিধা নিতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতি এমনভাবে সংশোধন করা হচ্ছে যাতে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন এবং বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থান বাড়ানো হয়। এই মর্মে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৯ সালের মার্চের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে যে ঋণ দেওয়া হবে তার পরিমাণ তাদের দেওয়া মোট ঋণের এক তৃতীয়াংশ হতে হবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে গ্রাম ও আধা শহরাঞ্চলে অবস্থিত তাদের শাখাগুলির ঋণদানের পরিমাণ মোট আদায়ের অন্তত অর্ধেক হতে হবে।

দুর্বল শ্রেণীদের স্বার্থে ঋণদান পদ্ধতি সরলীকরণে ও পার্শ্বকারমূলক ঋণদান কর্মসূচীর আওতা বাড়াতেও কতিপয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত জেলায় লোকসংখ্যার অনুপাতে ব্যাঙ্কের শাখা কম সেইসব অঞ্চলের চাহিদা মেটাবার দিকে বেশী দৃষ্টি দেবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। উদ্দেশ্য হল প্রতিটি অঞ্চলে ব্যাঙ্কের সুবিধাদি সমানভাবে বণ্টন করা।

অনগ্রসর এলাকায় শাখা বিস্তার ও সমাজের দুর্বলতর মানুষদের অধিকতর ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি আজ একটি চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা তারা যদি সার্থকভাবে করতে পারে তবেই তাদের কৃতিত্বের প্রকৃত দাবিদার তারা রাখতে পারবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

ডঃ অমরনাথ দত্ত

১৯৭৮-৮৩ সালের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিনটি লক্ষ্য হ'ল বেকারি ও দারিদ্র্য দূর করা, আয়ের বৈষম্য মোচন আর আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করা। বস্তুতপক্ষে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধনের উপর এই কারণেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ও পরবর্তী অর্থনীতির আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। অর্থনীতির অগ্রগতির হার ধরা হয়েছে ৪·৭ শতাংশ।

পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১,১৬,২৪০ কোটি টাকা। নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ১,০৫,৯৯০ কোটি টাকা (১৯৭৭-৭৮ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে)। এর মধ্যে ১,০০,৮৫৫ কোটি টাকার (৯৫·২ শতাংশ) সংস্থান হবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে আর বাকীটা ৫,১৩৫ কোটি টাকা (৪·৮ শতাংশ) বৈদেশিক সাহায্য বাবদ আসবে। তবে এই খাতে প্রাপ্য মূলধনী আর কার্যকর করার জন্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে ১,২৮০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। তাই নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩,৯৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মূলধনী বিনিয়োগের ৩·৭ শতাংশ।

শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী, সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হ'ল ৬৯,৩৮০ কোটি টাকা আর বেসরকারী ক্ষেত্রে ৪৬,৮৬০ কোটি টাকা। সরকারী ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৫৯,১৩০ কোটি টাকা আর চলতি উন্নয়ন খাতের মাত্রা ১০,২৫০ কোটি টাকা। মোটের উপর, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আনুপাতিক মাত্রা বিশ্লেষণ হ'ল ৫৬:৪৪। এর থেকে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সামাজিকীকরণের একটা নির্দেশিকা সহজেই মেলে।

এবারে সঞ্চয়ের দিকটা দেখা যাক। সরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয় ঘটছে মোট ২৯,৪১৭ কোটি টাকা (মোট সঞ্চয়ের ২৭·৮ শতাংশ)। এই সঞ্চয়ের উৎস হ'ল দুটি। প্রথমতঃ সরকারী বাজেট খাতে সঞ্চয়, বিবিধ মূলধনী আয়, সরকারী ঋণের উপর সুদ প্রভৃতি। আগামী পাঁচ বছরে এদের মোট পরিমাণ ১৩,১৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী উদ্যোগের সঞ্চয় অর্থাৎ লেভনির অবক্ষয় ও সঞ্চিত মুনাফার মোট হিসেব। এটা আগামী পাঁচ বছরে ১৪,২৬৯ কোটি টাকার দিয়ে দাঁড়াবে। এর সঙ্গে যোগ হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১,৯৭৩ কোটি টাকার নত নীট উদ্বৃত্ত।

বেসরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের অনুমিত পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭১,৪৩৮ কোটি টাকা অর্থাৎ এর মোট সঞ্চয়ের ৬৭·৩ শতাংশ। এর বিভিন্ন উপাদান হ'ল, (১) বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়, (২) বেসরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (আর্থিক নয়, যেমন শিল্পক সমবায় প্রতিষ্ঠান) সঞ্চয়, আর (৩) গৃহস্থালী সঞ্চয়। তবে এর মধ্যে তৃতীয়টিই সিংহভাগ সঞ্চয় অর্জনের কৃতিত্ব লাভ করেছে এবং এই পরিকল্পনায় এই খাতে হিসেব ধরা হয়েছে ৬২,৩৬৪ কোটি টাকা বা মোট সঞ্চয়ের ৫৮·৮ শতাংশ। আর বেসরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ের হিসেব দাঁড়াচ্ছে ৮,২৯৩ কোটি টাকা বা মোট সঞ্চয়ের ৭·৮ শতাংশ।

মিশ্র পরিবর্তিত অর্থনীতির একটা বিশেষত্ব হ'ল যে সম্পদ যেখানেই সৃষ্টি হোক না কেন, প্রয়োজনবোধে তা ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগান যেতে পারে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বেসরকারী ক্ষেত্রের ৭১,৪৩৮ কোটি টাকার সঞ্চয় থেকে সরকারী ক্ষেত্রে ২৪,৫৭৮ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য ৪৬,৮৬০ কোটি টাকা সঞ্চয় অবশিষ্ট থাকছে। অন্যদিকে, সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ হ'ল ৪৯,১৩০ কোটি টাকা। এই সঞ্চয় তহবিলের তিনটি উপাদান হ'ল, (১) সরকারী ক্ষেত্রের নিজস্ব সঞ্চয় ২৯,৪১৭ কোটি টাকা, (২) বেসরকারী ক্ষেত্রের ২৪,৫৭৮ কোটি টাকা (হস্তান্তরিত) ও (৩) ৫,১৩৫ কোটি টাকার বৈদেশিক সঞ্চয় (ঋণ)। এদের ফলে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে পরিকল্পিত বিনিয়োগের ৫৬ শতাংশ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিগত পঞ্চম পরিকল্পনায় এই অনুপাত প্রায় একই রকম ছিল।

বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়ের গুরুত্ব যে খুবই বেশি তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু আনুপাতিক হিসেবে তা মোট সঞ্চয়ের ৭·৮ শতাংশের বেশি হবেনা কারণ এই ধরণের সঞ্চয়-বৃদ্ধির পথে কতকগুলি বাধা রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে বিগত ২৫ বছরে উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক অগ্রগতি ঘটার বিপরীতে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে উত্তরত শহর ও গ্রামাঞ্চলে যার ফলে আয়ের অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে অনুৎপাদক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বিলাস দ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় সমাজের এক শ্রেণীর ভোগের মাত্রা ক্রমশই অস্বাভাবিকভাবে উন্নীত হতে চলেছে। অন্যদিকে দীর্ঘপ্রসারী মুদ্রা-নীতির ফলে টাকার প্রকৃত মূল্য কমতে থাকায় প্রকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

মোট গৃহস্থালী সঞ্চয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, বে-সরকারী ও কোম্পানি নয় এমন সব প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়, কৃষি,

শিল্প ও বাণিজ্যিক পেশার এবং অ-ব্যাঙ্ক-জনক প্রতিষ্ঠান যেমন ট্রাস্ট (trust), লাভের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সঞ্চয়। দেশে সৃষ্ট অধিক সম্পদের ভিত্তিতেই এগুলির সঞ্চয় হিসেব করা হয়ে থাকে। বর্তমান পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে যে ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের পরিমাণ গড় হিসেবে বছরে ১৯·৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। এর মধ্যে চাহিদা আমানতের বৃদ্ধির হার হ'ল বছরে ১৮ শতাংশ আর মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে তা হ'ল ২১ শতাংশ। আগামী বছরগুলিতে এই দুই প্রকার আমানতের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৫ ও ২০ শতাংশ হিসেবে মোট আমানতের বৃদ্ধি ঘটাবে ২৮,৫৯৩ কোটি টাকার মত। গৃহস্থালী সঞ্চয়ের সঙ্গে সঞ্চয় সংস্থা, নন-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, জীবনবীমা কর্পোরেশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতির আর্থিক সঞ্চয় যোগ করে নীট বৃদ্ধির পরিমাণ ২০,২০৭ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে। আর্থিক দায়-দায়িত্বের পরিসর ওই সময়ে ৮,৬৭২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহস্থালী ক্ষেত্রের আর্থিক সম্পদের নীট বৃদ্ধি ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৩৪,১১৯ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এর সঙ্গে প্রকৃত সম্পদের (physical assets) নীট বৃদ্ধি ২৮,২৪৫ কোটি টাকা যোগ করলে মোট গৃহস্থালী ক্ষেত্রের সঞ্চয় ১২,৩৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

এবারে বিনিয়োগের প্রসঙ্গে আসা যাক। সাময়িক পরিকল্পনার রূপরেখা থেকে দেখা যায় যে ১,১৬,২৪০ কোটি টাকার হিসেবের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পনা ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯,৩৮০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৫৯·৭ শতাংশ। ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীই হ'ল প্রাধান্যকারী। তাই গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য বাজেটবরাদ্দ হ'ল মোট পরিকল্পনা খরচের ৪৩·১ শতাংশ, অর্থাৎ পঞ্চম পরিকল্পনার এই খাতে বরাদ্দের দ্বিগুণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দের এই তুলনামূলক হিসেব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উপরে ঝোঁকটা কমিয়ে গ্রামীণ শিল্প, কৃষি ও শক্তি উৎপাদনের উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শক্তি উৎপাদনের উপরে পঞ্চম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের ২৬·২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৭৮-৮৩ সালের পরিকল্পনায় তা ৩০ শতাংশে বাড়ানো হয়েছে। সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ আগের পরিকল্পনায় ১৮·৭ শতাংশ থেকে হ্রাস করে এবারের পরিকল্পনায় ১৪·৯ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ হেরফের ঘটানো হয়নি।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই আলোচনা থেকে দেখা যায় যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু এদিক থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য নীতি এখনও গৃহীত হয়নি। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য-সচিব ডঃ সাকডাওয়ালা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে চতুর্থাংশ প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমেই সরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। এর কারণ বর্তমান পরিকল্পনার শেষে আমরা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হব যেখানে কর বা সঞ্চয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়বৃদ্ধির অনুপাতে কোনমতেই উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যাবেনা। আমাদের এজন্য এমন একটা পথা চিন্তা করতে হবে যাতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে পরিকল্পনা ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়। পরিকল্পনার শেষে করের হার জাতীয় আয়ের অনুপাতে ১৮·৪ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশে বাড়ছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই হ'ল পরোক্ষ করের অবদান। ওদিকে পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ ব্যয়বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। এর অর্থ হ'ল আরও ১৩,০০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ—কেন্দ্রে ৯,০০০ কোটি টাকার ও রাজ্যগুলিতে ৪,০০০ কোটি টাকার। মোট উৎপাদনশীল বিনিয়োগের একটা বিরাট অংশই বর্তমানে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত। পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত করে ও লাভজনক উৎপাদন ঘটিয়ে সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলি থেকে সম্পদ আহরণের নতুন প্রচেষ্টার উপরে বর্তমান পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৮২-৮৩ সালে সঞ্চয়ের পরিমাণ (১৯৭৭-৭৮ সালের তুলনায়)

অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ (Sectors)	অনুমিত সঞ্চয় (কোটি টাকায়)		জাতীয় আয়ের শতাংশ		মোট সঞ্চয়ের শতাংশ	
	১৯৭৭-৭৮	১৯৮২-৮৩	১৯৭৭-৭৮	১৯৮২-৮৩	১৯৭৭-৭৮	১৯৮২-৮৩
১। সরকারী ক্ষেত্র	৩,৩৬২	৭,৮৮৮	৪·১	৭·৪	২০·৯	৩১·৬
(ক) সরকারী প্রশাসন	১,৯৬৬	৪,৭১৪	২·৪	৪·৪	১২·২	১৮·৯
(খ) স্বয়ংশাসিত সরকারী সংস্থা	১,৩৯৬	৩,১৭৪	১·৭	৩·০	৩·৭	১২·৭
২। বেসরকারী ব্যবসায়িক ক্ষেত্র	১,৩৯৩	২,১১৮	১·৭	২·০	৮·৬	৮·৫
৩। গৃহস্থালী ক্ষেত্র	১১,৩৪৮	১৪,৯২৫	১৪·০	১৪·০	৭০·৫	৫৯·৯
সমষ্টি (১+২+৩)	১৬,১০১	২৪,৯৩১	১৯·৮	২৩·৪	১০০·০	১০০·০

ব্যয়বরাদ্দের সারণি ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভারতীয় রেলপথের ১৫০ বছর
— প্রগতির খতিয়ান

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতের অর্থনীতিতে রেলপথের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রী ও মাল পরিবহণে ভারতীয় রেলের জুড়ি নেই। প্রতিদিন সাড়ে নয় লক্ষ যাত্রী এবং দুইলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টন মাল পরিবহণে এতটুকু ক্লান্তি নেই তার। এই বিশাল পরিবহণ পালনের জন্য জনসেবায় নিয়োজিত এগার হাজার রেলগাড়ি আট হাজার চারশত চৌষট্টি কোটি কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে সাত হাজার ছাপ্পান্নটি স্টেশন অতিক্রম করে রোজ এই বিরাট সংখ্যক যাত্রী ও মাল পরিবহণ অনায়াসে সম্পন্ন করে চলেছে।

এই বিষয়টি আমরা যদি একটু অন্যভাবে চিন্তা করি তাহলে সহজে বলা যায় ১৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ প্রতিদিন পড়ে পরিক্রমা করে ভারতীয় রেল। এই দূরত্ব মোটেই কম নয়, চাঁদের দূরত্বের প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশী। সারা দেশের অর্ধেকের বেশী যাত্রী পরিবহণ করে এই রেল আর সারাদেশের দুই তৃতীয়াংশে মাল পরিবহণের কৃতিত্বও তারই। প্রতিদিন রেলে গড়ে ৩২ হাজার ওয়াগন মাল বোঝাই হয়।

রেলপথের মালিকানা আর পরিচালনা মাত্র একটি কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। ভারতের রেলপথ এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থতম। সরকারী মালিকানার ক্ষেত্রে রেলই বৃহত্তম উদ্যোগ। মোট লগ্নীর পরিমাণ ৫,৫৭২ কোটি টাকা এবং বার্ষিক আয় ২,১০০ কোটি টাকারও বেশী। নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রেও রেলের স্থান সর্বাগ্রে, কর্মীসংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষের মতো।

এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চে আছেন রেলমন্ত্রী মহাশয়। রেলমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে রেলওয়ে বোর্ড সমস্তকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। কাজের সুবিধার জন্য ভারতীয় রেলপথকে নয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে আবার আলাদা ভাবে প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে।

ভাবতে অবাক লাগে সেই ১৮৫৩ সালে যেদিন প্রথম রেলগাড়ি চলেছিল মাত্র ৩৫ কিলোমিটার পথ শুধু বোরিবন্দর থেকে থানা পর্যন্ত আজ তা বিশাল আকারে সারা ভারতময় পরিব্যাপ্ত। নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার ত্রিশ বছরে ভারতীয় রেল বিশেষ করে নির্মাণ ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা ও কারিগরী কুশলতা অর্জন করেছে। ভারতের স্বাধীনতার সময়ে ভারতীয় রেল আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল সেই পরনির্ভরশীলতার অবসান ঘটেছে আজ। বিগত তিন দশকে নানা উন্নয়ন প্রকল্প ও আধুনিকীকরণের বিপুল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ভারতীয় রেল একটি সুসংবদ্ধ সংস্থায় রূপান্তরিত হয়ে নানা অনুশীলন, ডিজাইনের চর্চা ও বাণিজ্যায়নের কার্যধারার মধ্য দিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে রেলওয়ে সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। আজকে আমরা রেলের জটিল যন্ত্রপাতি সহ যাবতীয় সাজসরঞ্জামের ডিজাইন ও উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ১৯৪৭ সালের পূর্বে যেখানে আমরা পুরোপুরি আমদানি করা যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করতাম এখন তা বদলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র সাত ভাগ।

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার কাছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস স্থাপন করা হয়। এই কারখানায় ২,৩৫১ টি স্টিম ইঞ্জিন তৈরী হয়েছিল। বাষ্পীয়যানের সীমাবদ্ধতা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যৎ যাত্রী পরিবহণের কথা ভেবে ১৯৬১ সাল থেকে চিত্তরঞ্জন কারখানায় বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিনের উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানে এ সি/ডি সি মৈত্র বিদ্যুৎবাহী এঞ্জিনেরও উৎপাদন চলছে। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৭৮টি ডি সি, ৫৩৭ টি এ সি এবং ৩৪ টি এ সি/ডি সি বিদ্যুৎচালিত এঞ্জিন উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে উত্তরপ্রদেশের ধারাপল্লীতে ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে ডিজেল ইঞ্জিনের উৎপাদন শুরু হয়েছে। এক হাজারের ওপর ইঞ্জিন এপর্যন্ত উৎপাদিত হয়েছে এই কারখানা থেকে। আগেই ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বুরে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়েছিল যাত্রী বগি তৈরী এবং সারানোর জন্য। ঘাট রকমের দশহাজারেরও বেশী ধাতুনির্মিত শয়নযান, চেয়ারকার, ই. এম. ইউ. কোচ, এ সি টু টায়ার কোচ (স্লিপার শয়ন কামরা) প্রভৃতি বগি তৈরী হয়েছে এই কারখানা থেকে।

এই তিনটি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ছাড়া ভারতীয় রেলের ৪৬ টি কারখানা রয়েছে। এই সব কারখানায় ভারতীয় রেলের বিপুল সংখ্যক রেলগাড়ীর মেরামতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কোন কোন কারখানায় ১৯৬০ সালে রেল ওয়াগন তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। এইভাবে অন্যান্য সরকারী উদ্যোগ সমূহেও উৎপাদনের কর্মধারা অব্যাহত রেখে আভ্যন্তরীণ চাহিদার

৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

রাজধানীর বসন্ত মেলায় তাঁতের বাহার

দেবব্রত সরকার

তাঁতের বস্ত্র কোকিল ডাকা গ্রাম ভারতের অতি পরিচিত শব্দ। এই তাঁতের ওপর পরিশ্রমী মানুষের নিপুণ হাতের স্পর্শে ও কল্পনার জাদুতে যে বিস্ময়কর জগতের জন্ম তার নাম হ্যাণ্ডলুম বা তাঁত বস্ত্র।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষির পরেই সবচাইতে বেশী সংখ্যক লোক জীবিকার জন্য হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে জড়িত। নিঃসন্দেহে দেশের বৃহত্তম কুটির শিল্প এই তাঁত শিল্প। দেশের এক কোটি লোক কাজ করছেন তাঁত নিয়ে। এছাড়া সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বলে গ্রাম ভারতের মহিলাদের এক বিরাট সংখ্যাও হস্তচালিত তাঁতে কাপড় বোনার কাজে লিপ্ত। সুতরাং তাঁতীর আর্থিক উন্নতির অর্থ হল গ্রাম ভারতের উন্নতি। আর এই উন্নতি সম্ভব হবে যখন হ্যাণ্ডলুম বস্ত্রের জনপ্রিয়তা বাড়বে, বাড়বে দেই সঙ্গে বিক্রি।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপক গ্রাম উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন নতুন পরিকল্পনার জন্য গ্রাম ভারতের এই প্রাচীন কুটির শিল্পটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোকে রীতিমত শক্ত করতে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রকের হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেণ্ট দপ্তর তাঁত বস্ত্রের জনপ্রিয়তা বাড়াবার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। কোন দ্রব্যের জনপ্রিয়তা বাড়াবার একাধিক আধুনিক পদ্ধতি আছে। বিজ্ঞাপন এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। তবে কর্তৃপক্ষের অভিমত হল বিজ্ঞাপন ছাড়াও মুখ্য ক্ষেত্র অর্থাৎ পরিবারগুলির সঙ্গে হ্যাণ্ডলুম বস্ত্রের সরাসরি চাক্ষুষ পরিচয় ঘটানো দরকার। এই বিপুল ঐশ্বর্যের সঙ্গে ক্রেতাদের পরিচিতি ঘটাতে সম্প্রতি প্রদর্শনীর মাধ্যমে। ঠিকভাবে আয়োজন করলে দর্শক বা ক্রেতার মনে রেখাপাতও করবে। আর তার ফলে হ্যাণ্ডলুম বস্ত্র সম্বন্ধে জনমানসে বিশেষ আগ্রহ। এই আগ্রহকে ক্রিয়াশীলের কারখানা বা ট্রেড-এ রূপান্তরিত করতে পারলে বিক্রি বাড়বে। এই উদ্দেশ্যে রাজধানীতে কিছু দিন আগে শিল্প বাজার বা মার্কেট মেলার আয়োজন করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার।

সরকারী এই প্রচেষ্টার অপর এক উদ্দেশ্যও ছিল। শিল্প বাজারে ক্রেতাদের ও দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার সমীক্ষা করা। পছন্দ ও চাহিদা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা। আর সেইমত কী ধরণ ও কী ধরণের কাপড়চোপড় তৈরী হবে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রে সেইমত নির্দেশ পাঠাবেন। এক কথায় হ্যাণ্ডলুম বস্ত্রাদির উৎপাদন পরিকল্পনা প্রতি বছরই ঢেলে সাজানো হবে।

সব দিক থেকে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য এবার সফল হয়েছে। ডিসেম্বর গ্রামীণ পরিবেশের আদলে এই শিল্প বাজারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বাজারের পথগুলি ছিল কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামেরই পথ। ছিল কুয়ো, চৌবাচ্চায় ভটলা করার নির্দিষ্ট স্থান, মেয়েদের পাড়া, মাচ বসার ডাল, আর হাট-বাজার। লোকগীতি, বাজনা, এবং উত্তর প্রদেশের নাটকীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের যাত্রার ঐতিহ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সৃষ্টি ও শিল্পের সাজ-সজ্জার ফ্যাশন শো ছিল একটি উল্লেখ-যোগ্য দৈনিক অনুষ্ঠান।

এখানে এবার কেনা-বেচাও ভালই হয়েছে। মোলটি দিনে বিভিন্ন রাজ্যের বিচিত্র তাঁত বস্ত্রের সম্ভার রীতিমত চোখ ধাঁধানো, মন মাতানো ব্যাপার। হ্যাণ্ডলুম বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই সকল প্রদর্শনীতে প্রকট হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে ডিজাইন, রঙ এবং বুননের ক্ষেত্রে। সাটের কাপড়, শাড়ি, বেড কভার, টেবিল ম্যাট, হ্যাণ্ড ব্যাগ—সব কিছু প্রতিটি অঞ্চলের কারিগরি দক্ষতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য।

রাজধানীর এই বসন্ত মেলায় পশ্চিম-বাংলার তাঁতের শাড়ির জনপ্রিয়তা চিল লক্ষ্য করার মত ব্যাপার। যবনিকাপাত মহিলা মহলে সাড়া তুলেছে বালুচরী তাঁত, ধনেখালি, টাঙ্গাইল ও শান্তিপুরী শাড়ি। কলম দে সর্বভারতীয় ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করতে পারে এটা সম্ভবত তারই লক্ষণ। সব চাইতে বেশী বিক্রি হয়েছে কাতৌয়া প্রজেক্টের ষোল টাকা এবং বেগমপুরের ত্রিশ টাকা দামের শাড়ি। বিক্রি ভালো হয়েছে উত্তর প্রদেশের বেনারসী ও গাজীপুরের শাড়ি, অন্ধ্রপ্রদেশের জরতা সুতী আর মহারাষ্ট্রের হ্যাণ্ডলুম চৌরিকট। এই হ্যাণ্ডলুম চৌরিকট এই প্রথম এলো মহারাষ্ট্রের বাইরে উত্তর ভারতে। মিল থেকে বাতিল করা অথচ ভালো চৌরিকট সুতো তাঁতে ফেলে বোনা এই চৌরিকট কাপড়। মহারাষ্ট্রের নান্দেড় অঞ্চলের একটি সমবায় সমিতি এই হ্যাণ্ডলুম চৌরিকট তৈরী করছেন। নানা রঙের এই চৌরিকট কাপড়ের দাম মিটার প্রতি তিন থেকে ত্রিশ টাকা। ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা থাকায় অন্যান্য রাজ্যে এই কাপড়ের বিপণন সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন সর্বভারতীয় বাজারে এই হ্যাণ্ডলুম চৌরিকটের উদয় হবে।

উৎপাদনের গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে ডিজাইন ও রঙের ব্যবহারে যে আধুনিকতার ছাপ পড়েছে তার এক ঝলক ইঙ্গিত পাওয়া গেলো শিল্প বাজারে। প্রয়োজনে হ্যাণ্ডলুম বস্ত্রাদির উৎপাদন যাতে পরের

ক্ষেত্রের প্রয়োজন ও রুচি সম্বন্ধে হয়ে যে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্ক সচেতন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক অনুদান দিতে শুরু করেছেন। দেশের নানা অঞ্চলে আপাতত একটি ইনটেগ্রেটেড চাওলুম ডেভেলাপমেন্ট প্রকল্প চালু করবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির একটা বড় উদ্দেশ্য হল, যে তাঁতীরা সংগঠিত নয় এবং সরকারী সাহায্য পাবার সুযোগ তাদের এই প্রথম বার। চাওলুম ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশনের আওতায় আনা। এই সব তাঁতীদের সুতো, রঙ এবং রাসায়নিক জিনিষপত্র নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হবে। এছাড়া এইসব অসংগঠিত তাঁতীদের উৎপাদন বিপণনের দায়িত্বও নেবে করপোরেশন।

দেশের একলক্ষ তাঁতী সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত এখন। চলতি বছরে আরও চার লক্ষ তাঁতীকে সমবায় সমিতির আওতায় আনবার চেষ্টা হবে। আর আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িত এক কোটি কর্মীর মধ্যে অন্ততপক্ষে আট লক্ষকে সমবায় সমিতির আওতায় আনবার ব্যাপক পরিকল্পনা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের।

তাঁতীদের কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে শহরবাসীদের শ্রিং বাজার জাতীয় ব্যবধান যথাসম্ভব দূরমাস অন্তর একবার পরিচয় হওয়া দরকার। শহরের মানুষ এইসব জিনিষ ঘরে দেখবে তত বেশী তার মনে দাগ কাটবে। প্রতিটি রাজ্যে তাই এই ধরণের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার। শহরবাসীই আসল ক্রেতা। সুতরাং তাদের মধ্যে প্রচার বেশী হওয়া দরকার। এছাড়া এমন সব বেচা-কেনার হাটে তাঁতীরা জিনিষপত্র নিয়ে বসলে ভালো হয় না কি? তার ফলে তাঁতীদের সঙ্গে শহরের লোকজনের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে। সরাসরি বিক্রি করে তাঁতীরা কিছু আয়ও করতে পারে। রাজধানীর শিল্পবাজারে উপস্থিত কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা এইরকম প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবের কার্যকারিতার প্রয়োজনীয়তা হয়তো আছে কেননা দক্ষতা ও পরিশ্রমের তুলনায় তাঁতীদের দৈনিক আয় এখনও সামান্য।

ভারতীয় রেলপথের ১২৫ বছর

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ক্ষেত্রে আমাদের দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে। আজকে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের ১১,০০০ ইঞ্জিন, ৩৬,৮০০ যাত্রিগাড়ী এবং ৩,১৭,৮০০ মালগাড়ী (ওয়াগন) রয়েছে।

আমাদের দেশে রেলপথ এমনভাবে প্রসারিত হয়েছে যার ফলে দেশের বেশীর ভাগ উৎপাদিত পণ্য দূরদূরান্তে পরিবহণের দায়িত্ব বর্তেছে রেলগাড়ীর ওপর। শুধুমাত্র কাছের পথের পরিবহনের দায়িত্ব রইছে সড়ক পরিবহন। রেল চলাচলের মোট আয়ের ৮০ ভাগই আসছে খাদ্যশস্য, সার, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, ইস্পাত, লৌহ আকর, সিমেন্ট, কয়লা প্রভৃতি অধিক পরিমাণের পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে। মাল পরিবহণের দ্রুততার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় রেলপথে সুপার এক্সপ্রেস (অতি দ্রুতগামী) মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ বাড়তি ভাড়ায় মাল পরিবহণের জন্য দ্রুতগামী পরিবহণ সার্ভিসের (কিউ. টি. এস) ব্যবস্থাও আছে। আরো রয়েছে কনটেনার সার্ভিস যার ফলে বিনা ঝক্কঝামেলায় মালপত্র দ্রুত পরিবহণে দোরে দোরে পৌঁছে যাচ্ছে।

শুধু মাল পরিবহণেই ভারতীয় রেল অলৌকিক অগ্রগতি সম্ভব করেনি যাত্রী পরিবহণেও এক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। বিগত বছরগুলোতে যাত্রীদের সুখসুবিধার জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রভূত অর্থও খরচ করা হয়েছে। যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে আরামে দ্রুত অথচ নিরাপদে ভ্রমণ করুক এই লক্ষ্য সবসময়েই রেল কর্তৃপক্ষের সামনে রয়েছে। আজকের দিনে আমাদের অনেক ট্রেনে যাবতীয় বেসব সুযোগ সুবিধা পাই বেসব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রেলব্যবস্থার সঙ্গে নিঃসন্দেহে তুলনীয়। কয়েকবছর আগে থেকেই দূরপাল্লার ক্ষেত্রে ভীড় এড়ানোর জন্য একশ্রেণীর দ্রুতগামী ট্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বসা ও শোয়ার জন্য আরামদায়ক গদি আটা আসন, পানীয় জল, পড়ার জন্য লাইব্রেরী ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধাসহ দূরপাল্লার অতি দ্রুতগামী ডিলাক্স শ্রেণী সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেন ও শহরে শহরে সংযোগকারী ট্রেন চালু করা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাত্রী ও মাল পরিবহণের ক্রমবর্দ্ধমান বিপুল চাহিদা মেটানোর জন্য শুধু রূপান্তর করে রেলপরিবহণের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, রেলপথ সুদৃঢ় করা হয়েছে, নির্দেশ (সিগনাল) ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছে, রেল ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে এবং সর্বোপরি জনগ্রসর অঞ্চলে রেলপথ বসানো হয়েছে। কারখানায় মেরামতী ও সংরক্ষণ কাজের ক্ষমতা বাড়িয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রায় দুইলক্ষ লোক ভারতের ৪৬টি রেল কারখানায় এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত আছে।

ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ আজ বিদেশে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রেলপথ উন্নয়নের কাজে নিজেদের কারিগরী জ্ঞান ও কর্মকুশলতা রপ্তানি শুরু করেছে। ভারতের তৈরী রেল সরঞ্জাম এখন ব্রহ্ম, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, পূর্ব আফ্রিকা, ইরান, ইরাক, নিউজিল্যাণ্ড, বাংলাদেশ, তাইল্যাণ্ড, ডুবক, কানাডা, ফ্রান্স এবং ফিলিপাইনস প্রভৃতি নানা দেশে পাড়ি জমিয়েছে।

দুটি সরকারী সংস্থা—রেল ইণ্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যাণ্ড ইকোনমিক সার্ভিসেস (ভারতীয় রেল কারিগরী ও অর্থনৈতিক সংস্থা) এবং ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কনষ্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ (ভারতীয় রেল নির্মাণ কোম্পানি) স্থাপিত হয়েছে। কারিগরী ও অর্থনৈতিক সংস্থা (RITES) সিরিয়া, ইরাণ ভাইরে, ইরাক, ঘানা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশে পরামর্শ দানের বরাত পেয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় রেলের জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং জনগণের সহযোগিতায় এই গতি দ্রুততর হবে সন্দেহ নেই।

তগত

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ছোসরা ডিসেম্বর অফিস থেকে বেশ রাত করে বাড়ি ফিরলেন সর্বেশ্বর।

ঘনঘনে মুখ। ঘরে ঢুকে পড়ির আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন ট্রামিনাশা ছাতা আর বউ ঘরে যাওয়া আলোয়ান খানা।

ঠিক তখনই বাথরুম থেকে চলুদ নাগা মাঁচলে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন কুসুমবালা।

—ইয়াগা এত দেরী হ'ল যে?

কিন্তু সর্বেশ্বর কোনো জবাব দিলেন না। শুধু গম্ভীর ভাবে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন খালি ব্রিফকেস আর কোটটা। তারপর আরো না ছেড়েই গা এলিয়ে দিলেন বেত-বোনা ইজি চেয়ারটায়।

সত্যি, এত দেরী হয় না কোন দিন। তবে কি ট্রেন ফেল করেছেন? নাকি ট্রেনেরই কোন গোলমাল? উদ্বিগ্ন মুখে কুসুমবালা তাই সর্বেশ্বরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শীতের সন্ধ্যায় ওঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখটা সাদাটে যেন কাতর; চোখ বুজে যেন যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করছেন সর্বেশ্বর।

তবে কি অম্বলের ব্যথাটা আবার চাগান দিয়েছে? ওঁর বুকের ওপর আলতো ভাবে তাই হাত রাখলেন কুসুমবালা।

—ওগো, একটু পাঁচ তেল মালিশ ক'রে দেব?

— না থাক!

উনি উঠে বসেছেন। ব্যথাটা বুকে নয়, অন্য কোথাও। সে ব্যথা মালিশ করলে সারবে না। সারবে না। জানালার বাইরে পত্র-বিরল, নিঃসঙ্গ ঘোড়া নিম গাছটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন সর্বেশ্বর। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মত যেন ঐ গাছটিকেই প্রশ্ন করলেন—আমার রিটায়ারমেন্ট হতে আর কত দিন বাকি?

রিটায়ারমেন্ট! চমকে উঠলেন কুসুমবালা। এই তো সবে ছাপ্পান্নতে পা দিয়েছেন। এখনকার দিনে এত তাড়াতাড়ি তবে কি অফিসেই কোন গোলমাল? শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তার সঙ্গে এসব কি অলক্ষুণে কথা!

ইঙ্গিতটাকে তবুনি মনে মনে সংশোধন করলেন কুসুমবালা। ঠিক তখনই আবার অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করলেন সর্বেশ্বর —অপু কোথায়?

—কেন, ডেকে দেব?

—না, থাক। —থমকে গেলেন সর্বেশ্বর। বলি বলি করেও কি যেন বলতে পারছেন না। ভেবে পাচ্ছেন না কি ভাবে শুরু করবেন। কার কাছে শুরু করবেন।

অন্ধকার ঘরে তাই আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। আসন্ন প্রায় রোজই সন্ধ্যায় কারোকে পাওয়া যায় না। এদিকে ঘরে নেই কেরোসিন তেল। তাই অপু পড়তে গেছে বন্ধু প্রতীকের বাড়িতে।

সামনেই ওর পরীক্ষা। কলেজের শেষ পরীক্ষা। ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে সারা মহকুমা শহর। আগের পরীক্ষায় ও স্কলারশিপ পেয়েছিল।

কিন্তু এ সময়ে অপুর খোঁজ কেন? কুসুমবালার মনে তাই অজানা আশংকার উঁকি-ঝুঁকি। শিরু শুরু নক্ষের আবোধ দেওয়ালে কাঁপছে সর্বেশ্বরের দীর্ঘ ছায়াটা। সেই ছায়ার মতই কেঁপে উঠলো মায়ের মন। তিনি নিরুপায় চোখে তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে।

—ওগো, অপুর বোধ হয় আর পড়াশুনো হবে না। ওকে মাঝারদের কারখানার সেই কাজটাই নিতে হবে। ওকে খোঁজ নিতে বল। —দীর্ঘ নিশ্বাসের মত শোনায় সর্বেশ্বরের গলা।

—কেন?

আর্তনাদ করে উঠলেন কুসুমবালা।

—বল, আজ থেকে আমার চাকরী নেই। বল, আমি মরে গেছি তোমাদের সংসার থেকে, তবুও অপুকেই তো দব ভার নিতে হবে।

মানুষটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? স্তম্ভিত কুসুমবালা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বর·····বর·····কিন্তু কেন বর·····এসব কথা কেন বলছেন সর্বেশ্বর?

—আজ এসব অলক্ষুণে কথা কেন সবচ বল তো?

স্তীন স্বরে কান্না চাপা দিলেন কুসুমবালা।

প্রশ্ন কোর না, তর্ক কোর না, পরে সব বলব। অপুকে আগে পাঠাও ওর মামার কারখানায়। কাজটা ধরে নিক।

একটু থামি খেয়ে স্বগতোক্তির মত তারপর আর একটু জুড়ে দিলেন সর্বেশ্বর—ওগো ধরে নাও, আমার ছুটি হয়ে

নেহে·····সংসার থেকে·····তোমাদের জীবন থেকে, সব দায়িত্ব থেকে। আমাকে আর কিছু ভেবো না।

এরপর গামছা কাঁধে ফেলে পুকুর ঘাটের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। অন্ধকার ধীরে ধীরে তিমিরে মিলে যায় তাঁর কায়াটিকে।

তখনই প্রতীক্ষকের বাড়ি থেকে অপুকে ডেকে আনলেন কুসুমবালা। সবকিছু খুলে বললেন ছেলেকে। বলার মাত্র-পুত্রের পরামর্শ সভা। একুশ বছরের পা দেওয়া অপু সব কিছু শুনতে শুনতে নিজের মত বলে—তুমি কিছু ভেব না মা বাবা, নিশ্চয়ই অফিসে বড়-বাবুর সঙ্গে ওঁর কোন গোলমাল হয়েছে; হয়ত ঝোঁকের মাথায় ছেড়ে দিয়েছেন চাকরিটা। তুমি আর এখন মাথাব্যথা কোর না। কাল সকালে যাওয়া একটা কিছু করা যাবে!

—আমার কিন্তু বড় ভয় করছে, বাবা। উনি কখনো তো এমন উদ্ভট পাগলা কথা বলেন না।

—ভয় পেও না, কাল ওঁর অফিসে গিয়ে আমি সব খোঁজ নিয়ে আসব'খন! মনে হয় হরিশ কাকুর কাছে জানা যাবে সব বৃত্তান্ত।

রাশভারী সর্বেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর কাছে জবাবদিহি চাইবার সাহস নেই দুজনেরই। মানুষটা যে বড় গোঁসা আর কড়া। চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতেই পা দুরদুর করে।

পরদিন ভোরে সর্বেশ্বরের নজর এড়িয়ে অপুও তাই চড়ে বসল আটটা পাঁচ-এর বনশ্রী লোকালে। ঐ একই ট্রেনে অফিস যান সর্বেশ্বর। তিনিও প্রতিদিনের মত উঠলেন নির্ধারিত কামরায়। বাপ-ছেলে কারও মুখেই কথা নেই। দুজনের মনেই ঘনিয়ে এসেছে কালো মেঘ। ঝড়ের পূর্বাভাস। দু-পাশের মাঠ চিরে ছুটছে বনশ্রী লোকালের অন্য যাত্রীরা কিন্তু যথারীতি মেতে উঠলেন আলোচনায়, বিতর্কে, তাস খেলায়। তাদিবারা হাতে আর ছিপিন বাবু ঝাঁঝতে করে সেই কোলাহলের মধ্যেই ধ্যানস্থ বুদ্ধের মত বসে থাকলেন সর্বেশ্বর।

শিয়ালদহে নেমে তিনি চাইতে শুরু করলেন ডালহৌসির দিকে। আর অপু চড়ে বসল ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে। তাই পিতার আগেই অফিসে পৌঁছে গেল পুত্র। দারোয়ান, বেয়ারা, বড়বাবু সবাই চেনে অপুকে। সেবার সর্বেশ্বরের অসুখের সময় বেশ কয়েকবার আসতে হয়েছিল তাকে। খবর দিতে, খবর নিতে। তাই অপুকে আসতে দেখেই জিজ্ঞেস করলো দারোয়ান রাম সিং—কি খবর খোকাবাবু? বাবুজীর কি আবার বুখার হয়েছে?

অপু বরাবরই মাতুক, কম কথা বলে। তাই ভেবে পেলনা ঠিক কি ভাবে শুরু করবে। শুরু করাটা সব সময়েই কঠিন। তবু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললো পাখি পড়ানোর মত মুখস্থ করে আসা কথাটা।

—আচ্ছা বাবুর চাকরী নিয়ে কি কোন গোলমাল চলছে?

—গোলমাল!—হাসলো রাম সিং। আমি তো কিছু জানে না। আপনি হরিশবাবুর কাছে খোঁজ নিন।

অতঃপর হরিশ কাকুর কাছেই ঐ একই প্রশ্ন করল অপু। তিনিও হাসলেন—গোলমাল আবার কি। বড়সাব তো প্রমোশনই হলো গত মাসে। ওঁর মতো কাজের লোক খুব কমই আছে এই অফিসে।

ধাঁধায় পড়ে গেল অপু। তবে? তবে? তবে?

শান্ত, শুদ্ধ মানুষটির আর কি সমস্যা থাকতে পারে? যিনি তাকে এত স্নেহ করেন তিনি কেন ছুটি নেবেন এই অসময়ে? কেন সমস্যার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেবেন একটা সংসারকে? কেন ভুলে যাবেন সব দায়-দায়িত্ব? তবে কি সত্যি উনি পাগল হয়ে গেলেন?

ঠিক তখনই - চিত্রার ছেলে পড়ল অপুর। ও দেখল অফিসের গেট দিয়ে ঢুকছেন সর্বেশ্বর। কোন মতে তার নজর এড়িয়ে সে তাই নেবে এল পথে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে বার করল বাবা বাবুর সাধান কারখানার ঠিকানাটা।

এদিকে কুসুমবালার মনেও শান্তি নেই। পায়চারি ঘর-বার করছেন। কতক্ষণে ফিরে আসবে অপু।

অবশেষে এলো। প্রথমে অপু, তারপর সংবাদ। না, কোন গোলমাল নেই অফিসে, সেখানে নিয়মমত কাজ করে চলেছেন সর্বেশ্বর। গোলমাল ঘটেছে মনে কোথাও।

সন্ধ্যার আড়ালে সেদিনও বাড়ি ফিরলেন গৃহকর্তা। নিত্যকর্ম পদ্ধতির নিয়মে ঘরের কোণে রাখলেন ছাতা, আলনায় আলোয়ান। কুসুমবালার হাতে দিলেন খালি টিফিন কৌটো। কিন্তু প্রতি মাসের তিন তারিখের মত মাইনের টাকাটা তিনি তুলে দিলেন না গৃহিণীর হাতে। অন্ধকার লণ্ঠনের দাঁড়িয়ে ছিল অপু। এক নজরে মাত্র পুত্রের চোখে চোখে অনেক কথা হয়ে গেল। কান্না আর ভয়ে তখন কুসুমবালার গলা বুজে আসছে। সর্বেশ্বরকে আড়াল করে তিনি চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

বাবা পুকুর ঘাটে যেতেই অপু মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। সবকিছু দেখেছে সে। বলে—আট থেকে আসুন, তখন আমিই জিজ্ঞেস করব। তুমি সন্ধ্যেবেলা তুমি চোখের জল ফেলো না। গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

সর্বেশ্বর হাত মুখ ধুয়ে গোঁজা চলে গেলেন ঠাকুরঘরে। কুলুঙ্গি থেকে বার করলেন তুলোট কাগজে ছাপান গীতা খানা। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে পদ্মাসনে বসে শুরু করলেন আবৃত্তি—ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে.....

ঠিক তখনই পিছনে ছায়ার মত এসে দাঁড়াল অপু। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ডাকল—বাবা!

—কে?

আবৃত্তি বন্ধ করলেন সর্বেশ্বর। ফিরে তাকালেন শিহুরে।

—আপনি আমাদের হঠাৎ এভাবে ত্যাগ করছেন কেন? আমরা কি কোন অন্যায় করেছি?

—ত্যাগ? —বিষণ্ণ চোখে মুখ তুললেন সর্বেশ্বর।—ঠিক বলেছ বাবা, এও এক ধরণের ত্যাগ, বন্ধন মুক্তি, বহুকাল থেকে আমার সব বাঁধনই ছিঁড়ে গেছে, মনে কর তোমার বাপ সর্বেশ্বর চাটুজ্জে বাঁধন কেটে বিদায় নিজেছে সংসার থেকে। হারিয়ে গেছে বনাবরের মত।

অপুর স্বভাব বড়ই চাপা হোক এবার তারও কান্না পেল। সে ধরা গলায় বল্লে—এ আপনি কি বলছেন।

—ঠিকই বলছি বাবা, সব কিছু খুলে বল্লে বুঝতে পারবে আমার অবস্থাটা। কাল বিকেলে বড় ভিড় ছিল ট্রেনে। কোনরকমে শেষ সময়ে এসে ধরেছিলাম পাঁচটা পাঁচের গাড়িটা। ভেতরে তিল ধারনের জায়গা নেই। তাই কোনরকমে দাঁড়ালুম দরজার মুখে; কিন্তু এক হাতে ছাত্র অন্য হাতে খাবারের কৌটো; বড় ধরব কি করে? তাছাড়া ঐ দেশলাই ঠাসা ভিড়ে বেশ টের পেলুম যে বয়সও আমার ওপর শোধ নিচ্ছে; ঐ ভাবে বেশিক্ষণ ঝুলে থাকার সামর্থ্য এখন আর আমার নেই; যে করেই হোক কামরার ভেতরে জায়গা করে নিতে হবে। আমার অবস্থা দেখে ভেতরে দাঁড়ানো এক ছোকরার বুঝি দয়া হল। সে বল্লে: দাদা দেখছি দাঁড়াতেই পারছেন না। আপনি চলে আসুন আমার জায়গায়; আর আমার হ্যে হাত খালি তাই বড় ধরে ঝুলে থাকতে পারব কোন রকমে। —এই ভাবে সেই ছেলেটি আমাকে জায়গা ছেড়ে দিল। মুখচেনা হলেও ওর নাম পরিচয় আমি কিছুই জানতুম না। রোজ ট্রেনে দেখেছি এই যা। আমি কোনরকমে ভিড় ঠেলে গেলুম তার জায়গায়, আর সে এল দরজার মুখে; আমার জায়গায়। গাড়ি তখন সবে উল্টাডিঙি ছাড়িয়েছে। ঠিক তখনই কানে এল এক আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে 'গেল! গেল!' রবে চেঁচিয়ে উঠল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা। কে গেল? —ত্যাৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি বাইরের পোস্টে মা খেয়ে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েছে আমার সঙ্গে বেহোর জায়গা বদল করা সেই ছেলেটি। হায় সর্বনাশ! কয়েক সেকেণ্ড আগেও তো ঐ জায়গায় ঐ ভাবে ঝুলে ছিলুম আমি; তবে তো ঐ অ্যাক্সিডেণ্ট, বাবা, আমারও হতে পারত: সেই নাম না জানা ছেলেটি আমাকে নব জীবন দিয়ে গেছে। স্বেচ্ছায়, হাসি মুখে সে শহীদ হল আজ। অথচ কেউ জানলনা তার এই আত্মদানের কথা।

.....এই কথা যখন ভাবছি তখন যাত্রীর চিৎকারে গাড়ি থেমে গেছে। কামরা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে অনেকেই। কোন মতে আমিও নিজে দাঁড়ালুম ঐ ছেলেটির মৃতদেহের সামনে। তার জামার পকেট থেকে একজন বের করল মানিব্যাগটা। কিন্তু খুচরো পয়সা, একটা মার্কিন সিকি আর এক খানা ফটো; হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ঐ ছেলেটি; আর পাশে মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক মেয়ে আর ফুটফুটে এক বাচ্চা; হয়তো ওরই স্ত্রী আর কন্যা। এক সুখী, সাজানো পরিবার। সোনার সংসার। সেই সংসার মুহূর্তে ভেঙে গেল; ভেঙে দিলুম আমি। আমার জন্যে বিধি নির্দ্ধারিত মৃত্যু সে চেয়ে নিল স্বেচ্ছায়। তাই ওর ঐ সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও কি আমার নয়? তখনই সিদ্ধান্ত নিলুম, বাবা, যে দেখা করব ওর বউ মেয়ের সঙ্গে। আমার সব কথা। নেব তাদের তরণপোষণের দায়িত্ব। কিছু না করলে যে, বাবা, বহাপাতকের কাজ হবে, অনন্ত নরকে গিয়ে পচে মরতে হবে আমাকে।

.....তাই মাইনের টাকা গুলোই দিয়ে এসেছি। বড় অভাব। আমাদের থেকেও। একে যদি তোমরা ত্যাগ বল তো ..... ।

কথা বলতে বলতে কাপড়ের খুটে চোখ ঢাকলেন সর্বেশ্বর।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও বিনিয়োগ (৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

১৯৭৮-৮৩ সালের পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ

বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ	পঞ্চম পরিকল্পনা ১৯৭৪-৭৯ (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয়ের শতাংশ	পরিকল্পনা ১৯৭৮-৮৩ (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয়ের শতাংশ	১৯৭৮-৮৩ সালের পরিকল্পনার পঞ্চম পরিকল্পনার তুলনায় % বৃদ্ধি
১। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেবা	৪,৩৩২	১১·০	৮,৬০৫	১২·৪	৯৯·৫
২। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৪,২২৬	১০·৭	৯,৬৫০	১৩·৯	১২৮·৩
৩। শিল্প ও খনি (শক্তি বাদে)	৭,৩৬২	১৮·৭	১০,৩৫০	১৪·৯	৪০·৬
৪। শক্তি উৎপাদন, বিতরণ ও প্রযুক্তি	১০,২৯১	২৬·২	২০,৮০০	৩০·০	১০২·১
৫। যোগাযোগ ও পরিবহণ	৬,৯১৭	১৭·৬	১০,৬২৫	১৫·৩	৫৩·৬
৬। সমাজ সেবা	৬,২২৪	১৫·৮	৯,৩৫৫	১৩·৫	৫০·১
সর্বমোট যোগ	৩৯,৩২২	১০০	৬৯,৩৮০	১০০	

সংবাদ

মদ্যপান নিরোধে ক্ষতিপূরণ

১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে প্রতি বছর মদ্যপান নিরোধের ফলে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আবগারি রাজস্বের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তার অর্ধেক কেন্দ্র ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৭৭-৭৮ সালের আবগারি শুল্ক থেকে প্রকৃত আয়কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে। আবগারি শুল্ক থেকে সম্ভাব্য বাড়তি আয় অপেক্ষা আইন প্রয়োগ ব্যয় হিসাবের মধ্যে ধরা হবেনা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ধারা সিং তলোয়ান একথা বলেছেন। তিনি বলেন কয়েকটি রাজ্য সরকার মদ্যপান নিরোধ চালু করার জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। তিনটি রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কি পরিমাণ ক্ষতি হবে তার হিসেব দিয়েছেন। নতুন মন্ত্রকের আরো জানান আগামী চার বছরের মধ্যে মদ্যপান নিরোধ ব্যবস্থা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত প্রশাসনকে কয়েকটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

তিন বছরের মধ্যে সারাদেশে সবষ্টি স্বাস্থ্যকর্মী

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী শ্রী রাজনারায়ণ বলেছেন যে আগামী তিন বছরের মধ্যে সারা দেশ সবষ্টি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের আওতায় এসে যাবে। প্রতি এক হাজার লোক পিছু একজন করে সবষ্টি স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রশিক্ষণের সময় এই স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিমাসে দুশ টাকা করে পাবেন। এঁদের প্রশিক্ষণকাল তিন মাস। ইতিমধ্যে ত্রিশ হাজার সবষ্টি স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে আরো ১৫ হাজারকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

দার্জিলিং-এ ফলের বাগান সংরক্ষণ

গত আর্থিক বছরে দার্জিলিং জেলায় মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও বন রোপ করার উদ্দেশ্যে গৃহীত চারটি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। কার্শিয়াং ও কালিম্পং মহকুমা এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। আরও চারটি অনুরূপ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ফলবৃক্ষগুলিকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষার জন্য শত শত হেক্টরের ফলের বাগান কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। কমলালেবু জাম ও কিসমিস জাতীয় ফলের বাগানও বাড়ানো হচ্ছে।

মোটর ট্র্যাকশনের উৎপাদন বেড়েছে

রাষ্ট্রায়ত্ত 'চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ' বিদ্যুৎ চালিত রেল ইঞ্জিনের জন্য ট্র্যাকশন মোটর উৎপাদনে সর্বকালের রেকর্ড তৈরী করেছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই সংস্থা ৯৫২ টি ট্র্যাকশন মোটর উৎপাদন করেছে। আগের আর্থিক বছরে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮৩। এ পর্যন্ত এই সংস্থা বাষ্প, বিদ্যুৎ ও ডিজেল চালিত মোট ৩,৪৪৩ টি রেল ইঞ্জিন উৎপাদন করেছে।

গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩,২৭০ টি কূপ ও নলকূপ খনন অনুমোদন করেছেন। এর জন্য মোট ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

দুধ উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড

এবারের রবি মরশুমে পাঞ্জাবে ও হরিয়ানায় রেকর্ড পরিমাণ গম উৎপাদন হয়েছে। এই দু'টি রাজ্যে মোট ১ কোটি টন গম উৎপাদন হয়েছে বলে ধরা হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ ও সারের ব্যবহারের ফলেই এই অভাবনীয় ফলন সম্ভব হয়েছে।

বিদেশী পর্যটক বাড়ছে

আগের বছরের মার্চ মাসের তুলনায় এবছর মার্চ মাসে এদেশে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা ১৬·৫ শতাংশ বেড়েছে। আলোচ্য মাসে ভারতে মোট ৬৯,৪৮১ জন বিদেশী পর্যটক এসেছিলেন। গত বছর মার্চ মাসে ৫৯৩৫৮ জন পর্যটক এসেছিলেন।

১৯৭৮ সালের প্রথম তিন মাসে ভারতে মোট ১,৮৮,০৯৫ জন বিদেশী এসেছেন। ১৯৭৭ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা এবছরের প্রথম তিন মাসে শতকরা ১৬·৭ ভাগ বেশী।

নব মেখলেন জগদীশ প্রধান

কাঠকয়লার অভাবে পূর্ব সিকিমে রাণীপুলের গরীব মানুষদের দুর্দশার অন্ত ছিলনা। কেননা এ অঞ্চলের লোকেরা রান্নাবান্নার কাজে সাধারণত কাঠ কয়লাই ব্যবহার করেন। সমস্যাটা কিভাবে মেটানো যায় ২৫ বছরের যুবক জগদীশ প্রধান সেকথাই ভাবছিলেন অনেকদিন থেকে। অবশেষে সমাধানের উপায় একদিন তাঁর মাথায় এল। ২৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে তিনি একটি ছোটখাট ধোঁয়াহীন কয়লা তৈরীর কারখানা স্থাপন করলেন।

সিকিমে এধরণের কয়লার কারখানা এই প্রথম। পরে তিনি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ পান। এদিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনেছিলেন। এই কারখানায় দৈনিক ৫ টন ধোঁয়াহীন কয়লা উৎপাদন হয়। এই কয়লা কাঠকয়লা থেকে দামেও সস্তা এবং উত্তাপও বেশী। ইতিমধ্যে এই কয়লা গ্যাংটক, রংপুর রাণীপুল এবং টাঙ্গু-এর বাজার দখল করে নিয়েছে। জগদীশ প্রধানের এই কারখানায় ১০ জন কাজ করেছেন এবং আশা করা যায়, অচিরেই আরো ৬০ জনের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে।

আকাশবাণীর পঞ্চাশ বছর

বি. ভি. কেসকার

১৯২৪ সালে ভারতে বেতার প্রচার করার প্রচেষ্টা শুরু হ'লেও, ১৯২৭ সালেই প্রথম একটি বেতার প্রতিষ্ঠান চালু হয়। সে হিসাবে, ১৯৭৭ সাল থেকে বেতার প্রচারের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব চলছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৬ সালে বেতার প্রতিষ্ঠানটি অধিগ্রহণ ক'রে সরকার এর নাম দেন আকাশবাণী। তখন থেকেই এটি একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করে।

আকাশবাণীর উন্নতি ও প্রসার হয়েছে ধীরে ধীরে এবং স্বাভাবিক কারণেই B. B. C.-র চকে এর কার্যধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রথম শিক্ষকার পরিচালক ও অন্যান্য সকলেই B. B. C. থেকেই এসেছিলেন এবং এখান থেকে কর্মচারীদের প্রযুক্তি শিক্ষা নিতে B. B. C.-তে পাঠানো হ'ত। প্রথম কন্ট্রোলার ছিলেন লিওনাল ফিলডেন। প্রথম চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রথম প্রযোজকও B. B. C. থেকে এসেছিলেন।

বিকাশের প্রথম পর্যায়ে ফিল্ডেন ও তাঁর সহকারী মোখায়ী গ্রাত্বয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের পরামর্শেই কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হ'ত। পাকিস্তান-এর সৃষ্টি হওয়ার পর আকাশবাণীকে কিন্তু অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। তবুও যে ছকে এর কার্যধারা চলে আসছিল, তার কিছু কিছু পরিবর্তন ক'রে পুরোনো ব্যবস্থাই দীর্ঘদিন অনুসৃত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত ছিল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে দেশ তখন গুরুতর সমস্যায় জর্জরিত ছিল। স্বাভাবিক কারণেই বেতারের উন্নতি এবং প্রসার ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বলাভ করেনি। তখন বেতার ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি বিভাগ, যার সংযোগের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে বেতারের বিপুল কার্যকারিতা তখন পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায় নি। সেজন্য দিকের কয়েক বছর বাদ দিয়ে পরবর্তীকাল থেকে আকাশবাণীর প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দেওয়া হল। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি সামনে রেখে ভাবীকালের নূতন সমাজ গড়ে তোলার জন্য এই সংস্থাটিকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুরু হ'ল।

অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ভারতে বেতার প্রচারের সমস্যা অনেক বেশী। বিভিন্ন ধরণের ভাষা এবং বিচিত্র ধরণ এই সমস্যাগুলির অন্যতম। এর ভাবিগরী এবং সাংস্কৃতিক দিক বুদ্ধিগত দিকও আছে। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য বিপুল সংখ্যক ধ্বনি স্তর ও প্রচারযন্ত্র প্রয়োজন এবং প্রতিটি ব্যাপারই ব্যয়সাপেক্ষ। খুব অল্প লোকই জানেন যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই-এর দৃঢ়তা এবং দূরদৃষ্টির কাছে আকাশবাণী কতটা ঋণী। তাঁর জনাই বেতারের আর্থিক ব্যবস্থার বিস্তার হয়েছিল। তাঁরত সরকারের কাছে ইংলণ্ডের ন্যাশনাল ওয়্যারলেস বোর্ড থেকে এক সময় একটি চরমপত্র এসেছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চালু করতে না পারলে অনেকগুলি ধ্বনিস্তর হাতছাড়া হয়ে যাবে। শ্রী দেশাই তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং অর্থসঙ্কটের যোরতর বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আমার অনুরোধে তিনি বিদেশী বিনিময় মুদ্রা খরচ করার অনুমতি দেন।

বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে বেতারের সম্প্রসারণ ও বিস্তার একটি জটিল এবং শর্পকাতর কাজ। বর্তমানে সংবাদপত্রের মতই বেতারও সাংস্কৃতিক ভাবপ্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং অঞ্চলের সকল পক্ষপাতশূন্যভাবে বিভিন্ন ভাষার প্রচারকার্য চালাতে হয়।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গত দুই দশকে বেতার ব্যবস্থার বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তে অনেক নূতন নূতন বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং নূতন নূতন অঞ্চলের শ্রোতৃবর্গের সামনে বেতারকে হাজির করা সম্ভব হয়েছে। শ্রোতার সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। ট্রানজিস্টারের আবির্ভাবের পর সুদূর গ্রামেও এখন বেতারধ্বনি পৌঁছে গেছে। বৈচিত্র আনার জন্য বিভিন্ন স্তরে নানাধরণের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু শ্রোতাদের মুখ চেয়েই বেতার অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন করতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে তিন ধরণের অনুষ্ঠান আছে এবং তাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন এবং শ্রোতাও ভিন্ন। এই অনুষ্ঠানগুলি হল সংবাদ, কথিকা, শিক্ষামূলক ও বুদ্ধিগত আলোচনা এবং সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক আলোচনা।

বেতারে সংবাদ প্রচার ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বেতারের খবর সংবাদপত্রের খবর থেকে আরও তাড়াতাড়ি এবং আরও বেশী সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছতে পারে। রাজনৈতিক বিচারে বেতার সংবাদ পরিবেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কথিকা এবং শিক্ষামূলক আলোচনার থাকে গুরুগম্ভীর বিষয়। নানাধরনের সঙ্গীত, নাটক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয়।

যদিও এর প্রত্যেকটি বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ, তবু এদের কেত্রও বিভিন্ন এবং এদের শ্রোতাও এক নয়। জনমত গঠন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে বেতার সংবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেতারে সংবাদ পরিবেশনা যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে, তবুও এর পরিবেশনের পদ্ধতির উন্নতি করার এখনও যথেষ্ট সুযোগ আছে। সংবাদ বিভাগের উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য সংবাদ বিন্যাস ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পেশাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

বিপুল জনসমষ্টির কাছে সঙ্গীত, নাটক এবং এই ধরণের অনুষ্ঠান খুবই প্রিয়। বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীত অনুষ্ঠানের বিষয়ে অনেক কিছু করা হয়েছে। তবুও অনুষ্ঠানগুলিকে বৈচিত্রপূর্ণ করার জন্য এখনও অনেক কিছুই করার সুযোগ আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রচারের মান উন্নত করা প্রয়োজন এবং শিল্পী ও বিষয় বাছাই আরও বেশী জরুরী। যদিও আকাশবাণী এই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, তবু আরও উন্নতির অবকাশ আছে। শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য অনুষ্ঠানগুলির সঠিক বাছাই প্রয়োজন।

সেই একই কথা কৃষিকা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কারণ এই বিষয়গুলির মধ্যে যেমন বৈচিত্র আছে অনেক স্তরের সম্ভাবনাও তেমনি প্রচুর। এই সব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা বিচার এবং তরুণ ও প্রচারের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া গেলেই এই অনুষ্ঠানগুলির প্রসার সম্ভব। এ ক্ষেত্রেও সঠিক বিষয় এবং উপযুক্ত শিল্পী অথবা বক্তা বাছাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এটা ঠিক যে বেতার প্রচারের আরও উন্নতি করতে গেলে আরও শক্ত ভিতের দরকার। এ বিষয়ে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা প্রধান এবং বেতার ও দূরদর্শনের জন্য প্রথমশ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্ নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। আকাশবাণীর ইঞ্জিনীয়াররা খুবই ভালো কাজ করছেন এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত থাকার জন্য যা কিছু করণীয় সবই করতে হবে।

ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের মত বেতারের প্রশাসনও একই কায়দায় চলছে। তাঁরা আকাশবাণী আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তার জন্য পরিচালনা ও প্রশাসনের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সহানুভূতি পাননি এবং এদের নিয়োগও খাম-খেয়ালীভাবেই হয়েছে। বেশ কিছুদিন নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি এবং সে কারণে লোকের অভাব ঘটেছিল। সুতরাং এ ব্যাপারে একটি দৃঢ় এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত।

যদিও গত দুই দশকে বেতারের প্রচুর উন্নতি হয়েছে, তবুও অনুষ্ঠান প্রযোজনা সম্পর্কে কয়েকটি ত্রুটি দেখা দিয়েছে। আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রশাসকেরাই প্রযোজকের কাজ করতেন। কিন্তু এখন বেতার ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই একই লোক দিয়ে সব কাজ করান ঠিক নয়। কোন দেশের বেতার ব্যবস্থায় এভাবে কাজ করা হয়না। অবশ্য আকাশবাণীর বর্তমান প্রশাসন কর্তারা সম্ভবত এই ব্যবস্থার বিরোধী। বাস্তবিকপক্ষে, কোন প্রযোজকের পক্ষে সমস্ত রকমের অনুষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয় এবং সেভাবে শিক্ষা দেওয়াও যায় না। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিতপ্রাপ্ত লোকেদের সঙ্গে তিন থেকে পাঁচ বছরের প্রয়োজনার জন্য চুক্তি করা সব দেশেরই সাধারণ নিয়ম। এই চুক্তি ঐ প্রযোজকদের সঙ্গে পুনরায় করা যেতে পারে অথবা নাও করা যেতে পারে। যদিও প্রশাসনের লোকেরাই প্রযোজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটামুটি ভাবে দৃষ্টি রাখেন, তবুও অনুষ্ঠান ও শিল্পী বাছাই এবং পরিচালনার দায়িত্ব অভিজ্ঞপ্রাপ্ত প্রযোজকের। অনুষ্ঠানের গুণ বৃদ্ধি করতে এবং বৈচিত্র আনতে চ'লে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রযোজকের প্রয়োজন। যে কোনও অনুষ্ঠানই খুব যত্ন নিয়ে রচনা করা উচিত।

বর্তমানে আকাশবাণীর প্রশাসন সম্বন্ধে বিতর্ক চলছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ন্যায় বেতারও স্বাধীন। অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক কাঠামো অনুযায়ী কোথাও বা স্বশাসন, কোথাও বা আধা-স্বশাসন এবং কোথাও সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আছে। বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয়, ততটা সহজ নয়। পৃথিবীর বহু দেশেই রাজনৈতিক উত্থান-পতনে সশস্ত্র কিম্বা নিরস্ত্র বিপ্লব চলছে এবং জন সংযোগের সর্বাধিক শক্তিশালী ও কার্যকরী মাধ্যম হওয়ায় বেতারই হয় প্রথম লক্ষ্য। আমাদের দেশের পরিস্থিতি যেরূপ তাতে বেতারের দৈনন্দিন কাজকর্মে সরকারী হস্তক্ষেপ থাকা উচিৎ নয়। তবে সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত হলে বেতার সংস্থার মান এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক আদর্শবাদারা ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করবেই। এমন কোন ব্যবস্থাই নেওয়া উচিৎ নয় যাতে এই ধরণের ঘটনা ঘটে, কারণ এতে আকাশবাণীরই সমূহ ক্ষতি হবে।

ধনধান্যে পড়ুন, দেশকে জানুন

গ্রাহকমূল্য : একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রদের ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়।

এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯-এ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বেথুন ও নারীশিক্ষা

স্নেহময় সিংহরায়

জলপ্রাপ্ত জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উনিশ শতকের বাংলার জাতীয় জীবনে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই সময় বিদেশ থেকে এই ব্যক্তি যেন যথার্থ পথপ্রদর্শক রূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের জাতীয় কর্তব্য কী তার নীল নির্দেশন তুলে ধরলেন। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, আপেক্-আওার ডাফ ও উইলিয়ম কেরী প্রমুখ মনস্বী সমাজসংস্কারক ও শিক্ষানায়কের পুণ্যোদ্যানের সঙ্গে তাঁর নাম সমভাবে উচ্চারিত। বস্তুত বাঙালি নারীজাগরণের উজ্জ্বল আকাশে তিনি এক স্বয়ংপ্রভ নক্ষত্র।

বেথুনের জন্ম ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলাণ্ডে। পিতা রেঃ কর্ণেল জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, মাতা এলিনর। পিতা ছিলেন সৈনিক, গ্রন্থকার ও পরে ইংল্যাণ্ডের সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মাতা ছিলেন বুদ্ধিমতী ধর্মপ্রাণ ও সংস্কৃতি সম্পন্না। বেথুনের জীবনে যে উদারতা, মহত্ত্ব ও পরোপকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা তাঁর মায়ের কাছে পাওয়া। বেথুন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতক হন। বেথুন চতুর্থ র‍্যাঙ্গলার হন। অঙ্ক বিষয়ে তাঁর একটি রচনা মৌলিক বিবেচনায় বিশেষ প্রশংসিত হয়। তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। ইংরেজি ছাড়াও তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষা জানতেন। ক্যোরেন্স, তেনিস এবং রোমের মহাফেজখানায় রক্ষিত নথিপত্রের সাহায্যে তিনি 'গ্যালিলিও' এবং 'কেপলার'-এর জীবনী রচনা করেন। এলিজাবেথীয় ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল ব্যাপক। চসার, স্পেন্সার ও শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি আইন শাস্ত্রও পড়েছিলেন। কবিতা রচনাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ তাঁর আইনবিষয়ে দক্ষতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তাঁকে লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে আইনসচিব নিযুক্ত করে ভারতে পাঠান। ঐ সালের বেথুন কাউন্সিল অব এডুকেশন বা শিক্ষাপরিষদের সভাপতিও নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তির পর তিনি তাঁর অভীপ্সিত কর্মধারা রূপায়ণের সুযোগ পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মনীষী তাঁর মূল্যবান কার্যাবলী সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করার বহু পূর্বেই অকালে, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট, মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য তাঁর প্রচুর অর্থ দান করেন। তাঁকে এ কাজে বিশেষ সাহায্য করেন রামগোপাল ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদন মোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫০ সে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হন এবং ১৮৬৯ পর্যন্ত ১৯ বছর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বেথুনের গাড়ীতে তিনি "কন্যাপেক্ষা পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ" মহানির্বাণ তন্ত্রের এই উক্তিটি খোদাই করে দেন। উদ্দেশ্য—দেশবাসীকে নারীশিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এজন্য বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু নারী শিক্ষার এই সূচনা কালে সে সময় জনমানসে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের ভাব অনুভব করা যায়। তার ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবিতা—"আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো তুতকর্ম করতো সবে।/ এখা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।/যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে শেষে/ তখন 'এ বি' শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।" বলা বাহুল্য ঈশ্বরগুপ্ত সমসাময়িক রক্ষণশীল ও প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজমানসের প্রতিক্রিয়ার নির্ভুল পরিচয় রেখেছেন এ কবিতায়।

কিন্তু তিনি নিজে বেথুনের কার্যাবলীকে সমর্থন ও প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, "এই চিরস্মরণীয় মহাশয় (ডেভিড হেয়ার) ইহলোক ইহতে অপসৃত হইলে এরূপ ভাবিয়াছিলাম যে ইংরেজের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ভারতবন্ধু ব্যক্তি আর আমরা প্রাপ্ত হইব না, কিন্তু দয়ালু ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের দুঃখ বিমোচনার্থ সংপ্রতি ধর্মশীল বেং ড্রিঙ্কওয়াটার বেথিউনি সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছেন, মৃত হেয়ার সাহেবের যেরূপ বিদ্যা ছিল না, এবং তিনি উচ্চপদস্থ ছিলেন না, আমাদিগের ব্যবস্থাপক সাহেব অতি সুপণ্ডিত এবং উচ্চপদস্থ, সুতরাং ইহাতে ইঁহার নিকট অধিক সুখের প্রত্যাশা করিতে হইবেক, আমরা বিনিষ্টরূপে অবগত হইলাম, তিনি বর্তমান বিষয়ে সাধ্যমতে মন যায় এবং কায়িক মানসিক ঘর ও পরিশ্রম করণে কখনই ত্রুটি করিবেন না·····।"

বেথুনের পূর্বে যে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য চিন্তা করা হয়নি তা নয়, প্রচেষ্টাও চলেছিল কিছু কিছু। তবে তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৩-এর মধ্যে এদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮-এ। এছাড়া 'লেডিজ সোসাইটি' ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হেদুয়ার দক্ষিণপূর্ব দিকে 'সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল' নামে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁরা কয়েকটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁর নিরলস শ্রম বিশেষভাবে স্বীকৃত হবার যোগ্য সেই কুমারী মেরী অ্যান্ কুক (পরবর্তীকালে বিশেষ উইলসন) এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮২৫-এ কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা প্রতিষ্ঠিত করেন 'লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন'। এ সভার সভানেত্রী ছিলেন পূর্বোক্ত বিশেষ উইলসন। এই প্রতিষ্ঠানও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে হাত দেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, বেথুনের পূর্বেই এদেশে নারীশিক্ষার উদ্যোগপর্ব শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাহলে বেথুনের স্বতন্ত্র কৃতির ও গৌরব কিসে?

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বেথুনের সার্বগ্রিক কীর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে দীপ্যমান হয়ে ওঠে এদেশের অবহেলিত নারীসত্তার প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির অতন্দ্র খড়গীরতা। পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টায় কেবল সাড়া দিয়েছিল দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েরাই। তাদের যে সাহায্য দেওয়া হত, তাতে বিশেষ আকর্ষণের দিক ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে বেথুনের বিদ্যালয়েই এই প্রথম এলেন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের কন্যারা—যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সৌদামিনী, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা ভুবনবালা ও কুন্দমালা ইত্যাদি। এছাড়া পূর্বোক্তদের পাঠক্রমে খ্রীষ্টীয় ছিল আবশ্যিক এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ছিল তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য। কিন্তু বেথুনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। নারীজাতির সার্বগ্রিক উন্নতিই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

বেথুন মহত্তা নারী শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ কাজ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'। এই "সভার উদ্দেশ্য সহজ সরল ভাষায় স্বল্প শিক্ষিতদের বোধার্থে অনুবাদ পুস্তক প্রকাশ।" এর অধ্যক্ষ ছিলেন বেথুন। এখান থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকত্বায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা প্রকাশিত হত। এখান থেকে যে সব বই বেরিয়েছিল তা হল 'রবিনসন ক্রুসো', 'ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাস' ও 'সুশীলার উপাখ্যান' ইত্যাদি। বেথুন বিলাতের নাইট কোম্পানির কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে প্রচুর বুক এনে দেন। এছাড়া নিজে হাজার টাকা দান করেন।

বেথুন মাতৃভাষার শিক্ষাদানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন মাতৃভাষাতেই যথার্থভাবে সমস্ত শিক্ষনীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও আত্মপ্রকাশ সম্ভব। 'বাংলার স্ত্রীশিক্ষা' গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন, "শিক্ষা সমাজের সভাপতিত্বে তিনি হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে পরিদর্শনে গিয়া ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।" ১৮৫১-তে বেথুন বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন সভাবেশে তিনি বলেছিলেন—"আপনারা লক্ষ্য রাখবেন কি রকম অধিবাস ভাবে আমি বিশেষ প্রখর সহ মাতৃভাষার চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে বলে এসেছি।·····অতএব সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলতে হলে বলব, আমরা বাংলাভাষাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করব এবং ইংরেজির নিকটে রাখ কেবলমাত্র কোন কোন পরিপূরক সুবিধার জন্য।" বেথুনের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

বেথুন যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন পরবর্তীকালে সেখানে কলেজ হয়। বর্তমান বছর থেকে কলেজের শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয়েছে। শতবর্ষ ধরে বাংলার বহু নারী এই স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরূপে শিক্ষাজীবনের সূচনা করে উত্তরকালে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন কবি কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই সাহিত্যিকা কন্যা—হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী চৌধুরাণী, শান্তা দেবী ও সীতা দেবী, দেশকর্মী কল্যাণী দাশ, বীণা দাশ, কমলা দাশগুপ্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও সুলতা কর ইত্যাদি। এই কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী অমিতা বসু কলানিধির বাংলা বিভাগ খুলেছেন।

বেথুন যে দীপটি জ্বালিয়েছিলেন আজ তা সহস্র শিখায় উজ্জ্বল হয়ে তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে। নারী চিত্তকে আলোকিত করে ভারতজীবনে তাঁর শিক্ষাদর্শ জাতীয় উন্নতির স্বর্ণসম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করে তুলছে।

মুখোমুখি

রবীন্দ্র পুরস্কার বিজয়ী নেপাল মজুমদার

ডঃ বিজয় সেব

নেপাল মজুমদার। এই নামটি আর অপরিচিত নয়। এবছরের রবীন্দ্র পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত নেপাল মজুমদার। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ'। নেপাল মজুমদারের এই গবেষণা গ্রন্থ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাধনার স্বীকৃতি মাত্র।

নেপাল মজুমদার এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ এক চেতনা আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করেছেন। সেদিক থেকে তিনি মৌলিক গবেষণায় পথিকৃত।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মানবপ্রেমিক। তাই কোন নির্দিষ্ট সীমা তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। যৌবনে তাঁর মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিলো তাই একদিন আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমানবতাবোধে রূপান্তরিত হলো। ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ করেন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'চীনে মরণের ব্যবসায়'। সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার এবং স্বার্থকে সেখানে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। আবার সেই সঙ্গে একই সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভদ্রতা ব্যবসা' নামক প্রবন্ধে ইংরেজদের ভারতীয়দের প্রতি হীন মানসিকতাকে (Kick them first & then speak to them) তিনি কঠোর ভাবে সমালোচনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। ১৩২০ সালে (ইংরেজী ১৯১৩ সন) আমেরিকার বস্টোরে অনুষ্ঠিত এক বর্ষ সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন 'Race conflict' (Mod. Rev. April, 1913)। সে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন :.....Civilized man is seriously confronted with this problem of race conflict. And the greatest thing that this age can be proud of is the birth of man in the consciousness of men...।'

এমন কি পরবর্তীকালে বিবেকবান এক মানবিক কবি হিসেবে বেদনায় পীড়িত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে দুবার করে চিঠি লিখতেও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এমনি বহু ঘটনাই তাঁর জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে।

গবেষক নেপাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর রাজনৈতিক এবং মানবিক চেতনার সঙ্গে জড়িত নানা ঘটনার এক বিশাল চিত্রকে এই বিশাট গ্রন্থের মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। সেদিক থেকে তিনি একজন মৌলিক গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

নেপাল মজুমদারের পুরস্কার প্রাপ্তির পর আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা কবি রবীন্দ্র সদনে এক আলোচনা সভায়। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি একজন একনিষ্ঠ গবেষককে, যাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের কোন অভিমান নেই। বরং তিনি এখন রবীন্দ্রবিষয়ে নিজেকে একজন অনুরাগী গবেষক হিসেবে মনে করেন।

নেপাল মজুমদারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারে আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার এক সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে।

—'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জন্য আপনি কখন লেখা সুরু করেন?

—১৯৫২-৫৩ সাল থেকেই। তখন কবির সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসি বিরোধী ভূমিকা নিয়ে কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি। তারপর ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে মূল গ্রন্থের পরিকল্পনা অনুযায়ে কাজ সুরু করি। ১৯৬০ সালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনা হলেও প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে।

—আন্তর্জাতিকতা বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?

—মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন নির্দেশিত আন্তর্জাতিকতাবাদকে আমি যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনে করি। কিন্তু কিছু ভাববাদী মনীষী, লেখক ও শিল্পী নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বিনিময়ের কথা বলেছেন।

—এই বিষয়ের ওপর গবেষণা সুরুর পূর্বে আপনার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা প্রেরণা কাজ করেছিলো কি?

—প্রথম প্রশ্নের জবাবে তা পাওয়া যাবে। তাছাড়া কবির স্বরূপ ও ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন হলে আমাদের যুগের লেখক শিল্পীদের ইতিকর্তব্যের এক সুস্পষ্ট নির্দেশ সেখানে পাওয়া যাবে।

—রবীন্দ্রনাথের কোন দিক আপনার ভেতর গবেষণার প্রবৃত্তি পূর্ব রচনা করেছিলো ?

—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত ও আকৃষ্ট করেছিলো। পরবর্তীকালে এ নিয়ে গবেষণার ইচ্ছা ও আগ্রহ আমার মধ্যে প্রবল হয়, বিশেষ করে প্রভাতবাবুর 'রবীন্দ্রজীবনী' পাঠ করে।

—রবীন্দ্র ও আন্তর্জাতিকতা প্রসঙ্গের উপাদান কি শুধুমাত্র গ্রন্থ বা পত্র পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? না সেই সঙ্গে কোন অপ্রকাশিত দলিল বা ব্যক্তিগত কোন স্মৃতিচারণা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে?

—গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্রভবন'-এ রক্ষিত archives materials-এর বিপুল তথ্য ভাণ্ডার তো আছেই তাছাড়া ন্যাশনাল লাইব্রেরী, সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরীর মতো সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে রক্ষিত পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য দাবরিকী ইত্যাদির সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। তাছাড়া কংগ্রেসের ইতিহাস (পট্টভি সীতারামায়া) এবং জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থরাজি থেকেও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে গান্ধীজীর জীবনীগ্রন্থ (টেণ্ডুলকার রচিত—১২-খণ্ড) এবং গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের মূল রচনা ও চিঠিপত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে। প্রসঙ্গত, আমার গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডের শেষে গ্রন্থ পরিচিতি দিয়েছি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী প্রমুখ কবির সেক্রেটারী ও অনুগামীদের কাছ থেকেও সাহায্য লাভ করেছি। আর যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের নাম গ্রন্থের ভূমিকাগুলিতে উল্লেখ করেছি।

—কোন শ্রেণীর পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত ?

—স্বভাবতই এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক এবং রবীন্দ্র গবেষকদেরই আকর্ষণ করবে। তাছাড়া সাধারণ অনুসন্ধিৎসু সুপাঠকদের কাছেও কম ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবে না।

—এধরণের রচনা পাঠে কি ধরণের মানসিকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন ?

—ইতিহাস ও রাজনীতি সচেতন পাঠকেরা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুভব করবেন। এছাড়া রবীন্দ্র গবেষকগণও এই গ্রন্থ থেকে বিশেষ সাহায্যলাভ করবেন।

—এই বিরাট গ্রন্থপর্ব রচনায় আপনার তৎক্ষণিক মানসিকতার সঠিক চিত্র কেমন ছিলো ?

—এক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান গবেষকদের যে ধরণের মানসিকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন তা অর্জনের জন্য আমি অনুক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম। এমন কি তখন আমি কোন বাধা বিপত্তিকে গ্রাহ্যই করিনি।

—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর সহজাত জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতার রূপান্তর গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করবেন কি ?

—সারাজীবন ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা এবং কর্ম সাধনার মধ্যে তাঁর রাজনীতিক আদর্শের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

—গ্রন্থ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা না করে বা প্রকাশকের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে কি আপনি এই গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন ?

—যখন এই গ্রন্থ রচনায় আমি গভীরভাবে মনোনিবেশ করি তখন পত্রিকা আবিনি কি করে এই বই প্রকাশ করব। তবে বিষয়ের মৌলিকত্ব দেখে বহু বাধার মধ্যে এক প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এগিয়ে এলেন এবং তাঁর আন্তরিক সাহায্য আমার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের কাজকে ত্বরান্বিত করে। পরবর্তী পর্যায়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর এই গ্রন্থের প্রতি কৌতূহল বিশেষ উল্লেখযোগ্য যার ফলে সরকারী সাহায্যলাভে বাকী খণ্ডগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।

—গবেষণা পর্যায়ে আপনি কি সচেতনভাবে নির্দিষ্ট কোন মানসিকতার বা দৃষ্টিভঙ্গীতে আবিষ্ট ছিলেন ? যদি থাকেন তবে রচনায় কি তার কোন প্রভাব পড়েছে ?

—বলা বাহুল্য, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আমি মোটামুটি রবীন্দ্রমানস এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও ভূমিকার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

—আপনি গ্রন্থ রচনায় objective হতে পেরেছেন কি ?

—আমি সম্পূর্ণভাবে objective বা তথ্যনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ হতে চেষ্টা করেছি এবং 'কুল দাইরে'র মত পাঠকের মনে কোথাও অনধিকার প্রবেশ ও তত্ত্বকথা প্রচারের কোন চেষ্টা করিনি।

—রবীন্দ্র পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হবার খবরে আপনার মনের প্রতিক্রিয়া জানাবেন কি ?

—একথায় আনন্দিত নিশ্চয়ই হয়েছি, বিশেষ করে যে পদ্ধতিতে এবছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছে। এবারের পদ্ধতি ছিলো সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। অবশ্য ইতিপূর্বে আমি অন্যভাবে সম্মানিত ও স্বীকৃতি লাভ করেছি এবং তা' রবীন্দ্র পুরস্কারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের পাঠ্য তালিকায় (সম্প্রতি চালু বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় আমার এই গ্রন্থ স্থান লাভ করেছে) আলোচ্য গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সব বড় সম্মান ও স্বীকৃতি ছাড়া রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা (ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) এবং রবীন্দ্র গবেষকরা বহু পূর্বেই উচ্ছ্বসিত ভাষায় আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

—আপনার বক্তব্য কতটুকু যথার্থ রূপ গ্রহণ করেছে ?

—বলা বাহুল্য আমি খুব সন্তুষ্ট নই। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমি সম্পূর্ণ নূতন করে লিখব। তথ্যতো আছেই তাছাড়া বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করে ও নিপুণভাবে বলার প্রয়াস থাকবে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে।

ক্ষেত খামার

বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র

বিমল বসু

ডালশস্য ও তৈলবীজ নিয়ে এখন উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে। ১৯৬৫ সাল থেকেই এই কেন্দ্র বেশ কয়েকটি উচ্চফলন, অকালি, রোগপ্রতিরোধক এবং সর্বপরিবেশানুগ জাতের ডালশস্য এবং তৈলবীজ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি জাত জাতীয় স্তরে উচ্চ প্রশংসিত।

১৯৫০ সালেই কলকাতায় মোহিনীতে স্থাপিত হয় স্টেট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা রাজ্য কৃষি গবেষণা সংস্থা। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ ডালশস্য সম্পর্কিত গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন করেন। এরই ফলস্বরূপ বহরমপুর কোম্পানি বাগান অঞ্চলে অবস্থিত সরকারী কৃষি খামারটিকে ডালশস্য গবেষণা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। তারপর ১৯৫৫ সালে তৈলবীজ সংক্রান্ত গবেষণাও এই কেন্দ্রের আওতায় আসে। কারণ, সারা পশ্চিমবঙ্গে ডালশস্য এবং তৈলবীজ উৎপাদনে মুর্শিদাবাদ জেলাই প্রথম।

১৯৬৮-তে আধুনিক পর্যায়ে গবেষণা শুরু হওয়ার পর এই কেন্দ্রে জমির এলাকা ৪৪ একর থেকে বেড়ে ৬০ একরে দাঁড়ায়। বছর দুয়েক হল কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনও নির্মিত হয়েছে। ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারীতে এই ভবনটির উদ্বোধন হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশা নিয়ে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এটিই একমাত্র তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র। ডালশস্য গবেষণার এর স্থান দ্বিতীয়। এক নম্বর কেন্দ্রটি রয়েছে বিহারে।

বর্তমানে বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ৬০। এঁদের মধ্যে ২৩ জন গবেষক। এই কেন্দ্রের বর্তমান প্রধান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ কৃষ্ণাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

গবেষণার ধারাচাল

এই কেন্দ্রে ডালশস্য হিসেবে মুগ, মুসুরী এবং তৈলবীজ হিসাবে প্রধানত রাই এবং পরিষ্কার উন্নত জাতের বীজ তৈরীর উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই তিন শস্যের ব্যবহার ও উৎপাদন বেশী। অধিক ফলনের সম্ভাবনাও প্রচুর। এছাড়া ছোলা, কলাই, অড়হর, মুগ, খেসারী প্রভৃতি ডালশস্য এবং তিল, ধানাম, নিনসিড, চীনাবীন, সূর্যমুখী প্রভৃতি তৈলবীজ নিয়েও এখানে কাজ হচ্ছে। এবং তার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

ডঃ সেনগুপ্ত জানালেন মূলত তিনটি পর্যায়ে এখানে গবেষণার কাজ চলে।

(১) প্রোডাক্টশান রিডিং বা উৎপাদন ভিত্তিক প্রজনন: এই পর্যায়ে বিভিন্ন জাতের বীজের পর্যায়ক্রমিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উচ্চফলনশীল এবং অকালি জাতের বীজ তৈরী করা হয়। পদ্ধতিটি এই রকম: নানা জায়গা থেকে কোন একটি ডালশস্য বা তৈলবীজের বিভিন্ন জাতের নমুনা সংগ্রহ করা, সেগুলি বোনা, তারপর উৎপন্ন গাছগুলি থেকে উচ্চফলন অথবা অকালি জাতের গাছগুলি বেছে নেওয়া এবং প্রজনন মধ্যে পরাগ মিলনের ঘটিয়ে সঙ্কর জাত তৈরী করা। এভাবে উৎপাদনক্ষমতা একটি উচ্চফলন অথবা অকালি জাতের নতুন বীজ তৈরী করতে সময় লাগে পাঁচ থেকে দশ বছর। কোন কোন ক্ষেত্রে সাত বছর। এই পর্যায়ে মুসুরী, রাই, পরিষ্কা প্রভৃতির এমন কিছু কিছু নতুন বীজ এই কেন্দ্রে তৈরী হয়েছে, প্রচলিত জাতের তুলনায় যার ফলন ৩ থেকে ৪ গুণ।

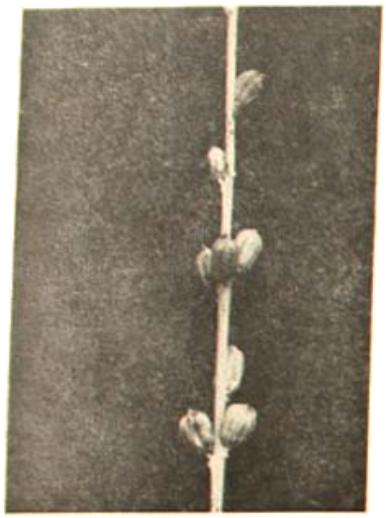

নয় প্রকার তিল। এই কেন্দ্রের তৈরী।

(২) রেজিস্টেন্স-ব্রিডিং বা রোগ এবং কীট প্রতিরোধী প্রজনন: এক্ষেত্রে রোগসৃষ্টির কৃত্রিম পরিবেশ তৈরী করে সেখানে বীজ বুনে দেওয়া হয়। তারপর উৎপন্ন গাছগুলির মধ্যে থেকে সুস্থ ও নীরোগগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। কারণ এই নীরোগ গাছগুলিই হল রোগপ্রতিরোধক জাতের। এরপর এদের সঙ্গে উচ্চফলন অথবা জলদি জাতের সংকর ঘটানো হয়। এভাবেই পাওয়া যায় রোগপ্রতিরোধী উন্নত জাতের বীজ। এই পর্যায়েও কেন্দ্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) অ্যাডাপটিভ ব্রিডিং বা পরিবেশানুগ প্রজনন: এর অর্থ বিভিন্ন ধরণের জলবায়ু এবং মাটির পক্ষে উপযোগী জাতের বীজ সৃষ্টি। যেমন কৃষি অধিকারিকের মাধ্যমে এবং সহায়তায় এই কেন্দ্রের গবেষকরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সেখানে এই কেন্দ্রের তৈরী অথবা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আনা নানান জাতের বীজ বুনে সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখেন বিভিন্ন ধরনের প্রায় কোন কোন জাতের ফলন সর্বাধিক। পরে এইসব গাছের মধ্যে আবার পর্যায়ক্রমিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পাওয়া যায় 'সর্বপরিবেশানুগ জাত' অর্থাৎ অ্যাডাপটিভ ভ্যারাইটি।

কেন্দ্রের তৈরী কয়েকটি উন্নত বীজ

গবেষণা কেন্দ্রে স্থাপিত হওয়ার পর এই কেন্দ্রে এখন কয়েকটি ভালপন্না এবং তৈলবীজ উৎপাদন করেছে যা আজ জাতীয় স্তরে সমাদৃত। যেমন: সরিষা—কৌষি-বি ৫৪। সারা ভারতে এটি জলসিঞ্চনে জাতের সরিষা। এটি পাকতে সময় লাগে ৭০-৭৫ দিন। বড় ফলন: একরে ৮-১০ মণ। পাকতে সময় কম লাগে বলে স্বভাবতই ফলন কম। উচ্চফলন হলে পাকতে সময় নেবে বেশী। তাই বীজের মধ্যে এই দুটি গুণকে মেলানো কঠিন। তবু এই কেন্দ্রের গবেষকরা জলদি জাতের কৌষি-বি ৫৪-এর ফলন বাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই কেন্দ্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ধানাবন-বি ৩১। এই ধানাবের দানা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বড়। অর্থাৎ একটি ধানাবেই অনেক বেশী প্রোটিন—অনেক বেশী ক্যাচ। ধানাবের এই জাতটির এখন ব্যাপক চাষ হচ্ছে তামিলনাড়ুতে।

এছাড়া উচ্চফলন অড়হর-বি ৫১৭ এবং বি-৫২৪, মুসুরী বি-৭৭, ছোলা বি-১০৬ এবং রাই বি-৮৩, জলদি জাতের মুগ বি-১০৫, তিল বি-৬৭, রোগ এবং কীট প্রতিরোধক জাতের রাই টি-৪ ইত্যাদি বীজও এই কেন্দ্রে তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে অড়হর বি-৫১৭ এবং ৫২৪-এর একর প্রতি ফলন ১৮-২১ মণ। রাই বি-৮৩ এর ফলন একর প্রতি ১৪-১৫ মণ।

মুসুরী বি-৭৭ শুধু উচ্চফলন নয়, সর্বপরিবেশানুগ জাত হিসাবেও এটি উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যে কোন অঞ্চলেই এটি চাষযোগ্য। উল্লেখ্য, একই সঙ্গে উচ্চফলন এবং সর্বপরিবেশানুগ জাত হিসাবে মুসুরী বি-৭৭ সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তবে এই মুসুরীর দানাগুলি ছোট। সম্প্রতি কেন্দ্রের গবেষকরা গাছ-সংকরের মাধ্যমে এর মিউটেশান ব্রিডিং অর্থাৎ প্রকরণ প্রজনন পদ্ধতিতে দানাগুলিকে বড় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাথমিক ফলাফল হিসাবে বড়সড় একটি পপুলেশনের (দল) মধ্যে গোটা পাঁচেক গাছে বড় দানার সন্ধান পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট গবেষকরা এখন পরীক্ষা করে দেখছেন এই বৈশিষ্ট্যটা স্থায়ী হয় কিনা।

অড়হরের ঢলে-পড়া রোগ (Wilt disease) এবং তৈলবীজের সাদা মরচে রোগ (White rust)-এর কোন বাণায়নিক নিদান এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তাই রোগ প্রতিরোধক জাতের বীজ সৃষ্টিই একমাত্র পথ। এই কেন্দ্র সে পথেই পা বাড়িয়ে তৈরী করেছে সাদা মরচে রোগ প্রতিরোধক তৈলবীজ রাই টি-৪। ডালশস্যের ঢলে-পড়া রোগের প্রতিরোধক বীজ তৈরীও চেষ্টা চলছে।

কেন্দ্রের তৈরী শাখাবিহীন অড়হর। ধানের সঙ্গে পাশাপাশি এর চাষ চলবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে খেসারীর ডালের প্রচলন খুব বেশী, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের মধ্যে। কিন্তু খেসারীর ডালে আছে কতিকারক একটি রাসায়নিক পদার্থ বা নিউরোটক্সিন। এর ফলে খেসারীর ডাল খেলে অনেকসময় হাত পা পঙ্গু হয়ে যায়, শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে স্পাসিসিটি। খেসারীর ডালে শতকরা ৫ ভাগ নিউরোটক্সিন থাকলেই পক্ষাঘাত আক্রমণ করবে। বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র বাছাই পদ্ধতিতে কয়েকটি বিদেশী জাতের খেসারী বীজের সন্ধান পেয়েছে যাতে নিউরোটক্সিনের মাত্রা ০.২% বা তারও কম। কাঁচা ডাল বা ছাতু খেলেও এইরকম মাত্রায় নিউরোটক্সিন কোন ক্ষতি করে না। এই কেন্দ্রে উৎপাদিত এ ধরণের একটি স্বল্পমাত্রিক নিউরোটক্সিন যুক্ত খেসারী কে এইচ-১, পি-২৪। উল্লেখ্য, নিউরোটক্সিন বেশী মাত্রায় থাকলেও খেসারীর ডাল যদি একবার ফুটিয়ে তলানী সম্পূর্ণ ফেলে দিয়ে তারপর রান্না হয় তাহলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

এই কেন্দ্রের আগামী দিনের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ডালশস্যের অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির প্রকৃতি ও মাত্রার মধ্যে সমতা এনে এর প্রোটিন মাত্রা বৃদ্ধি করা, তৈলবীজের মধ্যে চর্বিমাত্রা বা তেলের শতকরা ভাগ (Oil content) বাড়ানো, স্বল্পমাত্রিক সিনিগ্রিন-যুক্ত এবং ইউরিসিক অ্যাসিড-বিহীন সরিষার বীজ সৃষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে প্রাথমিক স্তরে কিছু কিছু কাজও শুরু হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, সরষের তেলের বীজের জন্য দায়ী সিনিগ্রিন (Sinigrin) বা অ্যালিল আইসোথায়োসায়ানেট এবং ইউরিসিক অ্যাসিড (euricic acid) নামে দুটি রাসায়নিক উপাদান। এই দুটি উপাদান আমাদের ধমনীতে কোলেস্টেরল সঞ্চয়ে সাহায্য করে বার ফলে দেখা দেয় হৃদরোগ। এজন্য হৃদরোগীদের পক্ষে সরষের তেল খাবার। তাই স্বল্পমাত্রায় সিনিগ্রিন-যুক্ত এবং ইউরিসিক অ্যাসিড-বিহীন কোন সরিষা যদি সৃষ্টি করা যায় তবে তা হবে হৃদরোগীদের পক্ষে নিরাপদ। কেন্দ্র এমন সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে

এই কেন্দ্রের গবেষণার ফল ভোগ করি অধিকারিকের মাধ্যমে পৌঁছচ্ছে কৃষকের হাতে। কেন্দ্র উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ডালশস্য এবং তৈলবীজ মূলে উপকৃত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কৃষক। মাঝে মাঝেই এই কেন্দ্র থেকে সচিত্র বাংলায় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এইসব পুস্তিকায় থাকে নানা নতুনজাতের বীজের পরিচয় এবং খুঁটিনাটি চাষ পদ্ধতি। কেন্দ্র প্রতিবছর ফিল্ড-ডে এবং কৃষাণ মেলার আয়োজন করে থাকে। দেশের নানা অঞ্চলের কৃষকরা এখানে মিলিত হন। প্রদর্শনীর মাধ্যমে গবেষণা কেন্দ্রের কাজ তাঁদের দেখানো হয়। কৃষকদের নানা প্রত্যক্ষ সমস্যা নিয়ে হয় আলাপ আলোচনা। বলে দেওয়া হয় সমাধানের পথ।

কেন্দ্রের বর্তমান সমস্যা মূলত তিনটি— (১) কেন্দ্রের চারিদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ও পশুর অনুপ্রবেশ, যার জন্য ফসলটি পাকবার সময়ে অনেক অর্থের একটা বড় অংশই খরচ হয়ে যায়। তাই এর চতুর্সীমায় স্থায়ী মজবুত বেড়া অথবা দেওয়াল তোলা দরকার। (২) মৃত্তিকা রাসায়নিক গবেষণাগারটির উন্নতিবিধান প্রয়োজন। (৩) কেন্দ্রের জন্য অনেক গবেষকদের প্রায় অর্ধেক পদই ফাঁকি। কারণ এঁরা গবেষকই অন্য কিছুদিন কাজ করবার পর আরও ভালো সুযোগ পেলে অন্যত্র চলে যান। তার অন্যতম কারণ রাজ্য সরকারের অধীনে এই সংস্থার বেতনক্রম বর্তমানে আকর্ষণীয় নয়।

এ দেশের অধিকাংশ গবেষণা কেন্দ্রের মতই বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের আরও নানা সমস্যা আছে এবং থাকবে। তবু এই কেন্দ্রের কাজ দেখে মনে হল বহুক সমস্যার মধ্যেও এঁরা সাগ্রহী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

জানা অজানা

১। যে মনুষ্যসৃষ্টি কল মহাকাশযানে ইউরি গাগারিনই প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা করেন তার নাম কি?

২। কোন মাসে নীল অর্ধচন্দ্রাকার পড়ে থাকে?

৩। পৃথিবীর সবচেয়ে আয়তনবিশিষ্ট মুখ কোনটি?

৪। আন্তর্জাতিক তারিখ কোন খেয়াল থেকেই দেখা হয়েছিল?

৫। কল বিপুল সমুদ্রগর্ভে যাত্রা শুরু করেছিল। তবে একে অরৌবর বিপথ বলা হয় কেন?

উত্তর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গ্রন্থ আলোচনা

কণ্ঠস্বর—বিশেষ বসন্ত সংখ্যা। একাদশ বর্ষ। ২৪শে মার্চ ১৯৭৮। এই সংখ্যার বিশেষ সম্পাদক—প্রদীপ রায়-চৌধুরী। ১১ ২, টেমার লেন, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। দাম ৫০ পয়সা।

'কণ্ঠস্বর' কবিতা আন্দোলনের গুণগ্রাহী মাসিক পত্রিকা। এই বিশেষ সংখ্যাতেও তাই কবিতাকে বিষয়বস্তু/ মনন মানসিকতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে। 'মনে পড়ে' পর্যায়ে লেখাগুলোর সন্নিবেশ এসংখ্যার একটি বড় পাওনা। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, ভক্তা মজুমদার, নির্মল হালদার, অভিজিৎ ঘোষ, দিলীপ গুপ্ত, শশীপ চট্টোপাধ্যায়, অনেকেই স্মৃতিচারণ করেছেন—তাঁদের সবারই ধ্যান কবিতা। বসন্ত সংখ্যার কবিদের মধ্যে আছেন—খোকন মিত্র, তাপস ঘোষ, সুরেশ দাস, বিশ্বনাথ রায়, তপন ঘোষ, বিষ্ণু সামন্ত, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, রোধায়ন মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ রায় চৌধুরী প্রমুখ। নবীন কবিদের দু একটি সাহসী লাইনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল—'সাঁওতাল পাড়ায় আর মাদল বাজে না / বাদলের মেঘে বড় গভীরে ছন্দপতি ঢুকেছে আজকাল।' 'যুবতীর দেহ ছুঁতে বেরকম টিপটিপ করে মায়া কুল প্রকৃতির মতো সেও প্রবুদ্ধ হয়' 'এইভাবে ভালবাসা আগুন হয়, রক্তে নোনা ধরে / মাধবীরা প্রস্তুত হয় দোহারী সকানে।' 'আস্তাকুঁড়ের, আমি বেপরোয়া এক অভিশপ্ত যুবক', ইত্যাদি।

নারীজগৎ—প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা (মার্চ—মে)। সম্পাদিকা—হেনা চৌধুরী, ১০৯/২০, বাজরা রোড, দাম দুই টাকা।

কাগজটির কলেবর ছোট হলেও সমৃদ্ধ এবং সুন্দর। এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাদের মধ্যে আছেন—মানু মুখার্জী ঊনা, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, মায়া বসু, ডঃ সুকুমার বসু, হেনা চৌধুরী, আবদুল সেন, মনতা বসু, ইন্দ্রাণী প্রমুখ। 'সার্থক-নামা আশাপূর্ণা' সুন্দর আলোচনা হয়েছে। 'মাতাবসু বলছি' গল্প হিসাবে সুন্দর আত্মনিবেদন। মেয়েদের মনে সেক্স ও সেন্টিমেন্টের সমন্বয় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন ডঃ সুকুমার বসু। 'বরণীয় চতুর্বর্গ' সব রমণীরই জেনে রাখা দরকার। অধ্যাপক ভক্তরঞ্জন দাশগুপ্তের 'সৌন্দর্যবিলাস—যুগে যুগে' সুন্দর ও সুখপাঠ্য রচনা। পত্রিকায় নারী জীবনের ধরনের ও মানসিক নিয়ে আরো বলিষ্ঠ আলোচনা সংযোজিত হওয়া দরকার।

পত্র-পত্রিকা

চারণ—বিশেষ ছোট গল্প সংখ্যা। সম্পাদক—তপন ঘোষ। সম্পাদকীয় দপ্তর—৪/১, জয়নারায়ণ ঘোষ লেন, হাওড়া-৭১১১০৬, দাম—১.৫০ টাকা

চারণ সম্পাদককে ধন্যবাদ তিনি একসঙ্গে একটি ছোটগল্প সংখ্যা প্রকাশের সাধু চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি ছোটগল্পই সুখপাঠ্য এবং চিন্তার খোরাক জোগায়। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরস্পর' এবং মানিক মুখোপাধ্যায়ের 'কলমি' অনন্য-সাধারণ গল্প হিসাবে স্থান পাওয়ার যোগ্য। এইসব লেখকদের কাছ থেকে আগামীতে আরো সুন্দর গল্প পাওয়ার আশা রাখছি। প্রচ্ছদ সুন্দর। সামান্য মুদ্রণপ্রমাদ বাদ দিলে ছাপাও সুন্দর।

কিশোর কল্যাণ। বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৪। সম্পাদনা—ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। প্রকাশনা—কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ২২, টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট, কলি-৭০০০০৯

কিশোর কল্যাণ পরিষদের সাধু প্রচেষ্টার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার মানুষ অনেকেই পরিচিত আছেন। কিশোর ও তরুণ সম্প্রদায়কে সঠিকভাবে গঠিত না করতে পারলে দেশের ভবিষ্যৎ নেই। এই দায়িত্ব স্মরণে রেখে ক্ষেত্রপ্রসাদ বাবু অনুরুদ্ধ প্রধিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'এ ভার শুধু সরকারেরই নয়, এ দায়িত্ব প্রতিটি পরিবারেরই। অপার্জিত প্রাণশক্তিতে নিঃশেষিত আনন্দহীন, কর্মহীন, নিষ্ফল, হতাশ উদ্যমহীন শিশুকিশোরদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচনই শেষকৃত্য নয়, দরকার এগিয়ে আসার, দরকার তাদের গড়ে তোলার, দরকার সুষ্ঠু উৎসাহ-দায়ী শিক্ষাক্রমের, দরকার মনস্তাময় পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের, দরকার যথার্থ কর্মসংস্থানের। এগুলি যথার্থভাবে করলে তবেই আমরা শিশু-কিশোরদের গড়ে তুলতে পারব—নরতে প্রজ্ঞাহীন, নিষ্ঠাহীন, আনুগত্যহীন, শৃঙ্খলা-হীন এবং ধর্মহীন এক প্রজন্মের দুঃস্বপ্ন থেকে কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না.....।' তাঁদের বার্ষিক সংকলন সবর প্রয়াসের বলিষ্ঠ ফসল.....সুন্দর মার্জিত রুচিসম্পন্ন। সাহিত্যজগতের অনেক শিল্পীরা এই সংখ্যায় লিখেছেন। কবি প্রবেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রী দিলীপ কুমার রায়, অধ্যাপক প্রিয়দা রঞ্জন রায়, ডঃ জয়ন্ত বসু, বুদ্ধদেব বাইতি, চিরঞ্জীব, শান্তিকুমার মিত্র, সম্রাট সেন, রামরাম চট্টোপাধ্যায়, শান্তশীল দাশ, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ সুধীজনের গল্প-কবিতা-নিবন্ধ কিশোর-মনকে উদ্বুদ্ধ করবে সন্দেহ নেই। অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'জড় ও শক্তি', ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নপ্রন না করাই ভালো', ডঃ জয়ন্ত বসুর 'আইজ্যাক নিউটন: একটি আশ্চর্য প্রতিভা' প্রভৃতি নিবন্ধগুলো কিশোরমনের অনুসন্ধানী মনকে নাড়া দেবে। লক্ষ্য করার বিষয় প্রতিটি গল্প কবিতা নির্বাচন এমন সুষ্ঠু হয়েছে যা নাকি সব কিশোর তরুণকেই কোন না কোন ভাবে আকর্ষণ করবে। এ কৃতিত্ব অবশ্যই সম্পাদক মহাশয়ের।

অমর দাশ

গ্রাম বাঙলার কড়চা

এটা কি বিয়ের বাস? এই জিজ্ঞাসায় এগিয়ে যাই। বাসটার নিচে ছোট ছোট লাগির চাল। পাশাপাশি। পশ্চিমে নাড়াভাঁটি দু দু মাঠ। বছরে বাপ এগোতেই একটা দুবলী ছুটে পালায়। স্বপন নাই বললেন, কাকে খুঁজছেন? হাতে কলেজের নামাঙ্কিত খাতা। জনাবলি এক চোখ নাই। পরনে জিনের প্যান্ট। পরিচয় দিতেই সঙ্গে সঙ্গে চললেন। চাক-ঢোল, ঝাঁজ-কাঁসির আওয়াজ খপ করে বন্ধ। ঠিক যেন শিকারীর আগমনে হরিণদলের সচকিত হবার মতন।

হাতল ভাঙা চেয়ার দিয়ে সূর্যকান্ত বললেন, তা প্রায় ত্রিশ বছর এ লাইনে আছি। তারপর চাকের ছিতে চাঁচ করতে করতে বললেন, বেশ ছিল বরিশালে ননছিটি গ্রাম। দূর-দূরান্তর থেকে ডাক আসত। বেশ ভালভাবেই চলত তখন। পঞ্চাশ সনে পাঁচ-সাতশো ঘর চলে আসি। ছড়িয়ে পড়ি বিভিন্ন জায়গায়। বিয়ে খা, অন্নপ্রাশন, পুজো-পার্বণে চাক ঢোল বাজাই। বলেই অভ্যেসবশত চাঁচ করে আওয়াজ তোলেন সূর্যকান্ত। —একটা পান দাও। যাই দেখিগে টাকাটা যদি পাওয়া যায়। যে কথা বলছিলাম—যে ছাড়াও ঢোল বালের গাজন, বয়াতি বাজাই। কিন্তু কি জানেন, বারো মাস তো এ ব্যবসা চলে না। আশ্বিন কার্তিকেই দুটো পয়সার মুখ দেখি। অন্য সময় ধার-দেনা করে খাই। আবার সিজিনে শোধ করি। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী। মুখ সবেতে টাকা দিয়ে কিছুই থাকে না শেষমেশ। এই চাকের কাঠিতেই আট-জনের পেট নির্ভর করে।

পাশেই ইটের পিঁড়িতে বসে ছিলেন বর্ষীয়ান নারায়ণ নট। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে বললেন, আজকাল পয়সা নেই। যন্ত্রপাতির দাম আকাশ ছোঁয়া, তাছাড়া একবার নাক ফাটলে অনেকেরই কিনবার সামর্থ থাকে না। কপাল পোড়া আমরা অন্য লোকের কাছেও যাচিনে। অন্য কোন উপায় থাকলে ছেড়ে দিতাম। আজকাল মাইক আর রেকর্ড হয়ে সর্বনাশ হয়েছে। ভালো তো বিয়ের সানাই আজ রেকর্ডে বাজে।

এসব যেন মানতে চাইলেন না বাজোশুর নট। কেন, এ আমাদের জাতীয় ব্যবসা। ছাড়ব কেন? বলে একবার [illegible] দিয়েছেন। আছে আছে এ অঞ্চলে [illegible] যবনপুরির পথে। একদিন এমন একটা সময় আসবে মাথা খুঁড়লেও চাকী পাওয়া যাবে না। একথা ঠিক যে আর্থিক সাহায্য পেলে হয়ত উন্নতি হবে। কিন্তু অভাব-অনটন ঘুচবে না। স্বভাবতই এইসব শিল্পীরা এখন পেট বাঁচানোর তাগিদে পালাচ্ছে, কিম্বা সামান্য বিভিন্ন পেশায় ভিড়ে যাচ্ছেন। আমাদের অমূল্য নটের কথাই বলুন না কেন—অমূল্যকাকা ঢাক-ঢোল ফেলে চল্লিশ বছর বয়সে অপেরায় বিবেক সাজে। এতবড় পাড়ার একমাত্র শিক্ষিত স্বপনের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই।

ঢুলি পাড়ায় বিসর্জন

অধীর বিশ্বাস

কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েন। তারপর নরম সুরে বলেন, দরকার তো ছোট অনুষ্ঠান সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছু করছেন। লোন দিচ্ছেন ভাঁবিকার জন্য। কিন্তু কই আমাদের দিকে তো তাকান না। যদি পেতাম তাহলে আমরাও কলকাতার মতো এখানে যাত্রাপার্টি করতে পারি। এই ভুলে যাওয়া শিল্পকে আবার পাঁজাকোলে টেনে তুলতে পারি। বছরের ছয় মাসই তো লোন ছেড়ে ভাজাভুজি বেচি। এই কথা বলে এই বাজ্যের ঈশ্বর থেমে গেলেন।

প্রধান ভাঁবিকা বাজনা। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ অন্য কাজে নাম লেখাচ্ছেন ইদানীং। কেননা এরা বুঝে গেছেন ঢাক ঘরে আঁকড়ে থাকলে পেটের ভাত জোটানো দুষ্কর। —জানেন ঢাক বাজনা আমাদের পিরায় উপশিরায়। তবুও বিশ্বাস করবেন না আমি ঢাকে কাঠি তুলতে পারি না। বাবাই দেয় না। বুঝি তো! কষ্ট করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বাবা বলেন, ঢাক ছাড়তে নিলে পড়া জনের ইজ্জত যায়। এ পাড়ার অনেকেই ইতিমধ্যে একটা গোপন ঈশারা হয়ে গেল। সূর্যকান্ত ঘরে ঢুকে বৌ-ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিশে গেলেন। এই ফাঁকে স্বপন জানালো, জানেন অনেকেই নট নামের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। লোকে ছোট জাত ভাবে। চাকীবলা মানেই যেন ভুক্কার পাঁই। এই তো সূর্যকান্তা নট কেটে নন্দী হয়েছেন।

পুরো পংক্তি পাল্টে দুবে উঠবার আয়োজন করছি ইতিমধ্যে জনার্দন নট এসে বললেন, আমার কিছুই বলার নেই। তবে একটা কথা—আমরা ঢাক ছাড়া দিই। এইবার পুজোয় চাক ভাড়া নিতে ফাটা চাক ফেরত দিয়ে গেছে। টাকা চাইতে গেছি, তখন ক্লাবের টাল ছেলে ভাগিয়ে দিল। ভয় দেখাল।

এদের অনেক অনুযোগ। জনার্দন মাথা ঝাঁকিয়ে গলায় তুলিয়ে নমস্কার দিলেন। তাঁর কথাতেই বলি, এরা যদি সামান্য অর্থ সাহায্য পান তাহলে জনাটিয়া বাদ্য-সম্প্রদায় গড়ে তোলা এবং বিলুপ্তপ্রায় শিল্পকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারবেন।

DHANADHANYE
Price 50 Paise

YOJANA
(Bengali)

Regd. No. WB/CC-315
June 16—30, 1978

প্রাঙ্গণ

এদেশে প্রাচীনতম যে ক্রীড়া ক্রীড়ার চল এখন পর্যন্ত রয়েছে ধনুর্বিদ্যা যে তার মধ্যে একটি ইতিহাসে তার উল্লেখ সর্বত্রই আছে। ষোড়শ শতক পর্যন্ত আত্মরক্ষা ও প্রতি-আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে তীর ধনুকই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলো। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন হওয়ায় এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অবশ্য জীবন ছাড়া অন্যত্র হ্রাস পেলেও খেলাধূলার জগতে ধনুর্বিদ্যা বা আর্চারিকে নন্দন ক্রীড়া হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয় শৈল্পিক বিচারে। তাই বর্তমানে বিশ্ব ক্রীড়াস্থান অলিম্পিকে এর অন্তর্ভুক্তি।

পশ্চিমবঙ্গে ধনুঃক্রীড়ার প্রচলন হয় প্রথম চন্দননগরে। প্রবর্তক যজ্ঞেশ্বর ঘোষ। শুরুর প্রথম দিনগুলোতে বাঁশের ধনুকই ছিলো একমাত্র সহায়। প্রতিযোগিতার আসর বসে ১৯৭২-৭৩ সালে কলকাতার ভবানীপুর মাঠে। বাঙলার ছেলেদের সঙ্গে আদিবাসী সাঁওতাল ছেলেরাও এতে অংশ নেয়। এর থেকে দল গঠন করা হয় পুনায় সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্য। এই সময় মাঝে মধ্যে যে সমস্ত বে-সরকারী প্রতিযোগিতা হয়েছে তাতে বাঙলাই প্রাধান্য দেখিয়ে এসেছে।

১৯৭৪-এ প্রথম জাতীয় প্রতিযোগিতার আসর বসে দিল্লীতে। অংশ গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া পাঞ্জাব, দিল্লী, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্য। বাঙলার ২৯ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৭ জন ছিলেন মহিলা। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয় বাঙলা দল। তাই প্রদের সঙ্গে কিছু পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার।

কলকাতাতে এবারের রাজ্য প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন হয় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ক্যালকাটা আর্চারি এবং রাণার্স হয় চন্দননগরের অর্জুন আর্চারি। স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ৫০ ও ৩০ মিটারের প্রতিযোগিতায় বাঁশের তীর-ধনুকের চাতুরী লক্ষণীয় ছিলো। দু' দিনের এই প্রতিযোগিতায় অপর দিকে আদিবাসীরা বাংলার সেরা তীরন্দাজদের তীর ছোঁড়া গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ধনুর্বিদ্যা

কেশবলাল দাশ

শিশির দাশ, কৃষ্ণা দাশ ও অসিত দত্ত যথাক্রমে পুরুষ মহিলা ও বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাতটি ক্লাবের ৬০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন।

পুরানো তীর ধনুক-এর থেকে বর্তমানের তীর ধনুকের পার্থক্য আছে কিছুটা। প্রতিযোগিতার তীর-ধনুকগুলি আদিবাসীদের তীর ধনুকের থেকে একটু ভিন্ন ধরণের। দামও একটু বেশী। ভাল একটা সেটের মূল্য দু'হাজারেরও বেশী। তাও সব সময় পাওয়া যায় না।

এখন তীর ছোঁড়ার প্রক্রিয়ার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। তীর ছোঁড়ার সময় ধনুকটি ধরতে হয় প্রায় খাড়া বা লম্বভাবে। ধনুকের দু'টি দিক, পেট ও পিঠের দিক বা Convex-Concave side। ধনুকের আধুনিক বাঁট বা হাতলটি রাইফেলের পিস্তল বাঁটের (pistol grip) মত। তীর ছোঁড়ার সময় ধনুকের হাতল-ধরা প্রসারিত বাঁ হাত থেকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত যতখানি দূরত্ব সেই মাপেতেই তার ছিলা (যা এখন নাইলনে প্রস্তুত) লাগানো হয়। কাজের সময় এটি লাগানো হয় বাকী সময় এটি খুলে রাখা হয়; যাতে অযথা টান বা চাপ না পড়ে। ধনুকগুলি সাধারণত কাঠ, অ্যালুমিনিয়ম বা ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরী।

তীরের ফলার কেন্দ্রবিন্দুটি এমনভাবে বসাতে হয় যাতে প্রতিকূল বা এলোমেলো বাতাস ভেদ করে এটা লক্ষ্যস্থলে ঠিকমতো আঘাত করে গেঁথে যেতে পারে। অন্যথায় অর্থাৎ এর গতিবেগ যদি সোজা না হয়ে আড়াআড়ি ভাবে হয়, তবে অনেক সময় প্রতিঘাতের ফলে এটির ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে প্রতিযোগীরা তীর ছোঁড়েন একটি বোর্ডে। বোর্ডের কেন্দ্রগুলিই হল বুলস্ আই (Bulls eye)। তার বাইরে তিনটি বিভিন্ন অংশের নাম যথাক্রমে Centre, Magpile ও Outer. কেন্দ্রস্থানে আঘাত করলে পয়েন্ট হবে সবচেয়ে বেশী। এবং তার থেকে দূরে চলে গেলেই পয়েন্ট কমবে।

আগেই বলেছি যে, ধনুকের দাম খুব বেশী। সরকারী এবং বেসরকারী তরফে তাই এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন আছে—অর্থনৈতিক এবং ব্যবস্থাপনা উভয় দিক থেকেই। যন্ত্রপাতি আনানো এবং অনুশীলনের জন্য ঘেরা মাঠের প্রয়োজন।

নানা অভাবের মধ্যেও উৎসাহ নিয়ে প্রবীণ শিক্ষাগুরু অসিত বিশ্বাস নবীন-হৃদে ভবিষ্যতের একলব্য-সব্যসাচী তৈরী করছেন। ক্যালকাটা আর্চারি, চন্দননগর আর্চারি, দাশনগর ও আসানসোল দ্রোণ আর্চারি প্রভৃতি সংস্থা বিশেষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই প্রাচীন খেলাটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে।

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. জি. রামকৃষ্ণান।
কেন্দ্রীয় তথ্য-ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা কর্তৃক মুদ্রিত।